ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল

১৪১৬:১৭

বুদ্ধদেব বসুর বানানরীতি
স্বরোচিষ সরকার
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে বিধৃত সাহিত্যচিন্তা
সুজিত সরকার
বিষাদ-সিন্ধু : নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত জীবন
গৌতম কুমার দাস
শামসুর রাহমানের গল্প এবং উপন্যাসে শব্দের ব্যবহার
ইয়াসমিন আরা সাথী
এ. টি. এম. রফিকুল ইসলাম
পাগলা কানাইয়ের গান : কবির আত্মপরিচয়ের দলিল
তপন কুমার গাঙ্গুলী
জহির রায়হানের কথাসাহিত্য : রাজনৈতিক অনুষঙ্গ
তপন কুমার রায়
কবি জয়দেব : প্রাচীন বাংলার গৌরব
মোঃ গোলাম সারওয়ার
বাংলাদেশের মাটির পুতুল : নান্দনিক বৈশিষ্ট্য ও শৈল্পিক মান
শাহরিয়ার হোসেন
মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নির্ভর চিত্রকলা : ইতিহাস ও ঐতিহ্যানুরাগ
বিদ্যুৎ জ্যোতি সেন শর্মা
১৯৭১-এ পাবনা জেলার হাদল-কালিকাপুর গ্রামে গণহত্যা
মো. আতাউর রহমান
বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কার্যকারিতা (১৯৭২-১৯৯০)
এম. আমিনুর রহমান
সুরা মসজিদ : স্থাপত্যিক উৎস পর্যালোচনা
এ. টি. এম. রফিকুল ইসলাম
তৃণমূল পর্যায়ের রাজনীতিতে গ্রামীণ এলিটদেরভূমিকা : বগুড়া জেলার দুটি ইউনিয়নভিত্তিক সমীক্ষা
মোঃ হাবিবুল্লাহ
নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করতে নারীর গর্ভকালীন সময়ে পুরুষদের সচেতনতা : একটি গ্রামকেন্দ্রিক সমীক্ষা
মো. ছাদেকুল আরেফিন
ওরাওঁ সমাজে নারীর প্রতি সহিংসতার প্রকৃতি
রিপন কুমার সরকার

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আইবিএস জার্নাল

ISSN 1561-798X
সপ্তদশ সংখ্যা ১৪১৬

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল

নির্বাহী সম্পাদক
মো. মাহবুবর রহমান

সহযোগী সম্পাদক
স্বরোচিষ সরকার

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আইবিএস জার্নাল, সপ্তদশ সংখ্যা ১৪১৬
প্রকাশকাল : নভেম্বর ২০০৯

© ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ

প্রকাশক

এস.এম. গোলাম নবী
সচিব, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী
ফোন : (০৭২১) ৭৫০৭৫৩, ৭৫০৯৮৫ ।। ফ্যাক্স : (০৭২১) ৭৫০০৬৪
E-mail : ibsru@yahoo.com

কভার ডিজাইন
আবু তাহের বাবু

মুদ্রক
মেসার্স শাহপীর চিশতি প্রিন্টিং প্রেস
কাদিরগঞ্জ, রাজশাহী।

মূল্য
টাকা ১৫০.০০

সম্পাদকমণ্ডলী

নির্বাহী সম্পাদক

মো. মাহবুবর রহমান
প্রফেসর ও পরিচালক, আইবিএস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সহযোগী সম্পাদক

স্বরোচিষ সরকার
সহযোগী অধ্যাপক, আইবিএস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

এম. মোস্তফা কামাল
সহযোগী অধ্যাপক, আইবিএস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সদস্য

এম. হাবিবুর রহমান
প্রফেসর, আইন ও বিচার বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

এম. মোখলেসুর রহমান
প্রফেসর ও পরিচালক, আইবিএ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

এম. জয়নূল আবেদীন
প্রফেসর, আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

এম. শামসুল আলম, বীর প্রতীক
প্রফেসর, ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

এম. এ. বারী
প্রফেসর, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

মোহাম্মদ নাজিমুল হক
সহকারী অধ্যাপক, আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

(প্রবন্ধের বক্তব্য, তথ্য ও অভিমতের জন্য সম্পাদকমণ্ডলী বা আইবিএস দায়ী নয়)

যোগাযোগর ঠিকানা
নির্বাহী সম্পাদক
আইবিএস জার্নাল
ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী
টেলিফোন : (০৭২১) ৭৫০৯৮৫
E-mail : ibsru@yahoo.com

প্রবন্ধকারের জ্ঞাতব্য

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ-এর বাংলা ও ইংরেজি জার্নালে বাংলাদেশ বিষয়ক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রাবন্ধিক বাংলাদেশের ইতিহাস, ভূগোল, ভাষা, সাহিত্য, শিল্পকলা, ফোকলোর, দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতি, মনোবিজ্ঞান, শিক্ষা, সমাজতত্ত্ব, আইন, পরিবেশ এবং বাংলাদেশের মানুষের জীবনধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত যে-কোনো বিষয়ের উপর বাংলা অথবা ইংরেজি ভাষায় লিখিত প্রবন্ধ জমা দিতে পারেন। কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত অথবা কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রকাশের জন্য দাখিল করা প্রবন্ধ গ্রহণযোগ্য নয়। প্রকাশিতব্য প্রবন্ধের যেসব বৈশিষ্ট্য জার্নালের সম্পাদকমণ্ডলী প্রত্যাশা করেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ:

- প্রবন্ধে মৌলিকত্ব থাকতে হবে।
- প্রবন্ধটি স্বীকৃত গবেষণা-পদ্ধতি অনুযায়ী রচিত হতে হবে।
- বাংলা ও ইংরেজি উভয় প্রবন্ধের ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষায় রচিত অনূর্ধ্ব ১০০ শব্দের একটি সারসংক্ষেপ থাকতে হবে।
- বাংলা প্রবন্ধের বানান হবে বাংলা একাডেমী প্রমিত বানান অনুযায়ী। তবে উদ্ধৃতির বেলায় মূল বানানের কোনো পরিবর্তন করা যাবে না।
- গ্রন্থপঞ্জি, টীকা ও তথ্যনির্দেশের যতিচিহ্ন ও সংকেত প্রয়োগের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য রীতি অনুসরণ করতে হবে।
- প্রবন্ধের পরিসর অনূর্ধ্ব পাঁচ হাজার শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রবন্ধের দুই কপি পাণ্ডুলিপি সিডিসহ জমা দিতে হবে। বাংলা প্রবন্ধের ক্ষেত্রে ফন্ট হবে "বিজয়" সফ্‌টওয়্যারের "সুতন্বী-এমজে"। প্রবন্ধের সঙ্গে প্রবন্ধকারের প্রাতিষ্ঠানিক পদমর্যাদাসহ যোগাযোগের ঠিকানা অবশ্যই থাকতে হবে।

সূচিপত্র

স্বরোচিষ সরকার	॥ বুদ্ধদেব বসুর বানানরীতি	৭
সুজিত সরকার	॥ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে বিধৃত সাহিত্যচিন্তা	৩৩
গৌতম কুমার দাস	॥ বিষাদ-সিন্ধু : নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত জীবন	৪৯
ইয়াসমিন আরা সাথী	॥ শামসুর রাহমানের গল্প এবং উপন্যাসে শব্দের ব্যবহার	৬১
মোছাম্মৎ ফাতেমা জোহরা বেগম	॥ বিভূতিভূষণের দুর্গা : সীমাবদ্ধতার প্রতিকৃতি	৬৭
তপন কুমার গাঙ্গুলী	॥ পাগলা কানাইয়ের গান : কবির আত্মপরিচয়ের দলিল	৭৭
তপন কুমার রায়	॥ জহির রায়হানের কথাসাহিত্য : রাজনৈতিক অনুষঙ্গ	৯৩
মোঃ গোলাম সারওয়ার	॥ কবি জয়দেব : প্রাচীন বাংলার গৌরব	১০১
শাহরিয়ার হোসেন	॥ বাংলাদেশের মাটির পুতুল : নান্দনিক বৈশিষ্ট্য ও শৈল্পিক মান	১১১
বিদ্যুৎ জ্যোতি সেন শর্মা	॥ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নির্ভর চিত্রকলা : ইতিহাস ও ঐতিহ্যানুরাগ	১২৫
মো. আতাউর রহমান	॥ ১৯৭১-এ পাবনা জেলার হাদল-কালিকাপুর গ্রামে গণহত্যা	১৩৯
এম. আমিনুর রহমান	॥ বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কার্যকারিতা (১৯৭২-১৯৯০)	১৪৭
এ. টি. এম. রফিকুল ইসলাম	॥ সুরা মসজিদ : স্থাপত্যিক উৎস পর্যালোচনা	১৫৯
মোঃ হাবিবুল্লাহ্	॥ তৃণমূল পর্যায়ের রাজনীতিতে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা : বগুড়া জেলার দুটি ইউনিয়নভিত্তিক সমীক্ষা	১৭৩
মো. ছাদেকুল আরেফিন	॥ নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করতে নারীর গর্ভকালীন সময়ে পুরুষদের সচেতনতা : একটি গ্রামকেন্দ্রিক সমীক্ষা	১৯৯
রিপন কুমার সরকার	॥ ওরাওঁ সমাজে নারীর প্রতি সহিংসতার প্রকৃতি	২১১

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, সপ্তদশ সংখ্যা ১৪১৬

বুদ্ধদেব বসুর বানানরীতি

স্বরোচিষ সরকার*

Abstract: Spelling of Bangla word in the twentieth century was multifarious in nature and it made confusion to writers and learners. To overcome the situation Visva Bharati took a spelling guideline at first in 1925, which was published in the magazine *Prabashi* in that year. After a few years in 1936 Calcutta University also published another spelling guideline, which got All Bengal popularity and it had been dominated the Bangla spelling over the century. Rabindranath Tagore was engaged in making both the guidelines. But some writers of twentieth century did not comply with the later guideline exactly. Buddhadev Basu was one of them. In some cases his spelling plan was more inclined to the 1925 guideline. Moreover, Buddhadev wrote some words in different spelling of his own style. In this paper we have tried to expose and explain the spelling-method of Buddhadev Basu, and examined to what extent it varied to the existing spelling rules.

১. সূচনা

বুদ্ধদেব বসুর (১৯০৮–১৯৭৪) প্রথম গ্রন্থ 'মর্ম্মবাণী' প্রকাশিত হয় ১৯২৫ সালে। ঠিক সেই বছরই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে বিশ্বভারতী একটি রানানরীতি প্রণয়ন করে এবং একই বছর 'প্রবাসী' (অগ্রহায়ণ ১৩৩২) পত্রিকায় তা ছাপা হয়। এই উদ্যোগকে বিবেচনা করা হয় বাংলা বানানকে প্রমিত করার সর্বপ্রথম উদ্যোগ হিসেবে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৩৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানানকে প্রমিত করার আর একটি উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত এর ৩য় সংস্করণ সর্বজনগ্রাহ্যতা পায়। ১৯৭৪ সালে বুদ্ধদেব বসুর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই বানানরীতি বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গে প্রশ্নাতীতভাবে অনুসৃত হতো। ১৯৫৭ সালে বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'কালিদাসের মেঘদূত' গ্রন্থের ভূমিকায় দাবি করেছিলেন, অন্য অনেকের মতো তিনিও আধুনিক বানানে অভ্যস্ত হয়েছেন।[১] 'আধুনিক' বলতে তখন নিশ্চয়ই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানরীতিকে বোঝানো হতো। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানরীতি কতোটা অনুসরণ করতেন, অথবা হুবহু অনুসরণ করতেন কিনা, তা নিয়ে সন্দেহ করার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। বিশেষভাবে যখন দেখা যায়, তাঁর সমকালের অন্য

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

[১] বুদ্ধদেব বসু, *কালিদাসের মেঘদূত* (৩য় সং; কলকাতা: এমসি সরকার, ১৯৬৩, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৭), পৃ. ৭৪।

খ্যাতিমান লেখকদের বানান থেকে তাঁর বানান অনেক ক্ষেত্রে আলাদা। তাই মুখে যাই বলুন, বুদ্ধদেব বসুর বানান সমকালীন অন্য অনেকের মতো সমান আধুনিক ছিলো না। বানান গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর নিজস্ব কিছু বিচার দ্বারা চালিত হতেন। সময়ের ব্যবধানে সেখানে একটু-আধটু পরিবর্তনের ছোঁয়া হয়তো অলক্ষণীয় নয়, তবে অধিকাংশ স্বতন্ত্র বানান শেষ পর্যন্ত এমনভাবে আলাদা একটা শৈলী হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়, বানানের ক্ষেত্রে যাকে বুদ্ধদেবীয় শৈলী নামেও অভিহিত করা যেতে পারে।

বুদ্ধদেব বসুর বানানের এই স্বাতন্ত্র্য তথা বানানের ক্ষেত্রে বুদ্ধদেবীয় উক্ত শৈলীর পরিসর কতোটা, সেটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ একটি জিজ্ঞাস্য। অর্থাৎ কী কী ধরনের শব্দে তিনি প্রচলিত বানানের নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন, অথবা বানানের নিয়মের মধ্যকার নমনীয়তার উপর ভর করে বিশেষ কী কী বানান তৈরি করে তা ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়েছেন, তা অবশ্যই অনুসন্ধানের বিষয়। যেসব শব্দের বানানে তিনি অন্যদের থেকে আলাদা, সেসব শব্দের বানাানে বিশ্বভারতী এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানের নিয়ম তিনি কতোটা গ্রহণ করেছিলেন, অথবা তাঁর বানান ঐসব নিয়মের কোথায় কোথায় বিরোধ সৃষ্টি করে, নিশ্চয়ই তা বিবেচনার বিষয় হতে পারে। অধিকাংশ বানানের ক্ষেত্রে জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি যে তাঁর বানান-অভ্যাসে অটল থাকলেন, এবং তাঁর সমকালীন ও উত্তরসূরি লেখকদের তিনি তাঁর বানানরীতি দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করতে সক্ষম হলেন, এটিও লক্ষণীয় একটি দিক। খুব কম লেখকের ভাগ্যে এমনটা ঘটে। তাই ঠিক কী ধরনের যৌক্তিকতার ফলে এবং কী কী সুবিধার জন্য বুদ্ধদেব বসুর বানানরীতি অন্যদের প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়, নিশ্চয়ই তা আলোচনাযোগ্য। বিশেষভাবে বর্তমান কালের বানান-নৈরাজ্যের যুগে এই আলোচনা আরো বেশি প্রাসঙ্গিক; কেননা, সেই যুক্তিই ভাষার ক্ষেত্রে অধিক গ্রহণযোগ্য, যা শুধু যুক্তিশীলই নয়, দশকের পর দশক ধরে তা প্রচলিত থাকার মতো শক্তিশালীও বটে। বুদ্ধদেব বসুর বানানরীতির প্রকৃতি উদ্ঘাটনের পাশাপাশি তাঁর গৃহীত প্রাসঙ্গিক যুক্তিসমূহের দিকে দৃষ্টিপাত ও আলোচনা তাই সমকালীন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গকে স্পর্শ করে।

বুদ্ধদেব বসুর বানানরীতিতে আপাত দৃষ্টিতে কয়েকটি ধরন বিশেষভাবে চোখে পড়ে, যেমন : ক) উচ্চারিত ও-ধ্বনির বর্ণীকরণ সংক্রান্ত; খ) সংস্কৃত ব্যাকরণ অস্বীকার সংক্রান্ত; গ) প্রতিবর্ণিত শব্দের বানান সংক্রান্ত; ঘ) বিশিষ্ট কিছু শব্দের যৌক্তিক বানান সংক্রান্ত; এবং ঙ) যতিচিহ্নের ব্যবহার সংক্রান্ত। পর্যায়ক্রমে এই ধরনগুলোর উপরে একে একে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে।

২. উচ্চারিত ও-ধ্বনির বর্ণীকরণ

বুদ্ধদেব বসুর বানানে ও-কারের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে খানিকটা বেশি, তা অসচেতন পাঠকেরও চোখে পড়ে। বিশেষভাবে ক্রিয়াপদের শেষে উচ্চারিত ও-ধ্বনিকে ও-কার প্রদান করার ব্যাপারে তাঁর আপসহীনতার বিষয়টি সর্বজনবিদিত। ক্রিয়ার কাল নির্দেশক প্রত্যয় যেমন -লো, -বো, -তো, -ছো তো বটেই, অনুজ্ঞার ক্ষেত্রে ক্রিয়ার শেষে যখন ও-ধ্বনি উচ্চারিত হয়, অথবা কিছু ক্রিয়াবিশেষ্য বোঝাতে যখন ক্রিয়ার শেষে ও-ধ্বনি অপরিহার্য হয়, তখন সেগুলোর বর্ণীকরণে বুদ্ধদেব বসু একেবারেই দ্বিধাহীন। শুধু ক্রিয়ার ক্ষেত্রেই নয়, বিশেষ্য, বিশেষণ, অব্যয় সব ধরনের শব্দের ক্ষেত্রে তিনি অভিন্ন নীতি অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন।

বুদ্ধদেব বসুর এই অবস্থানের পেছনে অন্তত দুটি কারণ সক্রিয় ছিলো বলে অনুমান করা যায়। প্রথমত, বাল্য ও কৈশোরে নোয়াখালীতে বসবাস করার সময়ে যে তরুণ সাহিত্যিক-বন্ধুদের সাথে তিনি বড়ো হয়ে উঠেছেন, বানান সম্পর্কে তাঁদের উচ্চারণমুখী প্রবণতা। 'উত্তরতিরিশ' গদ্যগ্রন্থের "নোয়াখালি" প্রবন্ধে সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসু লেখেন, "এখানে এমন কয়েকটি যুবক তো আছেন যাঁরা নূতনকে লেখেন নতুন আর নতুন লেখেন ন-এ ওকার দিয়ে; এখানে 'সবুজপত্রে'র অন্তত একজন গ্রাহক আছেন—শুধু তা-ই নয়, এমন একজন ভদ্রলোকও আছেন যাঁর প্রবন্ধ 'সবুজপত্রে' ছাপা হয়ে 'প্রবাসী'র কষ্টিপাথরে উদ্ধৃত হয়েছে।"[২] বুদ্ধদেব বসু তাঁদের নেতৃত্বে থাকুন বা না থাকুন, উচ্চারণ অনুযায়ী লেখার ব্যাপারে কিশোর বয়স থেকেই এভাবে তাঁর মানসিক প্রস্তুতি তৈরি হয়ে যায়। এক্ষেত্রে 'সবুজপত্র' হয়তো প্রেরণা হিসেবে কাজ করে, উল্লিখিত বাক্যের দ্বিতীয়াংশ যার ইঙ্গিত বহন করে।

দ্বিতীয়ত, ১৯২৫ সালে 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত বিশ্বভারতীর "বাংলা বানানের নিয়ম"। এই নিয়মের ৩.২-৩, ৩.৪, ৪.৪, ৫.২, ৫.৩, ৫.৪, ৫.৫ ৮.১, ৯., ৯.১, প্রভৃতি সূত্রে সরাসরি এবং ১০.২ সূত্রে পরোক্ষভাবে শব্দশেষের ও-কার লেখাকে সমর্থন করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক বাক্যাংশগুলো উদ্ধৃতিযোগ্য: "চ'ল্‌তি ভাষায় ে া-কার ব্যবহার করাই সহজ। যেমন : [ডাকো, দেখো, করো বলো ইত্যাদি]। (৩.২-৩) "কিন্তু চ'ল্‌তি ভাষায় ে া-কার লেখাই ভালো; যেমন : [কাঁদো-কাঁদো, পড়ো-পড়ো, নিবো-নিবো]।" (৩.২-৩) "মধ্য ও-ধ্বনি সর্বত্রই ে া-কার দিয়ে লিখ্‌লে আর কোনো অসুবিধা থাকে না।" (৩.৪) "তবে ে া-কার চালিয়ে দিতে পার্‌লেই ভালো হয়।" (৪.৪) "সাধু ও চ'ল্‌তি ভাষা দুয়েতেই তদ্ভব শব্দের যেখানে অন্ত্য অ-এর ও-উচ্চারণ হয়, সেখানে ে া-কার দেওয়া হবে। [ভালো, কালো, মতো, ছোটো, বড়ো, কখনো, যখনো, এখনো, আরো, বারো, তেরো, চোদ্দো (কিন্তু চৌদ্দ), পনেরো, ষোলো, সতেরো, আঠারো, পুরানো ইত্যাদি]। ব্যতিক্রম :—[যেন, কেন, যত, কত, এত]। এই সব শব্দে ে া-কার চলে কি না পরীক্ষা ক'রে দেখা যেতে পারে।" (৫.২) "সাধু ও চল্‌তি ভাষায় 'আনো' প্রত্যয়ান্ত শব্দে ে া-কার দেওয়া হবে। [করানো, বলানো, পড়ানো, দেখানো ইত্যাদি]।" (৫.৩) "সাধু ভাষায় বিকল্পে ও চ'ল্‌তি ভাষায় সাধারণত দ্বিত্ব শব্দে ে া-কার ব্যবহার হ'তে পারে [কাঁদো-কাঁদো, পড়ো-পড়ো, নিবো-নিবো] ৩.২-৩ দ্রষ্টব্য।" (৫.৫) "অকর্মক ক্রিয়ার ে-কার চলে না : সর্বত্র ে া-কার কিংবা ইলেক ব্যবহার করতে হবে। যেমন : [কাঁদলো, হ'লো, গেলো ইত্যাদি]।" (৮.১) "ও-ধ্বনি যতদূর সম্ভব ে া-কার দিয়ে লেখাই সহজ।" (৯.) "সাধু ও চ'ল্‌তি ভাষা এই দুয়েতেই [মোতি, গোরু, কোলু, এবং বিকল্পে নোতুন] এই কয়টি তদ্ভব শব্দে ও-কার লেখা হবে।[৩] এছাড়া ১০.২ নং সূত্রে ে া-কার বিষয়ক আলোচনা না থাকা সত্ত্বেও উদাহরণ দিতে গিয়ে ে া-কার ব্যবহৃত হয়েছে, যা নিয়মটির ে া-কার প্রবণতার আধিক্যকে সমর্থন করে। প্রাসঙ্গিক সূত্রটি উদ্ধৃত করলেই বিষয়টি

---

[২] বুদ্ধদেব বসু, "নোয়াখালি," *উত্তরতিরিশ* (২য় সং; কলকাতা: নিউ এজ, ১৯৫২, প্রথম প্রকাশ ১৯৪৫), পৃ. ২১১। নজরটান গবেষকের।

[৩] "পরিশিষ্ট," শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী প্রমুখ সম্পা., *বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮), পৃ. ৯৩–৯৬। এই পরিশিষ্টে 'বাংলা বানানের নিয়ম' শিরোনামে প্রথমে ১৯২৫ সালে প্রকাশিত বিশ্বভারতীর বানানের নিয়ম এবং পরে ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানের নিয়মের ৩য় সংস্করণ মুদ্রিত আছে।

বোঝা যাবে: "সাধু ভাষা ও চ'লতি ভাষা দুয়েতেই "আছ" ধাতুর বিকৃতরূপে সর্বত্র "ছ" ব্যবহার করা হবে; 'চ' লেখা হবে না। [ক'রেছো, লিখেছো, ব'লেছো ইত্যাদি]।"[৪]

সূত্রগুলো সম্পর্কে একটি বিষয় বলা দরকার। উল্লিখিত অধিকাংশ সূত্রের প্রথমাংশ ে া-কার ব্যবহারকে সমর্থন করে না, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রের উদ্ধৃত শেষ অংশ ে া-কার ব্যবহারকে সমর্থন করে। সূত্রের প্রথম অংশে লেখা হয়েছে, এগুলো না লিখলেও চলে; কিন্তু সূত্রের শেষ দিকে এগুলো লেখার পক্ষে মতামত প্রদান করায় নিয়মটি যথেষ্ট স্ববিরোধী হয়ে উঠেছিলো। বিশ্বভারতীর বানান-নিয়মের এই স্ববিরোধের পেছনে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত থাকাটাও অসম্ভব নয়। কারণ সমকালে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের রচনায় এই ধরনের ও-কার ব্যবহৃত হয়েছে।[৫] এভাবে এই নিয়ম এবং উদাহরণ শব্দশেষের উচ্চারিত ও-কার ব্যবহারের পক্ষে স্বীকৃতি প্রদান করায় নোয়াখালীর তথাকথিত উচ্চারণমুখী যুবকগণ প্রাসঙ্গিক ও-কার লেখার প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন পেয়ে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবেন, সেটাই স্বাভাবিক। বিশেষভাবে উল্লেখ্য বুদ্ধদেব বসু কথিত 'নোতুন' বানানটিও এই নিয়মের উদাহরণ হিসেবে উদ্ধৃত হয়।[৬] অন্তত বুদ্ধদেব বসুর আত্মবিশ্বাসের এটাই হয়তো মূল ভিত্তি। তাছাড়া ১৯২৫ থেকে শুরু করে ত্রিশের দশকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকল্প-বর্জিত বানান প্রকাশিত ও জনপ্রিয় হতে হতে বুদ্ধদেব বসু বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট লেখকে পরিণত হয়ে যান।

পূর্বের উল্লেখ থেকে দেখা গেছে ১৯২৫ সালের বিশ্বভারতীর এই নিয়ম অনুযায়ী নেবো, ক'রবো, ব'লবো, বলো, বললো, ক'রলো, র'য়েছো, ব'লেছো, ক'রেছো, লিখেছো, ব'লেছো, ক'রছো, করানো, বলানো, পড়ানো, দেখানো, যোগানো, ডাকো, দেখো, থেকো, নিয়ো; কাঁদো-কাঁদো, পড়ো-পড়ো, নিবো-নিবো, যতো, ততো, এতো, কতো, কালো, ভালো, ছোটো, বড়ো, আরো, পুরানো, কখনো, যখনো, এখনো; কেনো, যেনো, মতো; বারো, তেরো (কিন্তু চৌদ্দ), পনেরো, ষোলো, সতেরো, আঠারো, কারো, মোতি, গোরু, কোলু ইত্যাদি বানান শুদ্ধ রূপে বিবেচিত হয়। কিন্তু ১৯৩৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যখন বানানের সমতাবিধানের জন্য নতুন একটি নীতিমালা প্রণয়ন করে, তখন উপরের বাক্যের নিম্নরেখ শব্দগুলোর ে া-কারই শুধু শুদ্ধতার স্বীকৃতি পায়। তা সত্ত্বেও বুদ্ধদেব বসু তাঁর পুরনো অভ্যাস পুরোপুরি ত্যাগ করতে পারেন না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিশ্বভারতীর বানান এবং আংশিকভাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানকে মান্য হিসেবে গ্রহণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮ নং সূত্রে বলা হয় : "সুপ্রচলিত শব্দের উচ্চারণ, উৎপত্তি বা অর্থের ভেদ বুঝাইবার জন্য অতিরিক্ত ও-কার, ঊর্ধ্ব-কমা বা অন্য চিহ্ন যোগ যথাসম্ভব বর্জনীয়।"[৭] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সূত্র অনুযায়ী তাঁর অসংখ্য বানান অশুদ্ধ বিবেচিত হবে জেনেও বুদ্ধদেব বসু বিশ্বভারতীর বহু সুপারিশকে ত্যাগ করতে পারেন না।

---

[৪] তদেব, পৃ. ৯৬। প্রসঙ্গত লক্ষণীয়, সূত্রে দেখানো হয়েছে "ছ" কিন্তু উদাহরণে লেখা হলো "ছো"। নিম্নরেখ শব্দগুলো দ্রষ্টব্য।

[৫] ক্রিয়াপদের শেষে উচ্চারিত ও-কারান্ত বানানের জন্য দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *যাত্রী* (কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯২৯), যত্রতত্র। এই গ্রন্থের একটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃতিযোগ্য : "যে-মেয়েটি আমাকে শুভ-ইচ্ছা জানিয়ে চিঠি লিখেছিলো ত'ার চিঠিতে একটি অনুরোধ ছিলো, "আপনি ডায়ারি লিখ্বেন।" তখনি জবাব দিলুম "না, ডায়ারি লিখ্বো না।" তদেব, পৃ. ৩১।

[৬] *বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ*, পৃ. ৯৬।

[৭] উদ্ধৃত, পরেশচন্দ্র মজুমদার, *বাঙলা বানানবিধি* (কলকাতা: সারস্বত লাইব্রেরি, ১৯৮২), পৃ. ৬৩।

উল্লিখিত শব্দগুলোকে আপাতভাবে অন্তত চার ভাগে ভাগ করে দেখা যায়: ১. 'নেবো' থেকে 'নিয়ো' পর্যন্ত ক্রিয়াজাতীয় ভাগ; ২. 'কাঁদো-কাঁদো' থেকে 'এখনো' পর্যন্ত বিশেষণ জাতীয় ভাগ; ৩. 'কেনো' থেকে 'মতো পর্যন্ত অব্যয় জাতীয় ভাগ; এবং ৪. 'তেরো' থেকে শেষ পর্যন্ত বিশেষ্য ও সর্বনাম জাতীয় ভাগ। বুদ্ধদেব বসু তাঁর রচনাবলিতে এই চার ধরনের ও-কার কিভাবে ব্যবহার করতেন, একে একে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে বোঝা যাবে, ১৯২৫ সালের বানান-নিয়ম দ্বারা তিনি ঠিক কতোখানি এবং ১৯৩৬ সালের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম দ্বারা কতোখানি প্রভাবিত হয়েছিলেন।

প্রথমেই ক্রিয়াপদের ও-কার। অনেকের ধারণা, বর্তমানে 'প্রমিত' অভিধাপ্রাপ্ত ক্রিয়ার চলিত রূপগুলো সাধুরূপের পরিবর্তিত অবস্থা। তাই শব্দের সাধুরূপ ও-কারহীন থাকলে প্রমিত রূপও ও-কারহীন হবে, তাঁরা এই সিদ্ধান্তে বিশ্বাসী। অন্যদিকে যাঁরা মনে করেন, ভাষার সাধুরূপ তৈরি হয়েছিলো শব্দের কথ্যরূপ সংস্কারের মাধ্যমে, তাঁদের বিবেচনায় শব্দের প্রমিত চেহারা নির্ণীত হবে শব্দের উচ্চারণ, যুক্তি, সমরূপতা প্রভৃতির বিচারে। ১৯২৫ সালের কমিটিতে দ্বিতীয় ধারার পণ্ডিতের প্রভাব শক্তিশালী থাকায় অনেক ক্রিয়াপদের শেষে উচ্চারিত ও-কার স্থান পায়। তাই সাধু রূপের ক্রিয়াবিভক্তি -ইল, -ইব, -ইত, -ইছ প্রভৃতি তাঁদের কাছে যথাক্রমে -লো, -বো, -তো, -ছো প্রভৃতি ক্রিয়াবিভক্তিতে পরিণত হয়। বুদ্ধদেব বসুর রচনাতেও একইভাবে মুদ্রিত হয়: রইলো, গেলো, দিলো, নিলো, পরালো, পড়লো; বলবো, করবো, বাঁচবো; যেতো; জেনেছো, পেয়েছো, করেছো, মেনেছো, রেখেছো ইত্যাদি।[৮] লক্ষণীয়, কয়েকটি ঊর্ধ্বকমা ছাড়া ১৯২৫ সালের বিকল্প স্বীকৃতির সঙ্গে বুদ্ধদেব বসু লিখিত ক্রিয়ার এই রূপগুলো প্রায় এক। এমনকি অনুজ্ঞা ক্রিয়ার কোরো, যেয়ো, দ্যাখো, ডেকো, শেখো প্রভৃতি রূপও ১৯২৫ সালের নিয়মের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।[৯] ক্রিয়াবিশেষ্য নির্দেশের জন্য ক্রিয়াপদের শেষে ব্যবহৃত ও-কারও এই নিয়ম সমর্থন করে, যা বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন, যেমন: খাওয়ানো, ডোবানো, হারানো, তাড়ানো ইত্যাদি।[১০] এমনকি ক্রিয়াপদের প্রথমে এবং মাঝখানে ব্যবহৃত ও-কার, যৌক্তিক কারণে যার ব্যবহার অপ্রয়োজনীয় বিবেচিত হতে পারে, সম্ভবত ১৯২৫ সালের বানান-নিয়মের বিকল্প স্বীকৃতি বুদ্ধদেব বসুকে 'হোতে' বা 'দৌড়োতে' জাতীয় বানান লিখতেও উদ্বুদ্ধ করে।[১১]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ক্রিয়াপদের শেষে উচ্চারিত ও-ধ্বনির ও-কার একুশ শতক নাগাদ বুদ্ধদেব বসুর লিখন-অভ্যাসের অনেকটা প্রতিকূলে যায়। বিশেষত উনিশশো নব্বইয়ের দশক থেকে বাংলাদেশের বাংলা একাডেমী ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বানানসংস্কার কমিটি এবং পশ্চিমবঙ্গের আনন্দবাজার ও বাংলা আকাদেমি বানানসংস্কার কমিটি ক্রিয়াপদের শেষের এইসব ও-কারের প্রায় সবগুলোর বিপক্ষে অবস্থান নেয়। আশির দশক থেকেই এই ধরনের ও-কারের বিরুদ্ধে অনেকে তীব্র সমালোচনা করেন। মনীন্দ্রকুমার ঘোষ এঁদের একজন। বিশেষভাবে 'ছিলো'

---

[৮] *কালিদাসের মেঘদূত*, পৃ. ৮৯; *উত্তরতিরিশ*, পৃ. ১০, ১১, ১৪, ১৬–১৯, ২৩, ২৫; বুদ্ধদেব বসু, *শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর* (কলকাতা: নাভানা, ১৯৫৫), পৃ. ২১, ২২, ৩৬, ৬৯, ৭৯, ৮২, ৮৩।

[৯] *কালিদাসের মেঘদূত*, পৃ. ৮৯; *শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর*, ২২; *উত্তরতিরিশ*, পৃ. ২৩।

[১০] *উত্তরতিরিশ*, পৃ. ২২; *শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর*, পৃ. ৩৬।

[১১] *উত্তরতিরিশ*, পৃ. ২৩; বুদ্ধদেব বসু, *সঙ্গ-নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ* (৩য় মুদ্রণ; কলকাতা: এম সি সরকার, ১৯৯১, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৭৩), পৃ. ৪।

বানানের ও-কার তাঁর নিকট বিশেষ আপত্তিকর মনে হয়।[১২] অন্যদিকে পবিত্র সরকার দেখান খরচের হিসাব। তিনি ইকোনোমির দাবি তুলে ধরে যা বলেন, তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলে মনে হয়, তিনি বলতে চাইছেন, এই ধরনের ও-কার লেখার জন্য প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি টাকার কাগজ-কালি খরচ করতে হয়, যা কাম্য হতে পারে না।[১৩] যদিও পরেশচন্দ্র মজুমদারের মতো বুদ্ধদেবপন্থি ব্যাকরণবিদও পাওয়া যায়, যাঁরা লেখেন, "যদি স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায় যে বাঙলা অতীত ও ভবিষ্যতের -ল অথবা -ব-যুক্ত পদের অন্তে ও-কার গ্রহণীয় হবে (গেলো, যাবো), তবে দেখতে হবে তা যেন মোটামুটি সর্বত্র পদান্ত প্রয়োগে অনুসৃত হয়।"[১৪] সুপারিশটিতে প্রতিফলিত দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করে মনে হয়, পরেশচন্দ্র মজুমদার এটি প্রণয়ন করতে বুদ্ধদেব বসুর সর্বত্র সমরূপে অনুসৃত পদান্তের ও-কার দ্বারা কমবেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন।

বিশেষণ-জাতীয় শব্দের শেষে উচ্চারিত ও-ধ্বনিগুলোকে লিখিত রূপ দেবার ব্যাপারেও বুদ্ধদেব বসু রীতিমতো অনড়। এর মধ্যে অনেক শব্দই একুশ শতক নাগাদ প্রমিত আখ্যা পেয়ে গেছে। কিন্তু সমকালে এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানরীতি অনুযায়ী যার অনেকগুলোই শুদ্ধ বিবেচিত হতো না। যদিও বিশ্বভারতীর বিকল্প স্বীকৃতি অনুযায়ী তা লেখা যেতো। বুদ্ধদেব বসু তাই লিখতেন: ধারালো, পুরোনো, ছোটো, বড়ো, ভালো, আরো, কালো, জমকালো ইত্যাদি।[১৫] একই যুক্তিতে বুদ্ধদেব এতো, যতো, কতো, ততো প্রভৃতি লিখতে পারতেন। কিন্তু তাঁর প্রায় সব ধরনের রচনায় দেখা গেছে অন্তত এই শব্দগুলোতে তিনি শেষের ও-কার দেওয়া থেকে নিজেকে বিরত রেখেছেন। আজীবন তিনি লিখে গেছেন, এত, যত, কত, তত প্রভৃতি।[১৬] এক্ষেত্রে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮নং সূত্রকে প্রশ্নাতীতভাবে সর্বাংশে মান্য করেছেন, দেখা যায়। সূত্রটিতে লেখা ছিলো, "এই সকল বানান বিধেয়, যথা—'এত, কত, যত, তত:...।"[১৭] তাছাড়া এই শব্দগুলোর ও-কারহীন বানানের ব্যাপারে বিশ্বভারতী প্রণীত নিয়মের সমর্থন থাকায় বুদ্ধদেব বসু অন্তত এই শব্দগুলোর ও-কারহীন রূপকে সর্বত্র মান্য করেছেন।[১৮]

---

[১২] মনীন্দ্রকুমার ঘোষ, *বাংলা বানান* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮২), পৃ. ৫৮। তিনি লেখেন, " 'ছিল' বানানেও অ-কারান্ত উচ্চারণ কেউ করে না, তথাপি ও-কার বসালে ভাষাপণ্ডিত বিজয়চন্দ্র মজুমদারের কৌতুকই মনে পড়ে—painting a Nigro black।"

[১৩] পবিত্র সরকার, *বাংলা বানান সংস্কার: সমস্যা ও সম্ভাবনা* (কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন, ১৯৮৭), পৃ. ৭৫।

[১৪] পরেশচন্দ্র মজুমদার, *বাঙলা বানানবিধি*, পৃ. ১০।

[১৫] *উত্তরতিরিশ*, পৃ. ১৮, ২৩, ২৪, ২৬, ২৮, ১৩৬; *শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর*, ১৬, ২২।

[১৬] *উত্তরতিরিশ*, পৃ. ১০; *শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর*, ১১, ১৩, ৬৩, ৬৬; বুদ্ধদেব বসু, *প্রভাত ও সন্ধ্যা* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৭৫), পৃ. ১৪।

[১৭] *বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ*, পৃ. ১০০।

[১৮] বিশ্বভারতীর ৫.২ নং সূত্র প্রসঙ্গত উদ্ধৃতিযোগ্য : "সাধু ও চ'ল্‌তি ভাষা দুয়েতেই তদ্ভব শব্দে যেখানে অন্ত্য অ-এর উচ্চারণ ও-উচ্চারণ হয়, সেখানে ে া-কার দেওয়া হবে। ... ব্যতিক্রম:—[যেন, কেন, যত, কত, এত]।", তদেব, পৃ. ৯৫।

অব্যয় জাতীয় শব্দের মধ্যে যেসব শব্দে বুদ্ধদেব বসু শেষের ও-কার লিখতেন, তার মধ্যে রয়েছেঃ কোনো, মতো, তো, হয়তো ইত্যাদি।[১৯] এর মধ্যে 'মতো', 'তো', এবং 'হয়তো' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানরীতি দ্বারা সমর্থিত এবং 'কোনো' বানানটি বিশ্বভারতীর নীতিমালা অনুযায়ী শুদ্ধ।[২০]

বিশেষ্য-সর্বনাম জাতীয় শব্দের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু যেসব শব্দের শেষে ও-কার দিতেন, তার মধ্যে সংখ্যাশব্দগুলোর কথা প্রথমেই মনে পড়ে। শত সংখ্যাকে তিনি নির্দ্বিধায় 'শো' দিয়ে প্রকাশ করেছেন। ১৯২৫ সালের বিকল্প বিধান অনুযায়ী সংখ্যাশব্দের যে রূপ গ্রহণযোগ্য হয়, বুদ্ধদেব বসু সেটাকেই গ্রহণ করেন, যেমনঃ বারো, তেরো, পনেরো, ষোলো, আঠারো, একশো, পাঁচশো প্রভৃতি।[২১] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাসঙ্গিক সূত্রের যুক্তিতে এর মধ্যে শুধু 'বারো' বানানটি স্বীকৃত হয়।[২২] অনেক শব্দের কথ্য রূপ লেখার সময়েও বুদ্ধদেব উচ্চারিত ও-ধ্বনিকে যথারীতি লিখিত চেহারা দান করেন, যা বিশ্বভারতী উল্লিখিত নিয়ম দ্বারা সমর্থিত, যেমনঃ জুতো, টুকরো, শুকনো, উঠোন, শুয়োর, হুড়োহুড়ি, লুকোই।[২৩] এছাড়া বুদ্ধদেব বসু ব্যবহৃত দু-একটি বানান শুধু ১৯২৫ সালের বানানের নিয়মেই স্বীকৃত, যেমন 'গোরু'।[২৪]

৩. সংস্কৃত ব্যাকরণ অস্বীকার সংক্রান্ত

বাংলা লিখতে গিয়ে সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসরণ করাকে বুদ্ধদেব বসু রীতিমতো অন্যায় বিবেচনা করতেন। এ বিষয়ে তিনি বিশেষভাবে সচেতন হন সংস্কৃত কাব্য 'মেঘদূত' অনুবাদ করার সময়ে। এ বইয়ের দীর্ঘ ভূমিকার এক পর্যায়ে তিনি তাঁর নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন অনুভব করেন। কিছুটা দীর্ঘ হলেও সংস্কৃত ব্যাকরণ অস্বীকার সংক্রান্ত তাঁর সেই বক্তব্য এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃতিযোগ্য। তিনি লেখেন,

> আমি, আমার সমকালীন আরো অনেকের মতো, আধুনিক বানানে অভ্যস্ত হয়েছি; আর আমার বিশ্বাস সংস্কৃতের নিয়ম বেশি দূর অনুসরণ করতে গেলে আধুনিক বাংলার চরিত্রহানি হয়। 'উপনিষদ্' শব্দটি এক গ্রন্থপর্যায়ের নাম ব'লে, তার হস্-চিহ্ন রক্ষা করেছি; কিন্তু অন্যান্য হসন্ত শব্দে (যেমন 'প্রাবৃট', 'সুহৃদ', 'দিক', 'কান্তিমান') ঐ চিহ্ন দিলে সমকালীন বাংলার বিরুদ্ধাচরণ করা হ'তো। আজকের দিনে কোনো লেখকই বোধহয় 'ঐ দিক্ দিয়ে যাও' লিখবেন না, কিংবা এমন কোনো লেখকের কথাও ভাবা যায় না যিনি নায়িকাকে 'অবলে' ব'লে সম্বোধন করবেন। আধুনিক ব্যবহারের অনুগমন ক'রে আমি সম্বোধনে 'গুণবতী', 'অসিতনয়না' ইত্যাদি এবং বহুবচনে 'গগনচারীগণ' লিখেছি; তা না-লেখাটা আমার পক্ষে হ'তো অমার্জনীয় গুরুগিরি। বিশেষণে লিঙ্গভেদ কোথাও কোথাও রক্ষা করেছি, কিন্তু সর্বত্র করিনি—কেননা আধুনিক বাংলায় এই নিয়মহীনতাই নিয়ম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে,

---

[১৯] *উত্তরতিরিশ*, পৃ. ১০, ১১; *শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর*, ১৮।

[২০] *বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ*, পৃ. ১০০ এবং ৯৬।

[২১] *উত্তরতিরিশ*, পৃ. ৮, ১০, ৮৩, ৫০, ৮৪, ১৩১, ১৮২।

[২২] প্রাসঙ্গিক সূত্রের জন্য দ্রষ্টব্য, *বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ*, পৃ. ১০০।

[২৩] *উত্তরতিরিশ*, পৃ. ১৮, ২৯, ৬৪, ১৩৬, ১৩৭, ২০২; *শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর*, ১১, ৩৬। বিশ্বভারতীর প্রাসঙ্গিক সূত্রের জন্য দ্রষ্টব্য, *বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ*, পৃ. ৯৭।

[২৪] *উত্তরতিরিশ*, পৃ. ১৩৬। J দ্রষ্টব্য, *বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ*, পৃ. ৯৬।

> বিশেষণে স্ত্রীলিঙ্গপ্রয়োগ নির্ভর করে প্রসঙ্গ, রচনাভঙ্গি ও লেখকের বিচারবুদ্ধির উপর। উ [উত্তরখণ্ড] ৮৫-এ 'প্রথম যুবতীর প্রতিমা' ও 'যুগল স্তনভারে ঈষৎ-নতা', এই দুটোই আমার কানে সমান স্বাভাবিক শোনায়। তেমনি, সম্পূর্ণরূপে কানের উপর নির্ভর ক'রে, দ্বিতীয়া বিভক্তিতে কোনো কোনো স্থলে '-কে'র বদলে '-রে' বা '-য়' লিখেছি; পদ্যে এই তিন প্রকরণই প্রযোজ্য বলে আমার মনে হয়। যে-সব শব্দে হ্রস্ব ও দীর্ঘ উভয়ই স্বীকার্য সেখানে আমি হ্রস্ব স্বর গ্রহণ করেছি (দেহলি, বলভি, বিজলি, পদবি, জম্বু)। যাঁরা বলবেন, অন্তত অনুবাদের অংশে বানান ও ব্যাকরণ আরো সংস্কৃত-ঘেঁষা হওয়া উচিত ছিলো, তাঁদের আমি আবার মনে করিয়ে দেবো যে সংস্কৃত ও বাংলা আলাদা ভাষা, এবং আমি বাংলা ভাষার লেখক।[২৫]

বুদ্ধদেব বসুর এই বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, তিনি হসন্ত ব্যবহার সম্পর্কে, ইন-ভাগান্ত শব্দের বানান সম্পর্কে, বিশেষণের লিঙ্গ সম্পর্কে, ই-কার এবং উ-কারের হ্রস্ব-দীর্ঘ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট মন্তব্য করেছেন।

বিশ্বভারতী এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাসঙ্গিক সূত্রসমূহ তৎসম শব্দের হসন্ত সম্পর্কে বিশেষ কোনো মন্তব্য করে না। বরং অনেক অতৎসম শব্দে হসন্ত ব্যবহারের প্রতি সূত্রগুলোর আগ্রহ দেখে মনে হয়, তৎসম শব্দের হসন্ত রক্ষার ব্যাপারে বিশ্বভারতী এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রক্ষণশীল আচরণে বিশ্বাসী। বিশ্বভারতী তাঁর নিয়মের প্রথম সূত্রে তা উল্লেখ করেও নেয়, যেমন—"সংস্কৃত ও তৎসম শব্দের বানান প্রচলিত সংস্কৃত ভাষার নিয়ম অনুসারে লেখা হবে।"[২৬] এতে ধরে নিতে হবে, সংস্কৃত ভাষায় যেসব শব্দের শেষে হসন্ত ব্যবহৃত হয়, তৎসম শব্দের শেষেও সেসব হসন্ত ব্যবহৃত হবে। অন্যদিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মে সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ শিরোনামের অধীনে যে সূত্রগুলো পত্রস্থ হয়, তার কোনোটিতেই হসন্ত প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয় না।[২৭] এক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসু সমকালীন ভাষিক প্রবণতাকে ধারণ করে তৎসম শব্দের শেষে হসন্ত প্রদান করাকে অপ্রয়োজনীয় জ্ঞান করেন। তাঁর সেই ধারণারই প্রতিফলন ঘটে পূর্বোক্ত 'প্রাবৃট', 'সুহৃদ', 'দিক', 'কান্তিমান' প্রভৃতি শব্দের বানানে। বুদ্ধদেব বসুর এই প্রয়োগ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি পেতে অনেক সময় লাগে। ১৯৮৮ সালের পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের নীতি বা ১৯৯২ সালের বাংলা একাডেমীর নীতি বুদ্ধদেব বসুর এই প্রবণতার অনেকটা অনুকূল বটে, তবে প্রায় সর্বাংশে এটি সূত্রবদ্ধ হয় ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানানের নিয়মে, সেখানে লেখা হয়: "বাংলায় কয়েকটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্র ছাড়া অ-কারান্ত শব্দ প্রায় সর্বত্র ব্যঞ্জনান্ত উচ্চারিত হয়। এই রীতি অনুসারে পদের শেষে হস্ চিহ্নের ব্যবহার বাহুল্যসূচক।"[২৮] দেরিতে হলেও বুদ্ধদেব বসুর হসন্ত সংক্রান্ত বানান-নীতিটি এভাবে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করে।[২৯]

---

[২৫] *কালিদাসের মেঘদূত*, পৃ. ৭৪–৭৫।

[২৬] *বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ*, পৃ. ৯১।

[২৭] তদেব, পৃ. ৯৮।

[২৮] পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, "পরিশিষ্ট ৩," *আকাদেমি বিদ্যার্থী অভিধান* (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৯), পৃ. ৮৪৩।

[২৯] হসন্তের ব্যবহার বর্তমানে অনেকটা যুক্তাক্ষরের বিকল্পে কাজে লাগে। সেটিও বুদ্ধদেব বসুর লেখায় প্রথম ব্যাপকভাবে দেখা যায়। যেমন, উদ্‌ভ্রান্ত, প্রগল্‌ভতা প্রভৃতি। *উত্তরতিরিশ*, পৃ. ৭৫, ৯৫।

ইন্-ভাগান্ত শব্দের বানান সম্পর্কে বিশ শতকের বানানের নিয়মগুলো মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত দেখা যায়। এক পক্ষের মত হলো প্রাতিপদিক হিসেবে শব্দগুলো ঈ-কারান্ত থাকলেও প্রত্যয়ান্ত ও সমাসবদ্ধ হলে প্রত্যয়টি ই-কার হবে। অন্য পক্ষের মত হলো প্রতিপদিক হিসেবে শব্দগুলোর ঈ-কার শুধু প্রত্যয়ের বেলায় ই-কার হবে, অন্য সবক্ষেত্রে ঈ-কার বজায় থাকবে। কলকাতার সাহিত্য সংসদ, আনন্দবাজার, বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, এবং বাংলা একাডেমী প্রথম পক্ষের সমর্থক। দ্বিতীয় পক্ষের সমর্থক ছিলো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে একমাত্র বিশ্বভারতী। বিশ্বভারতী ১৯২৫ সালেই লেখে: "সাধু ও চল্‌তি দুই ভাষাতেই ইন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দে বাংলা বিভক্তি যুক্ত হলেও ী-কারই বজায় থাকবে। ইন্-অন্ত শব্দে সমস্ত পদে বিকল্পে ই-বানান চলতে পারে, কিন্তু আমরা বাংলায় ী-কারান্ত প্রথমার রূপকেই বাঙ্‌লার শব্দরূপ ব'লে ধ'রে নেবো। যেমন: [ধনীরা, যাত্রীদল, সঙ্গীহীন]।"[৩০] বুদ্ধদেব বসু বিশ্বভারতীর এই নিয়ম মেনে নিয়েছিলেন। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের বাংলা আকাদেমির গৃহীত নীতির সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর এই অভ্যাস সঙ্গতিপূর্ণ।[৩১]

প্রত্যয় যুক্ত হলে 'ই'-কার স্বীকার করলেও, সমাসের ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসু 'ঈ'-কার বজায় রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি যে এ ব্যাপারে খুব সচেতন ছিলেন এবং সচেতনভাবেই ইন্-ভাগান্ত শব্দগুলোর বানান বিবেচনা করতেন, উপরের উদ্ধৃতিতে 'গগনচারীগণ' শব্দের উল্লেখ থেকে তা বোঝা যায়। একই যুক্তিতে অন্যত্র তিনি লিখেছেন: জ্ঞানীগুণীরা, বিরহীরূপে, স্নায়ুতন্ত্রীসমন্বিত, হস্তীযূথ প্রভৃতি।[৩২]

বিশেষণের লিঙ্গ হবে কি হবে না, সে ব্যাপারেও বানাননীতি-কারদের বিশেষ কোনো মন্তব্য পাওয়া যায় না। তবে বুদ্ধদেব বসুর এই ধরনের প্রয়োগ সংস্কৃত বিধানকে অস্বীকার করার শামিল।

ই-কার এবং উ-কার সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর গৃহীত সিদ্ধান্ত বিশ্বভারতী থেকে শুরু করে বাংলা আকাদেমি পর্যন্ত সব প্রতিষ্ঠানই স্বীকার করে নিয়েছে। অতএব এ সম্পর্কেও মন্তব্য করার কিছু নেই। তবে এছাড়া আরো কয়েকটি বানান লেখার সময়ে জ্ঞাতে হোক বা অজ্ঞাতে হোক বুদ্ধদেব বসু সংস্কৃত বিধান লঙ্ঘন করেছেন, তার দু-একটি উদাহরণ নিয়ে অতঃপর আলোচনায় প্রবেশ করা যাক।

প্রথম উল্লেখযোগ্য উদাহরণ 'জনেক' শব্দ। শব্দটিতে সংস্কৃত সন্ধির নিয়ম অস্বীকার করা হয়েছে। মজার বিষয় হলো, এই অস্বীকারের ঘটনাটি ঘটানো হয়েছে সংস্কৃত কাব্য 'মেঘদূত' অনুবাদ করতে গিয়ে। তাও আবার প্রথম চরণের প্রথম শব্দ। চরণটি যথা: 'জনেক যক্ষের কর্মে অবহেলা ঘটলো ব'লে শাপ দিলেন প্রভু।'[৩৩] সংস্কৃত সন্ধির নিয়ম অনুযায়ী শব্দটি হবে 'জনৈক'। সংস্কৃত নিয়ম মানতে গেলে শব্দটিকে কোনোক্রমেই এখানে স্থান দেওয়া যেতো না। কিন্তু

---

[৩০] *বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ*, পৃ. ৯১।

[৩১] পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির নিয়মের জন্য দ্রষ্টব্য, "পরিশিষ্ট ৩", *আকাদেমি বিদ্যার্থী বাংলা অভিধান* (কলকাতা: বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৯), পৃ. ৮৪২। তবে রামমোহন রায় এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইন-ভাগান্ত বানানের ক্ষেত্রে যেভাবে সর্বত্র ই-কার চালু করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তা কোনো প্রতিষ্ঠানই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেনি। প্রাসঙ্গিক আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, রমেন ভট্টাচার্য, *বাংলা বানানের নিয়ম ও অনিয়ম*, ৪র্থ সংস্করণ (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ২০০৪), পৃ. ২২।

[৩২] *উত্তরতিরিশ*, পৃ. ১৮১; *কালিদাসের মেঘদূত*, পৃ. ৪৯, ৬৫, ৭১।

[৩৩] *কালিদাসের মেঘদূত*, পৃ. ৭৯।

বুদ্ধদেব বসু সংস্কৃত ব্যাকরণে অশুদ্ধ জেনেও শব্দটি দিয়ে 'মেঘদূত' অনুবাদ শুরু করেছেন। কৈফিয়ত দিয়েছেন সমকালের আরেক সংস্কৃত-বিশেষজ্ঞ বিখ্যাত কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের বরাতে।[৩৪] বলতে চেয়েছেন, শব্দটির জন্মদাতা সুধীন্দ্রনাথ। এ তথ্য বিশ্বাস করেও বলা যায়, এমন একটি অ-সংস্কৃত শব্দ দিয়ে সংস্কৃত কাব্য অনুবাদে প্রবেশ করার সাহস বুদ্ধদেব যেভাবে দেখিয়েছেন, তাতে বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর সত্যিকারের মমত্ব ফুটে ওঠে।

সংস্কৃত ভাষায় সন্ধি বাধ্যতামূলক; অন্যদিকে বাংলা ভাষায় স্বাভাবিক সন্ধি তো দূরের কথা, সমাসের ক্ষেত্রেও এটি অনেক সময়ে শিথিল। বাংলা ভাষার এই বিশিষ্টতাকে খুব কম ব্যাকরণবিদই যথেষ্ট উদার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিবেচনা করতে পারেন। কিন্তু বিষয়টি সৃজনশীল লেখক বুদ্ধদেব বসুর দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি তাই অসংলগ্ন সমাস—অর্থাৎ যেসব সমাসে সমস্যমান পদগুলো সন্ধিবদ্ধ হয় না বা একত্রে জুড়ে থাকে না—ব্যবহারের ব্যাপারে যথেষ্ট উদারতা দেখান। এ জাতীয় একটি শব্দ: 'বেশির ভাগ'।[৩৫] অনেকেই এটি একত্রে লিখে থাকেন, কিন্তু বুদ্ধদেব বসু এটিকে আলাদা করে লিখতেন। একটি শব্দ: 'তা ছাড়া'।[৩৬] বুদ্ধদেব বসু এটিকেও আলাদা করে লিখতে পছন্দ করতেন।

আবার সমাসের একটি বিপরীত রীতিও বুদ্ধদেব বসুর রচনায় দেখা যায়। বাংলা ভাষায় প্রচুর বাক্যাংশ সমাস ঘটে। কিন্তু লেখকগণ সেসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শব্দগুলোকে পাশাপাশি লিখে রাখতে পছন্দ করেন। বুদ্ধদেব বসু বরং এক্ষেত্রে হাইফেন (-) ব্যবহারের পক্ষপাতী। 'উত্তরতিরিশ' প্রবন্ধ-গ্রন্থের মাত্র একটি পৃষ্ঠা থেকে এ জাতীয় কয়েকটি বাক্যাংশ সমাসের উদাহরণ উপস্থাপন করা যায়, যেমন—পড়তে-পড়তে, কেউ-কেউ, সব-শেষে-পড়া, অমুক-অমুক, যদি-না, এ-জগতে, না-লাগলে, বেছে-বেছে, সে-বিষয়ে, এ-রকম ইত্যাদি।[৩৭] 'উপরি-উক্ত' শব্দকেও এ জাতীয় শব্দের উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা যায়।[৩৮] সংস্কৃত ব্যাকরণ হিসেবে শব্দটি সন্ধিবদ্ধ হয়ে 'উপর্যুক্ত' রূপ ধারণ করে, কিন্তু শব্দের সে রূপটিকে বুদ্ধদেব বসু পছন্দ করেননি। হয়তো মনে করেছেন, তাতে সংস্কৃত ব্যাকরণের দাসত্ব করা হয়, পাশাপাশি বাংলা শব্দ তার মর্যাদা ও স্বাচ্ছন্দ্য হারায়।

এমনকি ণ-ত্ব বিধানের ক্ষেত্রেও বুদ্ধদেব বসুকে কখনো কখনো ভিন্ন পন্থা গ্রহণ করতে দেখা যায়। যাঁরা সংস্কৃত ব্যাকরণকে অধিক পরিমাণে গ্রহণ করতে চান, তাঁদের নিকট যে শব্দের বানান

---

[৩৪] অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন: "শ্রী সুধীন্দ্রনাথ দত্ত পাণ্ডুলিপিতে আমার অনুবাদ পাঠ ক'রে বহু অংশের পরিবর্তন প্রস্তাব করেন; তাঁর প্রস্তাবসমূহ আমি এতদূর পর্যন্ত গ্রহণ করেছি যে কোনো-কোনো বাক্যাংশ তাঁরই রচনা বলা যায়। এর একটি উদাহরণ উল্লেখ করি: প্রথম শ্লোকের প্রথম পংক্তির প্রথম শব্দটিই তিনি আমাকে ব'লে দেন; এবং ঐ শব্দ যেমন সুষ্ঠু হয়েছে, তাঁর ভাণ্ডার থেকে আমার অন্যান্য ঋণও ঠিক তেমনি।" *কালিদাসের মেঘদূত*, পৃ. ৭৩। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যে শব্দই সুপারিশ করুন না কেন, তা যদি বুদ্ধদেব বসুর মানসিকতার সঙ্গে না মিলতো, নিশ্চয়ই তিনি তা গ্রহণ করতেন না। তাই এই ধরনের কৃতিত্ব বুদ্ধদেব বসু যাঁকেই উপহার দিন না কেন, মূল কৃতিত্বের প্রাপক হিসেবে বুদ্ধদেব বসুকে কোনোক্রমেই খাটো করা যায় না।

[৩৫] *উত্তরতিরিশ*, পৃ. ৯৭।

[৩৬] *সঙ্গ-নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ*, পৃ. ৪।

[৩৭] *উত্তরতিরিশ*, পৃ. ৮৯।

[৩৮] তদেব, পৃ. ১২৬।

হয় 'প্রবহমাণ' (প্র+বহ্+মান), বুদ্ধদেব বসুর কাছে সে শব্দের বানান হয় 'প্রবহমান'।[৩৯] সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে 'প্র' উপসর্গের পরে প্রত্যয়ের 'ন' 'ণ'-তে রূপান্তরিত হতে পারে, মাঝখানে ঐসব বর্ণ থাকা সত্ত্বেও। বুদ্ধদেব বসু সে নিয়মের তোয়াক্কা না করে, হয়তো 'বহমান' শব্দের পূর্বে 'প্র' উপসর্গটিকে বসিয়েছেন বলে মনে করেছেন। বুদ্ধদেব বসুর এই সূত্রে 'পরিবহন' বানানটিকেও শুদ্ধ বিবেচনা করতে হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-নিয়মে অনুস্বার সম্পর্কে সর্বপ্রথম সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব করা হয়। বলা হয়, সন্ধিতে ঙ স্থানে ং লেখা যাবে।[৪০] বুদ্ধদেব বসু এই নিয়ম মেনে চলতেন। তবে দু-একটি শব্দে তিনি সচেতনভাবেই অনুস্বার ব্যবহার করতেন, যা এই বিধির আওতা-বহির্ভূত। এ ধরনের দুটি শব্দ হলো: 'পংক্তি' এবং 'অপাংক্তেয়'।[৪১] এসব শব্দে ঙ-ব্যবহার করা বর্ণবিন্যাসকারীর জন্যও হয়তো কষ্টকর ছিলো, সেটিও বিবেচনায় রাখা যেতে পারে।

৪. প্রতিবর্ণিত শব্দের বানান সংক্রান্ত

১৯৩৭ সালে প্রকাশিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানের নিয়মের ৩য় সংস্করণে মোট ২২টি সূত্রের মধ্যে স্পষ্টত ১০টি সূত্র বিদেশি শব্দের বাংলা প্রতিবর্ণীকরণ সংক্রান্ত। এছাড়া ১০ নং সূত্রের একটি অংশও প্রতিবর্ণীকরণ সংক্রান্ত। "নবাগত ইংরেজী ও অন্যান্য বিদেশী শব্দ" শীর্ষক উল্লিখিত ১০টি নীতির একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকাও রয়েছে, যার শেষ দিকে বলা হয়েছে, "যে সকল বিদেশী শব্দের বিকৃত উচ্চারণ ও তদনুযায়ী বানান বাংলায় চলিয়া গিয়াছে সে সকল শব্দের প্রচলিত বানানই বজায় থাকিবে, যথা—'কলেজ, টেবিল, বাইসিকেল, সেকেণ্ড'। প্রচলিত বানান অনুসরণ করার পাশাপাশি বিদেশি শব্দ প্রতিবর্ণীকরণের সময়ে বুদ্ধদেব বসু উক্ত নীতিমালা কতোটা অনুসরণ করতেন, অথবা তিনি নিজস্ব কোনো নীতির দ্বারা পরিচালিত হতেন কিনা, আলোচনা প্রসঙ্গে তা দেখা যেতে পারে।

প্রথমে 'খ্রিস্ট' শব্দ দিয়ে শুরু করা যাক। বলা দরকার, শব্দটির এই বানান একবারমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক মান্যতা পায় ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বানান বিষয়ক সুপারিশমালায়। ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ পাঠপুস্তক বোর্ড তার নিয়মের ১১ ঙ অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে, "Christ ও Chritian শব্দের বাংলা রূপ হবে খ্রিস্ট ও খ্রিস্টান। এই নিয়মে খ্রিস্টাব্দ হবে।"[৪২] তবে বানানটি সম্পর্কে সর্বপ্রথম মন্তব্য পাওয়া যায় কলিকাতা

---

[৩৯] *কালিদাসের মেঘদূত*, পৃ. ৬৯।

[৪০] *বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ*, পৃ. ৯৮।

[৪১] *উত্তরতিরিশ*, পৃ. ৪২; *কালিদাসের মেঘদূত*, পৃ. ১৩।

[৪২] জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, *পাঠ্য বইয়ের বানান*, সংশোধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ (ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ২০০৫), পৃ. ১১২। ২০০৫ সালে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকেও এই অবস্থান থেকে সরে আসতে দেখা যায়। দ্রষ্টব্য, তদেব, পৃ. ১৩। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, ১৯৯২ সালে বাংলা একাডেমীর ২.০৪ নং সূত্রে লেখা হয়, "কিন্তু খ্রিষ্ট যেহেতু বাংলায় আত্তীকৃত শব্দ এবং এর উচ্চারণও হয় তৎসম কৃষ্টি, তুষ্ট, ইত্যাদি শব্দের মতো, তাই ষ্ট দিয়ে খ্রিষ্ট শব্দটি লেখা হবে।" দ্রষ্টব্য, "পরিশিষ্ট," *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, পরিমার্জিত সংস্করণ (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০০), পৃ. ১২২১। ১৯৯৭ সালে গৃহীত বাংলা আকাদেমির বানাননীতিতেও ষ্ট বানানকে স্বীকার করা হয়। দ্রষ্টব্য, "পরিশিষ্ট ৩," *আকাদেমি বিদ্যার্থী বাংলা অভিধান*, পৃ. ৮৪৮।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মে; সেখানে শব্দটির বানান সুপারিশ করা হয় : 'খ্রীষ্ট'। এই বানানের জন্য তখন কোনো যুক্তি দেখানো হয়নি, শুধু বলা হয়েছে, 'কতকগুলি শব্দে ব্যতিক্রম হইবে।'[৪৩] যদিও অনেকটা স্ববিরোধীভাবে ঐ নিয়মের ২০ নং সূত্রে লেখা হয়, "নবাগত বিদেশী শব্দে st স্থানে নূতন সংযুক্ত বর্ণ স্ট বিধেয়, যথা—'স্টোভ (stove)'।[৪৪]

শব্দটির বানান বুদ্ধদেব বসু একটু স্বতন্ত্রভাবে লিখেছেন। ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে লিখেছেন 'খৃস্ট'।[৪৫] আবার পঞ্চাশের দশক থেকে লিখেছেন খৃষ্ট।[৪৬] অর্থাৎ এক সময়ে স্ট দিয়ে লিখলেও শেষ পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানাননীতিকে আংশিক মেনে নিয়েছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিবর্ণীকরণ বিষয়ক নিয়মে ঈ এবং ঊ কার সম্পর্কে বলা হয়েছে, "মূল শব্দের উচ্চারণে যদি ঈ ঊ থাকে তবে বাংলা বানানে ঈ ঊ বিধেয়, যথা—'সীল (seal), ঈস্ট (east), উর্স্টার (Worcester), স্পূল (spool)'।" অন্যান্য বাংলা শব্দের ই/ঈ বা উ/ঊ সংক্রান্ত নীতির সঙ্গে এর একটি স্পষ্ট বিরোধ লক্ষণীয়। কেননা, 'অসংস্কৃত' শব্দের ক্ষেত্রে সেখানে হ্রস্ব রূপটিকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রবণতা রয়েছে। বিষয়টি বুদ্ধদেব বসুকে ভাবিয়ে থাকবে। তাছাড়া খ্রিস্টের কাছাকাছি যেসব ইংরেজি শব্দ ইংরেজিতে রয়েছে, যেমন—christ, christen, christendom, christian, christmas প্রভৃতি, সেগুলোর সংশ্লিষ্ট উচ্চারণটি হ্রস্ব থাকায় খ্রিস্ট শব্দটিকে তিনি দীর্ঘ ঈ কার দিয়ে লিখতে নিরুৎসাহিত হয়ে থাকতে পারেন। খ-এ ঋ-কার দেওয়ার চিন্তা সেখান থেকে এসেছে কিনা, বলা মুশকিল। বুদ্ধদেব বসুর এই দ্বন্দ্বটি বোঝা যায়, যখন দেখা যায়, প্রায় সমকালে তিনি কখনো 'খৃস্টান' লিখছেন, আবার কখনো 'ক্রিস্টিয়ান'-ও লিখছেন।[৪৭]

প্রতিবর্ণীকরণের ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম যথাসাধ্য অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য: æ-ধ্বনির জন্য 'অ্যা' রূপ ব্যবহার, য়-এর কম ব্যবহার, দীর্ঘ ধ্বনির জন্য দীর্ঘ স্বরবর্ণ ব্যবহার, এবং সর্বোপরি z-ধ্বনির জন্য ফুটকিযুক্ত জ-এর ব্যবহার। একে একে এ জাতীয় ব্যবহারের কিছু উদাহরণ তুলে ধরা যাক।

æ-ধ্বনির জন্য 'অ্যা' এবং 'এ্যা'—এই দুই রূপ চালু আছে দেখা যায়। সুকুমার সেনই সর্বপ্রথম æ-ধ্বনির জন্য 'এ্যা' রূপকে ব্যবহার করেছিলেন, এমন মনে হয়। ১৯৩২ সালে প্রকাশিত তাঁর 'ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে তিনি স্বরধ্বনির যে তালিকা করেন, সেখানে æ-ধ্বনির জন্য 'এ্যা' লিখেছিলেন।[৪৮] এর পর থেকে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের অধিকাংশ ভাষাবিজ্ঞানী æ-ধ্বনির জন্য 'এ্যা' রূপকে ব্যবহার করে আসছেন। তবে 'এ' বর্ণের জন্য আলাদা কারচিহ্ন থাকায়, অন্যদিকে 'অ' বর্ণের জন্য আলাদা কোনো কারচিহ্ন না থাকার যুক্তিতে বিশ শতকের শেষ

---

[৪৩] উদ্ধৃত, *বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ*, পৃ. ১০১।

[৪৪] তদেব, পৃ. ১০৫।

[৪৫] *উত্তরতিরিশ*, পৃ. ১৭৭।

[৪৬] *কালিদাসের মেঘদূত*, পৃ. ১৭, ৩১, ৬৬।

[৪৭] *উত্তরতিরিশ*, পৃ. ১৭৭ এবং ১৭২।

[৪৮] সুকুমার সেন, *ভাষার ইতিবৃত্ত* (কলকাতা: আনন্দবাজার, ১৯৯৮, প্রথম প্রকাশ ১৯৩২), পৃ. ৩৬; সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *সরল ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, নবীন সংস্করণ (কলকাতা: বাক্ সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭২, প্রথম প্রকাশ ১৯৩৯), পৃ. ??;

দিককার বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বানান-নিয়মের প্রস্তাবকগণ æ-ধ্বনির জন্য 'অ্যা' বর্ণকে সুপারিশ ও প্রচলন করেন। বিষয়টি বিবেচনায় রাখলে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসুর দূরদর্শিতা এবং ধ্বনি-বর্ণ বিষয়ে তাঁর অগ্রচিন্তার বিষয়টি স্বীকার করতে হয়। কেননা চল্লিশের দশকেই তিনি লিখেছেন—'ভিনাস অ্যাণ্ড অ্যাডনিস', ব্যাঙ্ক, স্যানিটারি; অ্যাসফল্ট, অ্যানাটমি; ভাইট্যালিটি, স্যাণ্ডুইচ, প্রভৃতি।[৪৯]

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম মানতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসুকে প্রতিবর্ণিত অনেক শব্দের মাঝখানে স্বরবর্ণ বসাতে হয়েছে। এটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানের নিয়মের ১৮ নং সূত্রের অনুসরণ। এই অনুসরণের ফলে বুদ্ধদেব বসুকে লিখতে হয়েছে, যথা—গলজওআর্দি, ইওরোপ, পাওঅর-হাউস, ওআন, নিউ ইঅর্ক; কোঅর্টজ, ওঅর্ডস্বর্থ।[৫০] প্রতিবর্ণিত শব্দের ক্ষেত্রে 'য়' বর্ণকে যথাসম্ভব বর্জন করার প্রবণতা বুদ্ধদেব বসু শুধু ইংরেজির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি, অন্যান্য বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেছেন।

z-ধ্বনির জন্যও ফুটকিযুক্ত জ-এর ব্যবহারের ব্যাপারে বুদ্ধদেব বসু বেশ সচেতন ছিলেন বলে মনে হয়। তবে প্রেস অপারগ হলে সেক্ষেত্রে তাঁকে আপস করতে হয়েছে। এমন উদাহরণ 'উত্তরতিরিশ' গ্রন্থ। এখানকার অনেক শব্দেই তিনি ফুটকিযুক্ত জ ব্যবহার করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, যেমন 'গলজওআর্দি' শব্দ।[৫১] তবে পঞ্চাশের দশক থেকে এ ব্যাপারে তিনি নাছোড়বান্দা হয়ে উঠেছিলেন, তা বোঝা যায়। 'কালিদাসের মেঘদূত' গ্রন্থে এই ফুটকিযুক্ত জ-এর ব্যবহার দেখা যায় 'ক্লাসিসিজম', 'সীজার' প্রভৃতি শব্দে।[৫২] বুদ্ধদেব বসুর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'প্রভাত ও সন্ধ্যা' উপন্যাসে এই বিশেষ ধরনের জ-এর ব্যবহার অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে রক্ষা করা হয়েছে। যেমন—'সীজন', ব্লাউজ, কোঅর্টজ, রাইজ।[৫৩]

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিবর্ণীকরণ নীতি বিশেষত ইংরেজি শব্দের বাংলা রূপান্তরের ক্ষেত্রে যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছিলো, সেখানে বলা হয়েছিলো, "মূল শব্দে যদি বিবৃত অ থাকে তবে বাংলা বানানে আদ্য অক্ষরে আ-কার এবং মধ্য অক্ষরে অ-কার বিধেয়।"[৫৪] বুদ্ধদেব বসু এই নীতিকে যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য মনে করেছেন। এই নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন: ইম্পীরিয়ল, রিসর্চ, হোমর প্রভৃতি শব্দ।[৫৫] এগুলোর বর্তমান প্রচলিত রূপ যথাক্রমে : ইম্পিরিয়াল, রিসার্চ, এবং হোমার।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মের মধ্যে st-এর জন্য স্ট বর্ণ নির্বাচনের কথা বলা হলেও nd-এর জন্য ন্ড নির্বাচন করা হয়নি বা বিদেশি শব্দের জন্য ণ-ত্ব বিধি বর্জনীয়, এমন কোনো বিধান জারি করা হয়নি। বিশ শতকের শেষ দিক নাগাদ এটি বিশেষভাবে চালু হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে একাধিক বানান সংস্কার কমিটি এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট নীতি প্রণয়ন করে। বুদ্ধদেব বসু

---

[৪৯] *উত্তরতিরিশ*, পৃ. ৬, ১৭, ৬৪; *শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর*, পৃ. ৬০, ৬৫; *প্রভাত ও সন্ধ্যা*, পৃ. ১০, ২৬।

[৫০] *উত্তরতিরিশ*, পৃ. ৮৭, ১০৮, ১২২, ১৩১, ১৬২; *প্রভাত ও সন্ধ্যা*, পৃ. ২৪, ৪১।

[৫১] *উত্তরতিরিশ*, পৃ. ৮৭।

[৫২] *কালিদাসের মেঘদূত*, পৃ. ১৫, ৬৩।

[৫৩] *প্রভাত ও সন্ধ্যা*, পৃ. ১২, ১৬, ২৪, ১০৯।

[৫৪] *বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ*, পৃ. ১০৪।

[৫৫] *উত্তরতিরিশ*, পৃ. ৭০, ৭৩; *কালিদাসের মেঘদূত*, পৃ. ৬৭।

তখন জীবিত ছিলেন না। তাই তাঁর রচনায় কোনো ধরনের দন্ত্য ন-এ ড-এ ন্ড দেখা যায় না। প্রাসঙ্গিক শব্দগুলোকে তিনি এভাবে লিখতেন: গ্র্যাণ্ড, প্যাণ্ট, কণ্ডক্টর, লণ্ডন; রোমাণ্টিক; ক্যালেণ্ডার, কনস্ট্যাণ্ট।[৫৬]

যে কয়জন লেখক আজীবন প্রায় একই ধরনের বানান ব্যবহার করেছেন, বুদ্ধদেব বসু তাঁদের একজন। তা সত্ত্বেও কিছু কিছু শব্দের বানানে বুদ্ধদেব বসুতেও ব্যতিক্রম ঘটে। ধরা যাক, 'ইউরোপ' শব্দের বানান। বুদ্ধদেব বসু চল্লিশের দশকে এর বানান লিখেছেন 'ইওরোপ' আবার পঞ্চাশের দশকে লিখেছেন 'য়োরোপ'।[৫৭]

প্রতিবর্ণিত শব্দে অন্য কারচিহ্নসহ য-ফলা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসু য-ফলার মূল উচ্চারণের কথা ভেবে থাকবেন এবং সেই অনুযায়ী ইংরেজি শব্দের প্রতিবর্ণীকরণ করে থাকবেন। এ ধরনের দুটি শব্দ : ট্যুশানি, ন্যুমোনিয়া।[৫৮] বলা বাহুল্য, বিশ শতকের বানাননীতিগুলোর কোথাও এ সমস্যা সমাধানের কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। বুদ্ধদেব বসু নিজ বিবেচনা অনুসারে এই জাতীয় প্রতিবর্ণনের কাজ করেছেন, অনেক লেখকের নিকট যা অনুকরণীয় মনে হয়ে থাকবে, কেননা, অনেকের লেখাতেই আ-কার ছাড়া এই ধরনের য-ফলা দেখতে পাওয়া যায়।

প্রতিবর্ণিত শব্দের বানানের ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসু একদিকে যেমন মূল শব্দের উচ্চারণের বিষয়টি মাথায় রাখতেন, পাশাপাশি বাংলা ভাষার হ্রস্ব উচ্চারণ প্রবণতার বিষয়টিও বিবেচনা করতেন। এছাড়া সমকালীন ভারতীয় অন্যান্য ভাষা, যেমন হিন্দিতে শব্দটির প্রচলিত বানানও তাঁকে প্রভাবিত করে। শেষোক্ত প্রভাবের একটি উদাহরণ 'হৌস'—বর্তমানে এ শব্দের 'হাউস' প্রতিরূপটি বাংলায় অধিক চালু।[৫৯]

৫. বিশিষ্ট কিছু শব্দের যৌক্তিক বানান

বাংলা শব্দের বানানের ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসু তাঁর নিজস্ব কিছু যুক্তির প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। এগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে চোখে পড়ে 'শ'-যুক্ত কিছু বানান, স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘত্ব সংক্রান্ত কিছু বানান, অব্যয় জাতীয় কয়েকটি শব্দের বানান প্রভৃতি। এসব বানান লিখতে বুদ্ধদেব বসু যেসব যুক্তি অনুভব করতেন, তা নিয়ে একে একে আলোচনা করা যেতে পারে।

বুদ্ধদেব বসুর বানানের বিশিষ্টতা আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই মনে পড়বে শ-এর আধিক্যের বিষয়টি। এমন বহু শব্দ পাওয়া যাবে, অন্যরা যা 'স' দিয়ে লেখেন, বুদ্ধদেব বসু লেখেন 'শ' দিয়ে। এমন কয়েকটি শব্দ : হিশেব, শেলাই, ভাগ্যিশ, জিনিশ, পোশাক, শাদা, শৌখিন, গিশগিশ, শাদাশিদে, খোলশ, উশখুশ, খালাশ, আপোশ, উশুল, মাশুল, রশদ, নিশপিশ, নুটিশ, উশকে, ফর্শা, মুখোশ, শামিল, ফরাশ, গেলাশ, ঠেশান, শুপুরি, শব্জি; বেশামাল, ঠাশা;

---

[৫৬] *উত্তরতিরিশ*, ১৮, ৩৯, ৪৩, ১৬২; *কালিদাসের মেঘদূত*, পৃ. ১৫; *প্রভাত ও সন্ধ্যা*, পৃ. ২৪, ১০৭।

[৫৭] *উত্তরতিরিশ*, পৃ. ১০৮; *কালিদাসের মেঘদূত*, পৃ. ৬৬।

[৫৮] *প্রভাত ও সন্ধ্যা*, পৃ. ১২, ৫২।

[৫৯] হিন্দি প্রভাবিত 'হৌস' বানানের প্রয়োগের জন্য দ্রষ্টব্য, *প্রভাত ও সন্ধ্যা*, পৃ. ৪১।

নকশা; লোকশান; শড়ক, শনাক্ত, ইশারা, গ্লাশ, খশড়া, পর্দানশিন, শড়কি, ফশ করে, ফিশফিশ, খশখশানি ইত্যাদি।[৬০]

বুদ্ধদেব বসু যেসব শব্দ শ দিয়ে লেখেন, এগুলোর মধ্যে তার প্রায় সবগুলো ধরন থাকা সম্ভব। যদিও দৈবচয়ন পদ্ধতিতে তাঁর গোটা পাঁচেক বইয়ের শ-যুক্ত বানানের শব্দ এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হলো। প্রথম বই থেকে বেশি শব্দ দেখা যাওয়ার কারণ, পরবর্তী বইগুলো থেকে শব্দ গ্রহণের সময়ে একবার গৃহীত শব্দটিকে বাদ দেওয়া হয়েছে। বইগুলোর প্রকাশকালের ব্যাপ্তিও মোটামুটি ত্রিশ বছর, ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫। তাই বুদ্ধদেব বসুর এই শ-গুলো তাঁর শ-ব্যবহারকে প্রতিনিধিত্ব করবে, এমন আশা করা যেতে পারে।

প্রথমে শব্দগুলোর ধরন নির্ণয় করা যাক। বিশ শতকের বানানের নিয়মগুলো বাংলা শব্দভাণ্ডারকে প্রথমে তৎসম এবং অতৎসম এই দুই ভাগে ভাগ করে নিয়েছে। সবাই-ই তৎসম শব্দের বানান অপরিবর্তিত রাখার পক্ষে। অন্যদিকে বিদেশি শব্দ এবং তদ্ভব শব্দের জন্য বানানের মূল নীতি মোটামুটি এক রকম। তা সত্ত্বেও বিদেশি এবং তদ্ভব শব্দের বানানের নিয়ম ঠিক করার সময়ে অনেক ক্ষেত্রে ব্যুৎপত্তির বিষয়টি প্রাধান্য পায়। উল্লিখিত শব্দগুলোর মধ্যে কিছু শব্দ তদ্ভব এবং কিছু শব্দ বিদেশি। উৎস অনুযায়ী এই বিভাজনে শব্দগুচ্ছকে বিভক্ত করে আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রথমে ধ্বন্যাত্মক জাতীয় শব্দগুলোকে ধরা যাক। এই শ্রেণির শব্দসংখ্যা ৫ (পাঁচ): খশখশানি (ধ্বন্যা.), গিশগিশ (ধ্বন্যা. গিশগিশ/গিসগিস), নিশপিশ (ধ্বন্যা.), ফশ করে (ধ্বন্যা.), এবং ফিশফিশ (ধ্বন্যা.)। এর মধ্যে শুধু গিশগিশ শব্দ নিয়ে বিতর্ক হতে পারে, এছাড়া আর সবগুলো শব্দেই তালব্য ধ্বনি রয়েছে। তাই এসব শব্দের বানান অভিধানে যা-ই থাকুক না কেন, এগুলোর বানানে তালব্য শ ব্যবহার করে বুদ্ধদেব বসু যথার্থ কাজ করেছেন।

দ্বিতীয়ত ১২টি শব্দ তদ্ভব জাতীয়। এগুলো হলো : উশকে (স. উৎ+কৃষ্), উশখুশ (স. ঔৎসুক্য), খোলশ (স. খোলক), ঠাশা (স. অস্টি>), ঠেশান (স. ঘৃষ্>), ফর্শা (স. স্ফর>), ভাগ্যিশ (স. ভাগ্য>), মুখোশ (স. মুখ+কোষ>), রশদ (স. রস>), শড়কি (স. শল্যক>), শুপুরি (স. সূর্পারক>), এবং শেলাই (স. সীবন>)। ব্যুৎপত্তির দিকে নজর দিলে দেখা যায় এগুলোর সংস্কৃত প্রতিশব্দে প্রায় ক্ষেত্রেই তালব্য ধ্বনি নেই। কিন্তু বাংলা ভাষায় এগুলোর সব কটিরই প্রমিত উচ্চারণ তালব্য শ-জাত। যদিও সাম্প্রতিক অভিধানগুলোতে (বাংলাদেশের বাংলা একাডেমীর বানান অভিধান এবং পশ্চিমবঙ্গের বাংলা আকাদেমির বিদ্যার্থী বাংলা অভিধান থেকে মিলিয়ে দেখা হলো) এর মধ্যে অধিকাংশেরই তালব্য শ স্বীকৃতি নেই। অভিধানগুলোতে এর নয়টি বানান দন্ত্য স-এর রূপ সমর্থন করে, যথা: উসকে, খোলস, ঠাসা, ঠেসান, ভাগ্যিস, রসদ, সড়কি, সুপারি, এবং সেলাই। বাংলা বানানের যেসব নীতিমালা প্রণীত হয়েছে, তার চেতনা অনুযায়ী এসব বানান অবশ্যই তালব্য শ দিয়ে হতে পারতো। কিন্তু আভিধানিকগণ হয়তো প্রচলনের বরাত দিয়ে তা করতে এগিয়ে আসেননি।

---

[৬০] *উত্তরতিরিশ*, পৃ. ১৯, ২৯, ৩৬, ৪২, ৪৩, ৪৬, ৫১, ৫৬, ৬৯, ৭৯, ৯১, ৯৪, ৯৯, ১১২, ১১৯, ১২৯, ১৩৩, ১৩৮, ১৬২, ১৬৩, ১৬৩, ১৬৪, ১৮৪, ১৮৪, ২০২, ২০৩, ২০৯; *শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর*, পৃ. ৭০, ৯১; *কালিদাসের মেঘদূত*, পৃ. ৩৪; *সঙ্গ-নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ*, পৃ. ৬; *প্রভাত ও সন্ধ্যা*, পৃ. ১৪, ১৪, ১৮, ১৯, ৬৩, ৯৩, ৯৩, ৯৭, ১১৩, ১৩৪।

তৃতীয়ত আরবি ও ফারসি শব্দের বানান। অধিকাংশ আরবি শব্দ ফারসি ভাষার মাধ্যমে বাংলা ভাষায় আত্তীকৃত হয়েছে বলে এগুলোকে একত্রে আলোচনা করা সঙ্গত। এই শ্রেণিতে রয়েছে ২০টি শব্দ, যথা: আপোশ (ফা. আপস), ইশারা (আ. ইশারঃ), উশুল (আ. ওয়াসুল), খালাশ (আ. খালাস্), খশড়া (আ. খুস্‌রাহ), জিনিশ (আ. জিন্‌স), নকশা (আ. নক্‌শাহ), পর্দানশিন (ফা. পর্‌দাহনশিন), পোশাক (ফা. পোশাক), ফরাশ (আ. ফরাশ), মাশুল (আ. মাহসুল), লোকশান (আ. নুক্‌সান), শড়ক (আ. শরক), শনাক্ত (ফা. শিনাখ্‌ত), শব্জি (ফা. সব্‌জী), শাদা (ফা. সাদ্‌হ), শাদাশিদে (ফা. সাদ্‌হ>), শামিল (আ. শামিল), শৌখিন (ফা. শওকীন), এবং হিশেব (আ. হিসাব)। উচ্চারণের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিলে শব্দগুলোর সব কটিকেই তালব্য শ দিয়ে লেখা উচিত। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাননীতি বিষয়টিকে সেভাবে দেখেনি। ঐ নীতির ১০ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, এইসব বিদেশি শব্দের মূল উচ্চারণে যে শ থাকবে, সেই শ-যুক্ত বানানকে স্বীকার করতে হবে। বুদ্ধদেব বসু এখানে সচেতনভাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানের নিয়মকে উপেক্ষা করেছিলেন। তা না হলে তাঁকে অন্তত এই শব্দগুলোর বানান নিম্নরূপ লিখতে হতো: আপোস, উসুল, খালাস, খসড়া, মাসুল, লোকসান, সবজি, সাদা, সাদাসিধে, এবং হিসেব। অর্থাৎ ২০টি শব্দের মধ্যে ১০টি শব্দের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর নিজস্ব বানান তথা প্রচলিত উচ্চারণের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন।

চতুর্থত ইংরেজি শব্দ। এই তালিকায় মোট ৩টি শব্দ রয়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাসঙ্গিক প্রতিবর্ণীকরণ নীতি অনুযায়ী এ বানানগুলো যৌক্তিকভাবে স্বীকৃত; অভিধানে স্থান পাক বা না পাক। শব্দগুলো হলো: গেলাশ (ই. glass), গ্লাশ (ই. glass), নুটিশ (ই. notice)। এগুলোর মূল উচ্চারণ শ-এর মতো।

পঞ্চম ধরনের মধ্যে মাত্র একটি মিশ্র শব্দ রয়েছে। অথবা বলা যায় এটি হিন্দি থেকে বাংলা ভাষায় অনুপ্রবিষ্ট শব্দ। শব্দটি হলো : বেশামাল (ফা. বে+ হি. সম্ভাল)। মূল ধ্বনি যাই থাক না কেন, তদ্ভব শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য সূত্রে এটিও তালব্য শ দিয়ে শুদ্ধ বিবেচিত হতে পারে। বুদ্ধদেব বসু তাই এখানেও বিশেষ কোনো ব্যত্যয় ঘটাননি।

স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘ বানানে বুদ্ধদেব বসুর বানানের স্বাতন্ত্র্যের বিষয়টিও আলোচনার দাবি রাখে। বিশ্বভারতীর বানানে ই এবং উ-এর হ্রস্বত্ব বা দীর্ঘত্ব নিয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো মন্তব্য পাওয়া না গেলেও দীর্ঘত্বের প্রতি এক ধরনের ঝোঁক দেখা যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানের নিয়মেও সেটা অব্যাহত থাকে। শুধু তাই নয়, 'স্ত্রীলিঙ্গ এবং জাতি, ব্যক্তি, ভাষা ও বিশেষণ বাচক শব্দের অন্তে ঈ' হবে বলে ৫ নং সূত্রে বিশেষভাবে উল্লেখও করা হয়। এমনকি নবাগত বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রেও প্রয়োজনমতো হ্রস্ব বা দীর্ঘ ই/উ ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিলো। এই পটভূমিতে বুদ্ধদেব বসুর কয়েকটি বানানের দিকে চোখ বোলানো যাক: কাকলি, দাবি, বেশি, রাক্ষুসি, বাঙালি, মক্ষিরানি, কয়েদি, হিরে, চাকরি, ভারি, পূজারি, বেগনি, স্বদেশি, রানি, পাইচারি, নোয়াখালি, শুপুরি, দিল্লি; সুভাষিতাবলি, শ্লোকাবলি, গ্রন্থাবলি, পদাবলি; শিঙাপুরি, রুপোলি, ইংরিজি, হিন্দুস্থানি, সওয়ারনি, টিপ্পনি, বালুচরি।[৬১]

---

[৬১] *উত্তরতিরিশ*, পৃ. ২০, ২০, ২০, ২৪, ২৪, ৫০, ৬৫, ৬৩, ৮১, ৯১, ১১৬, ১৩৭, ১৬২, ১৬৪, ১৯৮, ২০২, ২০৩; *কালিদাসের মেঘদূত*, পৃ. ১৫, ২৪, ২৬, ২৯; *প্রভাত ও সন্ধ্যা*, পৃ. ১২, ১২, ২২, ৬৫, ৮৮, ৯৩, ৯৬।

বুদ্ধদেব বসুর এই ই-কার যুক্ত বানানগুলো সমকালীন বানাননীতি দ্বারা সমর্থিত ছিলো না। বানানগুলোকে কয়েকটি ধরনে ভাগ করেও দেখা যায়। প্রতিটি ধরন নিয়ে একে একে আলোচনা করে বুদ্ধদেব বসুর প্রাসঙ্গিক মনোভাব ও যুক্তি উদ্ধারের চেষ্টা করা যাক।

প্রথমত, এমন কিছু বানান যা সংস্কৃত শব্দ হিসেবেই হ্রস্ব-স্বর ও দীর্ঘ-স্বর উভয় বানানে শুদ্ধ। কিন্তু সমকালীন বাংলা ভাষায় সেগুলোর দীর্ঘস্বর বানান বেশি প্রচলিত। বুদ্ধদেব সেখানে হ্রস্বস্বর যুক্ত বানান গ্রহণ করেন। মেঘদূত কাব্যের ভূমিকায় তা তিনি স্পষ্ট করে ঘোষণাও করেন, লেখেন, "যে-সব শব্দে হ্রস্ব ও দীর্ঘ উভয়ই স্বীকার্য সেখানে আমি হ্রস্ব স্বর গ্রহণ করেছি (দেহলি, বলভি, বিজলি, পদবি, জম্বু)।"[৬২] বিশ শতকের শেষ দিককার বানান-সংস্কার বিধিগুলোতে বুদ্ধদেব বসুর এই নিয়ম একাধিক প্রতিষ্ঠান যৌক্তিক হিসেবে গ্রহণ করলেও, বুদ্ধদেব বসুর সময়ে এই বানান অসমর্থিত ছিলো। উল্লিখিত তালিকার কাকলি, পূজারি, সুভাষিতাবলি, শ্লোকাবলি, পদাবলি শব্দগুলোও এই ধরনের। এর মধ্যে শেষ শব্দ তিনটির শেষে 'আবলি' যুক্ত, যা সংস্কৃত ভাষায় 'আবলী' রূপেও শুদ্ধ বিবেচিত হয়ে থাকে। এই জাতীয় শব্দের হ্রস্ব রূপ গ্রহণ করায় বুদ্ধদেব বসু বাননানীতি লঙ্ঘনের অভিযোগে অভিযুক্ত হন না ঠিকই, কিন্তু তিনি যখন বেশি, রাক্ষুসি, বাঙালি, কয়েদি, ভারি, পূজারি, বেগনি, স্বদেশি, রানি, শিঙাপুরি, ইংরিজি, হিন্দুস্থানি, সওয়ারনি, বালুচরি প্রভৃতি শব্দে ই-কার ব্যবহার করেন, তখন তা রীতিমতো বানাননীতি (বিশ্বভারতী এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের) লঙ্ঘনের মধ্যে পড়ে যায়।

বিশ শতকের শেষ দিকে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে যেসব বানান-নীতি প্রণীত হয়েছে, তাতে একটি নীতির প্রতি সকলেই ঐক্য বোধ করেন, তা হলো, অতৎসম শব্দে প্রচলিত দীর্ঘ স্বরের বদলে হ্রস্ব স্বর ব্যবহারের স্বীকৃতি। বাংলাদেশের বাংলা একাডেমী ১৯৯২ সালে যেমন বলে, "সকল অ-তৎসম অর্থাৎ তদ্‌ভব, দেশী, বিদেশী, মিশ্র শব্দে কেবল ই এবং উ এবং এদের কার-চিহ্ন ি ু ব্যবহৃত হবে।"[৬৩] অন্যদিকে ১৯৯৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমিও ই-কার ও উ-কার সম্পর্কে অভিন্ন কথা বলে। যেমন ই-কার সম্পর্কে আকাদেমির মন্তব্য, "অতৎসম শব্দে ঈ-কারকে যথাসম্ভব বর্জন করাই সংগত বলে আমাদের মনে হয়েছে।"[৬৪] এই নীতি অনুযায়ী দাবি, বেশি, মক্ষিরানি, কয়েদি, হিরে, রানি, পাইচারি, নোয়াখালি, শুপুরি, দিল্লি সকলই শুদ্ধ বিবেচিত হওয়ার কথা। কিন্তু এর মধ্যেও বাংলা একাডেমী তার ২.০১ সূত্রে 'রানি' শব্দের বানান 'রানী' রাখার পক্ষে এবং 'হিরে' শব্দের বানান 'হীরে' রাখার পক্ষেই মত দেয়।[৬৫] অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি তার বানাননীতিতে উল্লিখিত সবগুলো বানানকে শুদ্ধ বিবেচনা করে। এভাবে কয়েক দশক ধরে বুদ্ধদেব বসুর তথাকথিত অশুদ্ধ বানানের অনেকগুলো ঢাকার বাংলা একাডেমী কর্তৃক এবং প্রায় সবগুলো কলকাতার বাংলা আকাদেমি কর্তৃক স্বীকৃতি পেয়ে যায়। অনেকটা দেরিতে হলেও বুদ্ধদেব বসুর প্রাসঙ্গিক যুক্তিসমূহ এভাবে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে শুরু করে।

---

[৬২] *কালিদাসের মেঘদূত*, পৃ. ৭৫।

[৬৩] *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, পৃ. ১২২০।

[৬৪] *আকাদেমি বিদ্যার্থী বাংলা অভিধান*, পৃ. ৮৪৪।

[৬৫] *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, পৃ. ১২২১; *বাংলা একাডেমী বানান অভিধান* (পুনর্মুদ্রণ; ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪), পৃ. ৪৭০।

তবে বুদ্ধদেব বসু তাঁর এই হ্রস্ব-স্বর প্রীতি সর্বত্র যে রক্ষা করতে পেরেছেন, তা মনে হয় না। চল্লিশের দশকেও যেমন, ষাটের দশকেও তেমন এই নীতির দু-একটি ব্যতিক্রম তাঁর রচনার মধ্যে পাওয়া যায়। যেমন 'উত্তরতিরিশ' (১৯৪৫) গ্রন্থে লিখেছেন 'মরীয়া', 'চীৎকার', 'হী-হী ক'রে'; আবার 'সঙ্গ-নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ' (১৯৬৩) গ্রন্থে লিখেছেন 'সোনালী', 'মৌসুমী' 'ধ্রুপদী'।[৬৬] প্রথম গ্রন্থের ক্ষেত্রে প্রদত্ত উদাহরণে দীর্ঘস্বরের কথা হয়তো উল্লেখ করা যায়, তবে দ্বিতীয় গ্রন্থের উদাহরণে সে যুক্তি চলে না। তাই এগুলোকে নিতান্ত ব্যতিক্রম হিসেবেই বিবেচনা করা চলে।

'কি' শব্দটি তদ্ভব। বিশ শতকের বানান সংস্কার কমিটিগুলোর মূলনীতি বিবেচনা করা হলে এই শব্দে দীর্ঘ ঈ-কার ব্যবহার স্ববিরোধী হয়। একমাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৩৬) এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকে। কিন্তু বিশ্বভারতী (১৯২৫), বাংলাদেশ পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (১৯৮৮), বাংলা একাডেমী (১৯৯২), বাংলা আকাদেমি (১৯৯৭) সকলেই হ্রস্ব কার দিয়ে একটি এবং দীর্ঘ কার দিয়ে একটি মোট দুটি 'কি/কী' বানান লেখার সুপারিশ করে। শেষোক্ত তিনটির নীতি দ্বারা বুদ্ধদেব বসুর প্রভাবিত হওয়ার সুযোগ ছিলো না। কিন্তু বিশ্বভারতীর প্রাসঙ্গিক নীতিটি দ্বারা হয়তো বুদ্ধদেব বসু চালিত হয়েছিলেন। তাই সকলেই যখন 'কিভাবে' লিখতেন, তখনও (১৯৫৭) বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন, 'কী-ভাবে'।[৬৭] চল্লিশের দশকেই বুদ্ধদেব বসু বিশেষণ ও সর্বনাম 'কি'-কে 'কী'-রূপে লিখতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তখন তিনি লিখতেন, 'কী-রকম দৌড়ঝাঁপ', 'কী শান্তিময়, কী স্বচ্ছন্দ', 'আসলে হয় কী'; 'কী ক'রে জানলেন?' ইত্যাদি।[৬৮] এভাবে 'কি' বানান ব্যবহারের সাম্প্রতিক প্রবণতাটি বুদ্ধদেব বসুর বানাননীতিকে সর্বাংশে সমর্থন করে। শুধু বুদ্ধদেব বসুর 'কী-ভাবে' বানানের মধ্যকার হাইফেনটি সকলের অলক্ষ্যে উবে গেছে, এই যা।

না, নি, নে প্রভৃতি অব্যয়গুলোর কোনটা ক্রিয়াপদ থেকে আলাদা বসবে আর কোনটা ক্রিয়াপদের সঙ্গে যুক্তভাবে বসবে, সে ব্যাপারে বিশ্বভারতী বা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মে কোনো নির্দেশ ছিলো না। সমকালীন প্রচলন অনুযায়ী 'নি' এবং 'নে' ক্রিয়াপদের সঙ্গে যুক্ত ক'রে এবং ক্রিয়াপদ থেকে আলাদা ক'রে 'না' লেখা হতো। বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র-রচনাবলিতে সর্বপ্রথম দেখা যায় সবগুলোকে আলাদা করে লিখতে। রবীন্দ্র রচনাবলি প্রথম প্রকাশিত হতে থাকে ত্রিশের দশক থেকে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এর উদ্যোক্তা ছিলেন, প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় তিনি বানান সম্পর্কে লিখতে গিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানের নিয়ম যথাসাধ্য পালন করার অঙ্গীকার করেছিলেন। অব্যয় 'নি'-কে ক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করার কাজটি তিনিই শুরু করেছিলেন কিনা, এ ব্যাপারে অবশ্য সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। তবে এইসব বানানের ব্যাপারে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতামত বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হতো, এমন অনুমান করা যেতে পারে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যেহেতু এই 'নি'-কে ক্রিয়া থেকে আলাদা করে লেখার পক্ষপাতী ছিলেন, তাই তাঁরই প্রভাবে রবীন্দ্র-রচনাবলির 'নি' ফাঁক হয়ে যাওয়া সম্ভব।[৬৯] যদিও

---

[৬৬] *উত্তরতিরিশ*, পৃ. ১৯, ৩০, ৩৯; *সঙ্গ-নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ*, পৃ. ২০, ২২, ২৪।

[৬৭] *কালিদাসের মেঘদূত*, পৃ. ২২।

[৬৮] *উত্তরতিরিশ*, পৃ. ৩২, ৭৬, ৯২; *প্রভাত ও সন্ধ্যা*, পৃ. ৮৯।

[৬৯] সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের এই অভ্যাসের জন্য দ্রষ্টব্য, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *সরল ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, নবীন সংস্করণ, পৃ. ১৬৫।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর হাতের লেখায় প্রায় সব ক্ষেত্রে 'নি'-কে সংশ্লিষ্ট ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করে লিখতেন, তা সত্ত্বেও তিনি সম্পাদকমণ্ডলী এবং সুনীতিকুমারের মতো পণ্ডিতের মতকে গ্রহণযোগ্য বিবেচনায় সম্মতি প্রদান করে থাকবেন।[৭০] রবীন্দ্র-রচনাবলির এই বিযুক্ত 'নি'-কে তাই রবীন্দ্রনাথের নামে চালিয়ে দেওয়ার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। তবে বানানের কোনো নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত থাক বা না-থাক রবীন্দ্র-রচনাবলিতে মুদ্রিত হওয়ার পর এই ফাঁক সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়বে এবং মান্যতা পাবে, সেটাই স্বাভাবিক। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রথম শ্রেণির বহু লেখকের রচনায় এই 'নি'-গুলোকে অবিচ্ছিন্নভাবেই দেখা যায়। বাংলাদেশে বিযুক্ত 'নি' সর্বপ্রথম প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায় ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের নীতিমালায়।[৭১] বাংলা একাডেমীর নীতিমালাতেও তা অব্যাহত থাকে। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের বাংলা আকাদেমি এ ব্যাপারে কোনো উচ্চবাচ্য করে না। কিন্তু সেই নীতিমালার ভাষায় প্রাসঙ্গিক প্রয়োগ দেখে বোঝা যায়, তা বুদ্ধদেব বসুর বানান-অভ্যাসের অনুরূপ। বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন: 'মঞ্জুর করেনি' এবং 'করতে পারে না'।[৭২] বাংলা আকাদেমির প্রাসঙ্গিক নিয়ম লিখতে গিয়ে এক জায়গায় লেখা হয়েছে: 'সর্বত্র সম্ভব বলে মনে হয়নি' এবং 'কোনো ইঙ্গিত রাখা হচ্ছে না'।[৭৩] দেখা যাচ্ছে প্রাসঙ্গিক বানানটির ব্যাপারে বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ মোটামুটি দুই পথের পথিক। তবে এ ক্ষেত্রেও শেষ পর্যন্ত বুদ্ধদেব বসুর শৈলী জয়ী হবে কিনা, তা নিয়ে বিবেচনা করার সময় এসেছে। এই অনুমানের পেছনে সবচেয়ে বড়ো কারণ বাংলাদেশের বেশিরভাগ লেখক বুদ্ধদেব বসু গৃহীত নীতিকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেন।

বুদ্ধদেব বসু ব্যবহৃত অনেক শব্দ কথ্যভঙ্গির। এর প্রয়োগ শুধু কথাসাহিত্য এবং কাব্যের মধ্যেই তিনি সীমিত রেখেছেন, এমন নয়। প্রবন্ধ রচনার মধ্যেও তা লক্ষণীয়। তবে একই সঙ্গে

---

[৭০] এ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলির বিভিন্ন খণ্ডে মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপির ছবি দেখা যেতে পারে। প্রায় সব ক্ষেত্রেই দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর পাণ্ডুলিপিতে যায়নি, করেনি, হয়নি ইত্যাদি লিখেছেন; কিন্তু পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠায় তা ফাঁক করে যথাক্রমে যায় নি, করে নি, হয় নি ইত্যাদিভাবে লেখা হয়েছে।

[৭১] এই নীতিমালার সংকলন প্রফেসর হায়াৎ মামুদ তাঁর 'বাংলা লেখার নিয়মকানুন' বইয়ে এই বানানের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরতে গিয়ে লিখেছেন: "অনেকেই লেখেন—করিনা, যাইনা, খাইনি, বলিনি, করেনি, যেওনা, লেখেনা ইত্যাদি। আমাদের বিবেচনায়, এগুলো হবে—করি না, যাই না, খাই নি, বলি নি, করে নি, যেও না, লেখে না ইত্যাদি।" 'আমাদের বিবেচনা' বলতে তিনি তাঁর নিজ বিবেচনার কথাই বলেছেন ধরে নিচ্ছি। কিন্তু 'অনেক' বলতে তিনি যাঁদের বোঝাচ্ছেন, তাঁদের সবাইকে একপঙ্ক্তি ধরে নিয়েছেন, তা ঠিক নয়। কেননা, চলিত রীতি প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পাওয়ার পর থেকে বহু লেখকই এ ব্যাপারে 'না' এবং 'নি' প্রত্যয় দুটিকে দুইভাবে লিখতে অভ্যস্ত। 'না' হলে ক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন, আবার 'নি' হলে ক্রিয়া থেকে অবিচ্ছিন্ন। এঁদের এই অভ্যাসকে এভাবে উপেক্ষা করা, এবং রবীন্দ্র-রচনাবলিতে বহু আগে থেকে চালু হয়ে যাওয়া রীতিকে নিজের বলে দাবি করা কতোটা যথার্থ, তা বিবেচনার দাবি রাখে। হায়াৎ মামুদের প্রাসঙ্গিক মন্তব্যের জন্য দ্রষ্টব্য, হায়াৎ মামুদ, *বাংলা লেখার নিয়মকানুন : বানান ও ভাষারীতির গাইডবুক*, পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ (ঢাকা: প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ১৯৯৮, প্রথম প্রকাশ ১৯৯২), পৃ. ৭৭

[৭২] *উত্তরতিরিশ*, পৃ. ১, ১২।

[৭৩] *আকাদেমি বিদ্যার্থী বাংলা অভিধান*, পৃ. ৮৪৬ এবং ৮৪৮।

স্মরণীয়, বুদ্ধদেব বসুর কিছু গবেষণাধর্মী প্রবন্ধে তিনি যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে পুরোপুরি প্রাতিষ্ঠানিক শব্দের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। দু-একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে।

কবিতার মধ্যে বুদ্ধদেব বসু কথ্যভঙ্গি তো বটেই, পূর্ববঙ্গীয় বাক্-ভঙ্গি পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত করেন, যেমন—'কবিতারে/ ভাসায়ে দিতাম জলে, মিশায়ে মাটিতে/ পাতাঝরা হাওয়ার হত্যায়।'[৭৪] ব্যক্তিপ্রধান মন্ময়ধর্মী প্রবন্ধের মধ্যে ঠিক পূর্ববঙ্গীয় বাক্-ভঙ্গি না থাকলেও প্রচুর কথ্য শব্দ স্থান পায়। ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত 'উত্তরতিরিশ' গ্রন্থে এ জাতীয় উদাহরণ প্রচুর পাওয়া যায়, যেমন—বসলুম, অভ্যেস, চাপা দেয়া, সুদ্ধু, ভিখিরি, মা-র কোলে, হিরে-মুক্তো, খিদে, জ্যোছনা, ফিতেওলা, অসুবিধে, ঘুমোতে।[৭৫] অন্যদিকে বুদ্ধদেব বসু যখন 'কালিদাসের মেঘদূত' (১৯৫৭) বইয়ের দীর্ঘ গবেষণাধর্মী ভূমিকা লেখেন, তখন অনেক কথ্য শব্দই চেহারা বদল করে এক ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা নিতে শুরু করে। তখন 'ওপর' না লিখে তিনি 'উপর' লেখেন, 'শেকড়' না লিখে লেখেন 'শিকড়', আর সর্বত্রই ক্রিয়াবিভক্তি '-লুম'-এর জায়গা দখল করে ফেলে '-লাম'।[৭৬] তবে বুদ্ধদেব বসু তাঁর ভাষাকে যেহেতু মুখের ভাষার নিকটবর্তী নিয়ে আসার পক্ষে ছিলেন, তাই অনেক শব্দই তথাকথিত প্রাতিষ্ঠানিক হিসেবে বিবেচিত সাধুরূপ ধারণ করতে পারে না। অল্প হলেও বিষয়ভেদে বুদ্ধদেব বসুর এই বানান পরিবর্তনের বিষয়টি বিবেচনার যোগ্য।

৬. যতিচিহ্নের ব্যবহার সংক্রান্ত

যতিচিহ্নের সার্থক প্রয়োগ সর্বত্র সমরূপে ঘটাতে পারাটা খুব কঠিন কাজ। অনেক বিখ্যাত লেখক রয়েছেন, যাঁরা এইসব খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে মোটেই ভাবেন না, ভাবলেও খুব কম ভাবেন। কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর রচনায় প্রযুক্ত যতিচিহ্নের প্রয়োগ দেখে মনে হয়, সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে তিনি গভীরভাবে ভাবতেন। সব ধরনের রচনাতেই তিনি যতি-প্রয়োগের ব্যাপারে অত্যন্ত বিশুদ্ধবাদী ছিলেন। তাঁর প্রযুক্ত হাইফেন, ড্যাশ, ঊর্ধ্বকমা, উদ্ধৃতিচিহ্ন প্রভৃতির দিকে মনোনিবেশ করলেই তা বোঝা যায়।

প্রথমে হাইফেন। সাধারণত এটি বাক্যের মধ্যকার দুটি পদকে একত্র করার কাজ করে। হাইফেনের ব্যাপক ও যথাযথ প্রচলন রবীন্দ্রনাথ-হরপ্রসাদেরা শুরু করেছিলেন।[৭৭] তবে হাইফেন ব্যবহারের আধিক্যের কথা বিবেচনা করলে বুদ্ধদেব বসুই বোধ হয় সবচেয়ে এগিয়ে থাকেন। সুপরিচিত সমাসবদ্ধ শব্দ, যেখানে হাইফেন ব্যবহার না করলেও চলে, বুদ্ধদেব বসু সেসব ক্ষেত্রেও হাইফেন ব্যবহার করেন দেখে তা মনে হয়।

চল্লিশের দশক থেকেই বুদ্ধদেব বসুর এই প্রবণতা লক্ষণীয়। প্রসঙ্গত হাইফেনযুক্ত সর্বনাম ও অব্যয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। কিছু কিছু সর্বনাম ও অব্যয় সাধারণত পূর্ববর্তী পদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকে, আবার কখনো তা পরবর্তী পদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকে। বাক্যের গঠনই এই ঘনিষ্ঠতাকে স্পষ্ট করে দেয়, তার জন্য সংশ্লিষ্ট পদকে হাইফেন দিয়ে অব্যবহিত পূর্ববর্তী বা পরবর্তী পদের সঙ্গে যুক্ত না করলেও চলে। ধরা যাক বুদ্ধদেব বসুর এই

---

[৭৪] *শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর*, পৃ. ১৪।

[৭৫] *উত্তরতিরিশ*, পৃ. ১৮, ৩০, ৩০, ৩০, ৩৫, ৩৮, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৯, ৭৬, ৮২।

[৭৬] *কালিদাসের মেঘদূত*, পৃ. ২৬, ৪১, ২৮ এবং যত্রতত্র।

[৭৭] আনন্দবাজার, *তিষ্ঠ ক্ষণকাল : বাংলা বিরামচিহ্ন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (কলকাতা: আনন্দবাজার পাবলিশার্স, ১৯৯৯), পৃ. ৭১।

বাক্যাংশটি : "এই রকম একটা মোহের বশবর্তী হ'য়ে নিজের কাছেও এ-ভান করা সম্ভব যে ও-বই পড়বার যে-বিরক্তি আসলে সেটাই আনন্দ"।[৭৮] এখানে নিম্নরেখ 'এ', 'ও' এবং 'যে' শব্দ তিনটির পরে যে হাইফেনগুলো যুক্ত হয়েছে, তা না করলেও অর্থের কোনো পরিবর্তন ঘটতো না।

অভিন্ন পরপদবিশিষ্ট একাধিক পদ পাশাপাশি লেখার প্রয়োজন হলে প্রথমটির ক্ষেত্রে সমস্ত পদ লিখে পরেরটার জন্য হাইফেন লাগিয়ে শুধু পরপদ লেখার ধরন বাংলা ভাষায় ক্বচিৎ চোখে পড়ে। এর উল্টোটাও অর্থাৎ প্রথমটির ক্ষেত্রে পূর্বপদের পরে একটি হাইফেন এবং পরেরটার ক্ষেত্রে পুরো সমস্তপদ। বুদ্ধদেব বসু এই ব্যতিক্রমধর্মী হাইফেন ব্যবহার করতে গিয়ে লেখেন, 'তাঁর কর্ম সাম্রাজ্য-রক্ষা ও -বিস্তারের অঙ্গবিশেষ'।[৭৯] এভাবে না লিখে তিনি নিশ্চিন্তে লিখতে পারতেন, 'তাঁর কর্ম সাম্রাজ্য-রক্ষা ও সাম্রাজ্য-বিস্তারের অঙ্গবিশেষ'; অনেকে হয়তো এটিকে হাইফেনবর্জিতরূপে দেখতেও পছন্দ করতে পারেন, যেমন—'তাঁর কর্ম সাম্রাজ্যরক্ষা ও সাম্রাজ্যবিস্তারের অঙ্গবিশেষ'।

একাধিক শব্দের সমাসবদ্ধ রূপ গঠিত হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে সাধারণত হাইফেন যুক্ত থাকে। শব্দটির প্রচলন বৃদ্ধি পাওয়া সাপেক্ষে ক্রমে এই হাইফেন শব্দের মাঝখান থেকে উঠে যায়। বাক্যাংশ সমাসের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। এক পর্যায়ে বা লেখকভেদে এসব হাইফেন উঠে গিয়ে কখনো দুই বা ততোধিক শব্দকে এক শব্দে পরিণত করে; আবার কখনো শব্দগুলো আলাদা থেকেও এক ধরনের মুক্তসমাস—সুনীতিকুমারের পরিভাষা অনুযায়ী অসংলগ্ন সমাস—তৈরি করে। বুদ্ধদেব বসু সব ক্ষেত্রেই হাইফেন ব্যবহার করতেন। ষাটের দশকে রচিত একটি গ্রন্থের প্রথম দুই পৃষ্ঠায় স্থান পাওয়া কয়েকটি শব্দ এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃতিযোগ্য: 'বছর-বছর', 'যে-কোনো', 'চশমা-সহ', 'এক-এক', 'মন-খারাপ-করা', 'কুরে-কুরে', 'না-দেয়া', 'বার-বার', 'ঝাঁকে-ঝাঁকে', 'ফাঁকে-ফাঁকে', 'ক্রস-কান্ট্রি', 'ঝোপে-ঝাড়ে', 'নালা-ডোবায়', 'গজিয়ে-ওঠা', 'এ-রকম', 'সে-রকম', 'যতদিন-না', 'যে-অনুচ্চারণীয়', 'মনে-মনে', 'একে-একে' প্রভৃতি।[৮০]

কিছু কিছু ক্ষেত্রে হাইফেন অপরিহার্য, বিশেষত দ্বন্দ্ব সমাসের ক্ষেত্রে। এই উদাহরণেও তা রয়েছে। তবে এখানে বিশেষ আধিক্য চোখে পড়ে শব্দদ্বৈতের ক্ষেত্রে, যেমন: 'বছর-বছর', 'এক-এক', 'কুরে-কুরে', 'বার-বার', 'ঝাঁকে-ঝাঁকে', 'ফাঁকে-ফাঁকে', 'মনে-মনে', 'একে-একে' ইত্যাদি। সর্বনামীয় বিশেষণের সঙ্গে অন্য শব্দের সমাসে যেমন: 'যে-কোনো', 'সে-বিষয়ে', 'এ-রকম', 'সে-রকম', 'যে-অনুচ্চারণীয়' ইত্যাদি। দুটো উদাহরণ দ্বন্দ্ব সমাসের, যেমন: 'ঝোপে-ঝাড়ে', ও 'নালা-ডোবায়'। 'মন-খারাপ-করা', এবং 'যতদিন-না', বাক্যাংশ সমাসের উদাহরণ। 'ক্রস-কান্ট্রি' শব্দটি ইংরেজিতেই হাইফেনযুক্ত, অতএব এখানে বুদ্ধদেব বসুর বিশেষ কোনো কৃতিত্ব নেই। 'চশমা-সহ' শব্দটিও সমাসবদ্ধ; তবে এই হাইফেন আজকাল চোখে পড়ে না।

ড্যাশের আকার হাইফেনের অন্তত তিন গুণ। বাংলা ব্যাকরণে এখনো ড্যাশকে একাধিক ভাগে বিভক্ত করে চিহ্নিত করা হয় না; যেমনটা ইংরেজিতে হয়। যেমন: এন-ড্যাশ এবং এম-ড্যাশ। ইংরেজিতে প্রথমটি দুটো সংখ্যার মধ্যে বসে, এবং দ্বিতীয়টি দুটো বাক্যাংশ বা খণ্ডবাক্যের মধ্যে বসে। বুদ্ধদেব বসু তাঁর রচনায় এন-ড্যাশের ব্যবহার করেননি; তবে এম-ড্যাশের ব্যবহার

---

[৭৮] *উত্তরতিরিশ*, পৃ. ৮২।

[৭৯] *কালিদাসের মেঘদূত*, পৃ. ৪।

[৮০] সঙ্গ-নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ, পৃ. ১, ২।

তিনি খুব সচেতনভাবেই করেছিলেন। এম-ড্যাশের প্রধান দুটি ব্যবহারের একটি হলো বাক্যের প্রথম অংশকে দ্বিতীয় অংশে ব্যাখ্যা করার জন্য দুই অংশকে আলাদা করা; এবং অন্যটি হলো গর্ভবাক্য বা প্যারেনথিসিস নির্দেশ করা, যেখানে গর্ভবাক্যের দুই দিকেই দুটি ড্যাশের প্রয়োজন হয়। বুদ্ধদেব বসুর বাক্যশৈলীতে উভয় ধরনের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। তাই তাঁর রচনায় ড্যাশের বাহুল্য বেশ ভালোভাবেই চোখে পড়ে। এ বৈশিষ্ট্য তাঁর লেখক জীবনের শুরু থেকেই বজায় ছিলো। প্রথম ধরনের উদাহরণ চল্লিশের ও ষাটের দশকের দুটি গ্রন্থ থেকে:

(ক) আর তার কর্মক্ষেত্র—সে তো তাঁর বৈকুণ্ঠধাম। (*উত্তরতিরিশ*, পৃ. ৭৭)

(খ) উপরোক্ত শব্দসমূহ কবির পক্ষে যখন যথেষ্ট হয় না, তখন আছে বিবিধ বর্ণনামূলক শব্দরাজি: বিম্বাধরা, নিতম্বিনী, ভামিনী, মানিনী—এই তালিকা ইচ্ছেমতো বাড়িয়ে যাওয়া যেতে পারে। (*কালিদাসের মেঘদূত*, পৃ. ৯)

অভিন্ন বই থেকে দ্বিতীয় ধরনের উদাহরণ:

(ক) কোনো-কোনোদিন ডাক বেশ ভারি হ'তো—তার মধ্যে আবার বেশির ভাগই আমার—সে যে কী আনন্দ। (*উত্তরতিরিশ*, পৃ. ১৪৭)

(খ) ভারতীয় বিষয় নিয়ে এমন কোনো ইংরেজ মাথা খাটাননি—হোক তা ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, স্থাপত্য, কৃষি বা ব্যাকরণ—যিনি মনে-মনে না-জানতেন যে তাঁর কর্ম সাম্রাজ্য-রক্ষা ও -বিস্তারের অঙ্গবিশেষ। (*কালিদাসের মেঘদূত*, পৃ. ৪)

বুদ্ধদেব বসুর লেখায় একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো যত্রতত্র প্রচুর ঊর্ধ্বকমার ব্যবহার। তবে এই পাচুর্য কতোটা বিশ্বভারতী বা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানাননীতির প্রভাবে, আর কতোটা নিজস্ব যুক্তি ও সেই যুক্তির প্রয়োগগত, তা নির্ণয় করা কঠিন। কী কী ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বকমা ব্যবহৃত হয়ে বুদ্ধদেব বসুর রচনায় এই প্রাচুর্য সৃষ্টি করে, তার দু-একটি দৃষ্টান্ত দেখা যেতে পারে।

বিশ্বভারতীর নিয়মে ঊর্ধ্বকমাকে 'ইলেক-চিহ্ন' নাম দেওয়া হয়েছিলো। এর জন্য ঐ নিয়মে প্রয়োজন হয়েছিলো ৮টি আলাদা অনুচ্ছেদের। সাধু এবং চলিত উভয় ভাষায় কোথায় কোথায় সেই ইলেক সমর্থিত ছিলো, কয়েকটি উদাহরণ দিলেই তা বোঝা যাবে : করি' (করিয়া), ক'রবো, ক'রে, কর' (করহ/করো), পড়'-পড়' (পড়ো-পড়ো), ছিল' (ছিলো), র'বে (রহিবে), তা'র (তাহার), ভর'সা (উচ্চারণ 'ভরোশা' বোঝালে) ইত্যাদি।[৮১] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মে ঊর্ধ্বকমা যথাসম্ভব বর্জনীয় বলে উল্লেখ করা হয় বটে, কিন্তু ক্রিয়াপদের বিভিন্ন রূপের যে উদাহরণ সেই নিয়মে দেখানো হয়, তাতে একটি ক্রিয়াপদের ২৫টি রূপের মধ্যে ১১টি রূপেই ঊর্ধ্বকমা যুক্ত থাকতে দেখা যায়।[৮২] বুদ্ধদেব বসুর ব্যবহার দেখে মনে হয়, তিনি বিশ্বভারতীর নিয়মকে যতোটা অনুসরণ করেছিলেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'যথাসম্ভব বর্জনীয়' নীতিকে সেই অনুযায়ী অনুসরণ করে চলেননি। চল্লিশের দশকে প্রকাশিত 'উত্তরতিরিশ' কাব্যে তিনি ঊর্ধ্বকমার প্রয়োগ ঘটান এভাবে: হ'তো, হ'য়ে, ধ'রে, ভুলে', ক'রে, হ'লে, হ'তে, চ'লে, ব'লে,

---

[৮১] *বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ*, পৃ. ৯৪।

[৮২] তদেব, পৃ. ১০২। প্রসঙ্গত এখানে হ-ধাতুর রূপের উল্লেখ করা হলো : "হয়, হন, হও, হ'স, হই। হচ্ছে। হয়েছে। হ'ক, হ'ন, হও, হ। হ'ল, হ'লাম। হ'ত। হচ্ছিল। হয়েছিল। হব (হবো), হবে। হ'য়ো, হ'স। হ'তে, হ'য়ে, হ'লে, হবার, হওয়া।"

'পরে প্রভৃতি।[৮৩] পঞ্চাশের দশকে প্রকাশিত 'শীতের প্রার্থনা বসন্তের উত্তর' কাব্যেও বিশ্বভারতীর নিয়ম অনুসরণ ক'রে "নিঙাড়ি' " (নিঙাড়িয়া অর্থে) শব্দের প্রয়োগ ঘটাতে দেখা যায়, একইভাবে উপরে বোঝাতে লেখা হয় "'পরে"।[৮৪] কিন্তু এই দশকেই আবার ঊর্ধ্বকমা কমিয়ে আনতেও তাঁকে দেখা যায়। 'কালিদাসের মেঘদূত' কাব্যে এমন দুটি শব্দ : করতে ও করলে।[৮৫] বিশ্বভারতীর নিয়ম তো বটেই, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মেও শব্দ দুটির স্বীকৃত রূপ ছিলো 'ক'রতে এবং ক'রলে।[৮৬] বুদ্ধদেব বসু এভাবে ঊর্ধ্বকমার প্রয়োগ ক্রমে কমিয়ে নিয়ে আসতে শুরু করলেও, সম্ভবত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতির প্রতি শ্রদ্ধাবশত তিনি অসংখ্য শব্দের ঊর্ধ্বকমা আজীবন অব্যাহত রেখেছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত তিনি সেগুলোকে যে যুক্তির দ্বারা অব্যাহত রেখেছিলেন, ধারণা করা যায়, তা হলো: প্রথমত, অসমাপিকা ক্রিয়ার সেইসব ঊর্ধ্বকমা বজায় রাখা, যেগুলো অর্থবিভ্রান্তির আশঙ্কা সৃষ্টি করতে পারে; এবং দ্বিতীয়ত, সেইসব ক্রিয়াপদ, যেগুলোর নিকটতম সাধুরূপ 'ও' ধ্বনি দ্বারা উচ্চারিত এবং চলিত রীতিতেও সেই 'ও' ধ্বনি উচ্চারিত। যেমন, হ'তো বা হ'লো।[৮৭] অন্তত এই বানান দুটি দেখেও বোঝা যাবে, বুদ্ধদেব বসু তাঁর সময়ে চালু বানাননীতিগুলোকে কতোটা এবং কোনভাবে অনুসরণ করতেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী শব্দ দুটির বানান ছিলো হ'ত এবং হ'ল। অন্যদিকে বিশ্বভারতীর প্রাসঙ্গিক নিয়মের উদাহরণে হ'লো রূপ স্বীকৃত।[৮৮] অন্তত ঊর্ধ্বকমার ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসু এভাবে উভয় রীতির একটা সমন্বয় করে নিয়েছিলেন বলে আপাতদৃষ্টে মনে হয়।

উদ্ধৃতিচিহ্ন প্রয়োগের ব্যাপারে বুদ্ধদেব বসু ইংরেজি যতিচিহ্নের রীতিকে হুবহু অনুসরণের চেষ্টা করতেন বলেই মনে হয়। তবে ইংরেজিতে যেমন কিছু ক্ষেত্রে দ্বৈত উদ্ধৃতি চিহ্ন এবং কিছু ক্ষেত্রে একক উদ্ধৃতিচিহ্ন ব্যবহার সম্পর্কে কঠোরতা পালন করা হয়, বুদ্ধদেব বসু তা করেননি। তিনি 'ক্ষণিকা', 'চিত্রাঙ্গদা', 'বলাকা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ বোঝাতেও যেমন একক উদ্ধৃতিচিহ্ন ব্যবহার করেছেন, আবার প্রত্যক্ষ উক্তি, এমনকি কোনো রচনা উদ্ধৃত করতেও—এমনকি তা যদি ইংরেজি রচনাও হয়—একক উদ্ধৃতিচিহ্ন ব্যবহার করেছেন।[৮৯] একটি ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসুকে ইংরেজি ভাষার রীতি সম্পূর্ণভাবে মেনে দ্বৈত উদ্ধৃতিচিহ্ন ব্যবহার করতে দেখা যায়, তা হলো 'মেঘদূত' কাব্যের ১০৪ নং স্তবক থেকে ১১৫ নং স্তবক পর্যন্ত। এটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হলো এই জন্য যে, এখানে প্রতিটি স্তবকের শুরুতে দ্বৈত উদ্ধৃতিচিহ্নের ব্যবহার হয়েছে, কিন্তু প্রতিটি স্তবকের শেষে তা শেষ হয়নি; শেষ হয়েছে একেবারে ১১৫ নং স্তবকে গিয়ে।[৯০] অর্থাৎ ১১৫ নং স্তবকের প্রথমেও দ্বৈত উদ্ধৃতিচিহ্ন এবং শেষেও দ্বৈত উদ্ধৃতিচিহ্ন। ইংরেজি যতিচিহ্নের নিয়ম অনুযায়ী একাধিক অনুচ্ছেদ বা স্তবক উদ্ধৃত করতে এই রীতি মান্য হয়ে থাকে।

---

[৮৩] *উত্তরতিরিশ*, পৃ. ১, ২, ৩, ৪, ৬৯।
[৮৪] *শীতের প্রার্থনা বসন্তের উত্তর*, পৃ. ৩৯, ৪০।
[৮৫] *কালিদাসের মেঘদূত*, পৃ. ৩৪।
[৮৬] *বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ*, পৃ. ১০২।
[৮৭] তদেব।
[৮৮] তদেব, পৃ. ৯৬।
[৮৯] *উত্তরতিরিশ*, ৪৭, ৬।
[৯০] *কালিদাসের মেঘদূত*, পৃ. ১২১–১২৭।

৭. উপসংহার

বিখ্যাত প্রায় সব লেখকের ক্ষেত্রে দেখা যায়, আজীবন তাঁরা অভিন্ন বানানে অবিচল থাকেন না, নানা কারণে থাকা সম্ভবও হয় না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ। উনিশ শতকে তিনি যে-বানান দিয়ে তাঁর লেখার কাজ শুরু করেছিলেন, মৃত্যুর পূর্বে তা থেকে তিনি অনেকটা সরে আসেন। অন্যান্য প্রধান লেখকের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা প্রায় একই রকম ঘটে। সম্প্রতি বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের অনেক লেখক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানরীতিতে তাঁদের লেখক-জীবন শুরু করলেও বর্তমানে তাঁরা বাংলাদেশের বাংলা একাডেমী এবং পশ্চিমবঙ্গের বাংলা আকাদেমির পাশাপাশি নানা সরকারি-বেসরকারি প্রকাশনা-প্রতিষ্ঠানের বানাননীতি অনুসরণ করে থাকেন; বলা যায়, অনুসরণ করতে অনেক সময়ে বাধ্য হন। অভিন্ন কারণে একই লেখকের মুদ্রিত রচনায় একাধিক বানানরীতির ছাপ লক্ষ করা যায়। যেমন কোনো লেখক যখন পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন, তখন পাঠ্যপুস্তকের বানানরীতি তিনি মেনে নেন; তিনি যখন সাহিত্য-সাময়িকী বা দৈনিক পত্রিকায় লেখেন, তখন তাদের বানানে তা ছাপা হয়; আবার যখন বাংলা একাডেমী বা বাংলা আকাদেমিতে তাঁর লেখা প্রকাশ পায়, তখন হয়তো তা ভিন্ন বানানে দেখা যায়। বানানের ক্ষেত্রে এই ধরনের কমবেশি পরিবর্তনকে অধিকাংশ লেখক হয়তো বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে নেন না। অথবা জেনেশুনেই অনেককে প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে অর্থপূর্ণ আপস করতে হয়। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী ছিলেন—কঠোরভাবে ব্যতিক্রমী ছিলেন। তিনি চাইতেন, তিনি যে বানানে লিখেছেন, প্রকাশক যেন তার কোনো ধরনের পরিবর্তন করার সুযোগ না পায়। অভিন্ন কারণে তাঁর লেখা ছাপার পূর্বে তিনি তিন-চার বার প্রুফ দেখতেও রাজি থাকতেন।[৯১]

বুদ্ধদেব বসুর তথাকথিত এই নিজস্ব বানান কিভাবে সৃষ্টি হলো, সে ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলতে পারা না গেলেও পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে তা খানিকটা আন্দাজ করা যায়। প্রসঙ্গত দেখা যায়, বুদ্ধদেব বসু তাঁর লেখক-জীবনের সূচনায় ১৯২৫ সালে প্রকাশিত বিশ্বভারতীর একটি বাননীতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন; এবং সেই বাননীতিতে যেসব যুক্তি প্রদান করা হয়েছিলো, তার মধ্যে শব্দের উচ্চারণমুখিতা বুদ্ধদেব বসুর মতো একজন তরুণ লেখককে ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলো। নোয়াখালীর তরুণ লেখকদের 'নূতন' শব্দকে 'নোতুন' বানানে লেখার চেষ্টা সেই অনুপ্রেরণারই একটি প্রমাণ মাত্র।[৯২]

১৯৩৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাননীতির ৩য় সংস্করণের সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর উক্ত বানান-অভ্যাসের সামান্য কিছু বিরোধ ঘটে।[৯৩] তবে সেখানে কিছু বিকল্প-বিধান থাকায় বুদ্ধদেব বসুর নিজস্ব বানান খুব একটা হুমকির মুখে পড়ে না। তাছাড়া এই ধরনের উচ্চারণমুখী

---

[৯১] প্রাসঙ্গিক বিষয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নেওয়া সাক্ষাৎকারে স্মৃতিচারণ করেছেন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-র বাদল বসু, দ্রষ্টব্য, *বইয়ের দেশ*, জানুয়ারিমার্চ ২০০৯, পৃ. ১২৮২৯।

[৯২] 'নোয়াখালি,' *উত্তরতিরিশ*, পৃ. ২১১।

[৯৩] এমন বিরোধ রবীন্দ্রনাথেও দুর্লক্ষ্য নয়। তাই হয়তো তাঁকে একবার রসিকতা করে লিখতেও হয়েছিলো, "হাতের লেখায় অভ্যাস ছাড়তে পারব বলে প্রতিশ্রুতি দিতে পারব না, কিন্তু ছাপার অক্ষরে পারব।" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "বানান-বিধি," 'বাংলা শব্দতত্ত্ব,' *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ১০ম খণ্ড (কলকাতা: যূথিকা বুক স্টল, ২০০৩), পৃ. ৫১৪।

বানানের প্রতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরোক্ষ সমর্থন তাঁকে তাঁর নিজস্ব অবস্থানে অটুট থাকতে অনেকটা উৎসাহিতও করে।[৯৪]

বিশ শতকের শেষ দশকে বাংলা একাডেমী এবং বাংলা আকাদেমি নতুনভাবে যেসব বানাননীতি গ্রহণ করে, তার মধ্যে অনেকগুলোই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতির থেকে নতুন এবং এই নতুন নিয়মগুলোর বেশ কয়েকটি বুদ্ধদেব বসুর বানান-অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। যেমন, এক. তৎসম শব্দের বানানে যেখানে হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বর রয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে হ্রস্ব স্বরকে গ্রহণ করা বুদ্ধদেবীয় বানানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিলো; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানে যা গ্রহণ করা হয়নি—যদিও উভয় অ্যাকাডেমির সাম্প্রতিক বানানে তা গৃহীত হয়েছে। দুই. শুধু পদান্তরের জন্য একটি বানানের একাধিক রূপ বুদ্ধদেব বসু স্বীকার করেননি; কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তার বানানের নিয়মে বিশেষণ হলে দীর্ঘ স্বর এবং বিশেষ্য হলে হ্রস্ব স্বর প্রদানের বিধি রেখেছিলো, এই কারণে 'তৈরি' এবং 'তৈরী' দুই ভাবে লিখতে হতো। বর্তমানে উভয় অ্যাকাডেমি এই দ্বিধাবিভক্ত নীতি বর্জন করেছে। তিন. তৎসম শব্দের শেষে হলন্ত নির্দেশক হসন্ত চিহ্নের ব্যাপারে বিশ্বভারতী এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নীরবতা হসন্তগুলোকে সমর্থন করার শামিল, কিন্তু অ্যাকাডেমি দুটো সুনির্দিষ্টভাবে যাবতীয় শব্দশেষের হসন্ত বর্জনের পক্ষে, যা বুদ্ধদেব বসুর বানান-অভ্যাসের অনুরূপ।

দু-একটি ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক বানানের সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর বানান-অভ্যাসের অমিল লক্ষণীয়। বর্তমানে প্রচলিত সব বাননানীতিই ঊর্ধ্বকমার বিপক্ষে। অন্যদিকে বুদ্ধদেব বসুর বানানে প্রচুর ঊর্ধ্বকমার ব্যবহার পাওয়া যায়। শব্দশেষের ও-কার লেখার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিয়মে কম-বেশি কৃপণতা-উদারতা লক্ষণীয়। এ ব্যাপারে সর্বাধিক কৃপণ বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তক বোর্ড। কিছুটা নমনীয় বাংলা একাডেমী এবং অনেকটা নমনীয় পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। অন্যদিকে ে া-কারের ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসুর উদারতা সর্বজনবিদিত। নঞর্থক 'নি' শব্দটি পূর্ববর্তী ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হবে কি হবে না, এ ব্যাপারে বাংলা একাডেমী এবং বাংলা আকাদেমির মধ্যে খানিকটা বিরোধ রয়েছে। বুদ্ধদেব বসু নঞর্থক 'না'-কে ক্রিয়ার থেকে আলাদা ক'রে এবং নঞর্থক 'নি'-কে ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করে লিখতেন। কিন্তু বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এবং ঢাকার বাংলা একাডেমী নিয়ম করে দিয়েছে, যাতে উভয়কেই আলাদাভাবে লেখা হয়।[৯৫]

শব্দের বিকল্পহীন বানান সকলেরই কাম্য। বিশ শতকে যতোগুলো বানান-সংস্কার কমিটি তৈরি হয়েছে, তাদের সকলেরই তা মূল লক্ষ্য ছিলো, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিন্তু সেইসব কমিটি যেসব নীতিমালা প্রণয়ন করে, তার মধ্যে বিকল্প বানানের স্বীকৃতি থাকায়, শেষ পর্যন্ত সামগ্রিকভাবে অবিকল্প প্রমিত বানান অধরাই থেকে যায়। এর জন্য লেখকদের দায় যতোটা, বাননানীতি পূর্ণাঙ্গ এবং সবার নিকট তা গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠার দায়ও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। পূর্বের আলোচনায় দেখা গেছে, বুদ্ধদেব বসুর বানান-স্বাতন্ত্র্যের পেছনে বিশ্বভারতী তাঁকে কতোটা উদ্বুদ্ধ

---

[৯৪] রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিক সমর্থনের জন্য 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থের প্রায় সব লেখা থেকেই উদ্ধৃত করা যায়। তদেব।

[৯৫] পশ্চিমবঙ্গের বাংলা আকাদেমি এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোনো নিয়ম করে না, তবে তাদের বানানের নিয়মের মধ্যকার একাধিক বাক্যের মধ্যে বুদ্ধদেব বসুর বানান-অভ্যাসের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়; তাতে মনে হয়, প্রাসঙ্গিক কোনো নিয়ম থাকলে তা বুদ্ধদেব বসুর বানান-অভ্যাসের পক্ষে যেতো। প্রাসঙ্গিক নিয়মের জন্য দ্রষ্টব্য, "পরিশিষ্ট," *আকাদেমি বিদ্যাথী বাংলা অভিধান*, পৃ. ৮৪৬–৮৪৮।

করেছিলো, আবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকল্প-বিধানও কিভাবে তাঁকে সমর্থন জুগিয়ে গিয়েছিলো। শেষ পর্যন্ত বুদ্ধদেব বসুর বানান বিকল্পহীন বানানের ক্ষেত্রে বড়ো একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে টিকে থাকে।

অথচ বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এবং অন্যান্য বাংলাভাষী অঞ্চলের বাংলা ভাষাকে অদূর অভিষ্যতে অভিন্ন ভাষা হিসেবে টিকিয়ে রাখতে চাইলে প্রয়োজন একটি সর্বজনীন বানাননীতি প্রণয়ন করা এবং তা বাধ্যতামূলকভাবে চালু করা, যাতে শব্দের বানান হবে সম্পূর্ণভাবে বিকল্পহীন। কিন্তু বাংলাদেশ এবং ভারতের বাংলাভাষী অঞ্চলের সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো যেভাবে নিত্য-নতুন আইন জারি করে তা নিজেদের মধ্যে চালিয়ে যাচ্ছে, এবং কোনো কোনো মহল থেকে পুরো ভাষা-কাঠামোকেই বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা হচ্ছে, তা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে প্রয়োজন বানান বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক কর্মশালা। যেখান থেকে সকলের জন্য গ্রহণযোগ্য একটি পূর্ণাঙ্গ বানাননীতি সৃষ্টি হতে পারে। কাঙ্ক্ষিত সেই কর্মশালায় প্রচলিত সব বানাননীতির বিচার-বিশ্লেষণের পাশাপাশি বুদ্ধদেব বসু উদ্ভাবিত এবং তাঁর রচনায় প্রযুক্ত বানাননীতিও বিবেচনার যোগ্য; কারণ তিনি নিজেই শুধু তাঁর 'শৃঙ্খলিত স্বাধীনতা' ভোগ করেছেন, এমন নয়;[৯৬] তাঁর বানান-অভ্যাস দ্বারা তিনি তাঁর সমকালের এবং পরবর্তী কালের বহু খ্যাতিমান সাহিত্যিককে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৯৭]

---

[৯৬] 'শৃঙ্খলিত স্বাধীনতা' শব্দবন্ধটি হাসান আজিজুল হকের শব্দভাণ্ডার থেকে ধার করা। ২০০৯ সালের ১১ই মার্চ রাতে বর্তমান লেখকের সঙ্গে টেলিফোন-আলাপের এক পর্যায়ে তিনি এটি উচ্চারণ করেন।

[৯৭] প্রবন্ধটি রচনার পরে সুভাষ ভট্টাচার্যের "বুদ্ধদেব বসুর বাননীতি" নামের একটি প্রবন্ধ প্রবন্ধকারের চোখে পড়ে। সুভাষ ভট্টাচার্য, "বুদ্ধদেব বসুর বাননীতি," *উত্তরাধিকার*, বুদ্ধদেব বসু জন্মশতবর্ষ সংখ্যা, ২০০৮, পৃ. ৫৩৫–৫৪১। সাত পৃষ্ঠার এই প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসুর বাননীতির মূল বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করা হয়, তার প্রায় সবগুলোর সঙ্গে একমত পোষণ করা যায় এবং বর্তমান প্রবন্ধেরও তা মূল আলোচ্য। তবে সুভাষ ভট্টাচার্যের প্রবন্ধের যেসব তথ্য ও মন্তব্যের সঙ্গে একমত পোষণ করা কঠিন, তার মধ্যে অন্তত দুটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন বোধ করি: প্রথমত, বাননীতির ব্যাপারে সুভাষ ভট্টাচার্য বিশ্বভারতীর উদ্যোগের (১৯২৫) কথা উল্লেখ করেননি, যা বুদ্ধদেব বসুর বানান-চিন্তার ভিত্তি হিসেবে গণ্য হওয়ার যোগ্য; এবং দ্বিতীয়ত, তিনি বানানের ক্ষেত্রে ঔচিত্য-অনৌচিত্যের প্রশ্ন তুলে বুদ্ধদেব বসুকে সমালোচনা করেছেন, লিখেছেন, 'আমরা মনে করি, বানান-সমতার স্বার্থে ... এই রকম বানান লেখাই সংগত' (পৃ. ৫৬৮); অন্যত্র লিখেছেন, 'তাঁর মতো বিদ্বান ও মনস্ক লেখকের এই স্খলন আমাদের ব্যথিত করে। (পৃ. ৫৪১)

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, সপ্তদশ সংখ্যা ১৪১৬

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে বিধৃত সাহিত্যচিন্তা

সুজিত সরকার*

Abstract : Manik Bandhapadhya is principally a novelist of Bangla literature. Besides novels and short stories, he also wrote some poems and essays. This article examines his thoughts and ideas about liteture in his differnt types of writings, specially in novels.

১.

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮–১৯৫৬) পরিচিত মূলত কথাসাহিত্যিক হিসেবে। কথাসাহিত্যের সমান্তরালে তিনি কবিতা ও প্রবন্ধও রচনা করেছেন। সেহেতু বলা যায়, সাহিত্যের প্রায় সকল শাখায় তাঁর স্বচ্ছল বিচরণ ছিলো। তবে তিনি যেহেতু ঔপন্যাসিক হতে চেয়েছিলেন, সেহেতু কবি পরিচিতিকে আড়াল করার চেষ্টা করেছেন। দুটি খাতায় লিখিত কবিতাগুলো তিনি বক্সবন্দি করে রেখে মারা যান। মৃত্যুর চোদ্দ বছর পর তাঁর জামাই (মেয়ের স্বামী) যুগান্তর চক্রবর্তী(জ.১৯৩৩-) কবিতাগুলো বন্দিমুক্ত করে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন। কলকাতার গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত তাঁর কিছু কবিতা *মানিক গ্রন্থাবলীর* ১৩শ খণ্ডে আশ্রয়লাভ করে। সাহিত্য সম্পর্কে মানিকের স্বতন্ত্র ভাবনা ও পরিকল্পনা ছিলো। বিভিন্ন রচনায় তিনি সে সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর সেই মতামত, ভাবনা ও পরিকল্পনার বিষয়েই বর্তমান আলোচনার সূত্রপাত।

২.

একজন লেখক সাহিত্যিক ও সাহিত্যের ভাষা-শৈলী সম্পর্কে নিজের চিন্তা ও পরিকল্পনার বিষয় তাঁর বিভিন্ন রচনার মাধ্যমে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করতেই পারেন। বিশ্বের অনেক সাহিত্যিক এ সম্পর্কে তাঁদের ভাবনা ও পরিকল্পনার কথা পরিবেশন করেছেন। মানিক সেই ধারারই একজন লেখক। সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্পর্কে তাঁর ভাবনাগুলো নিজের লেখায় উপস্থাপন করেছেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯২), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) প্রমুখ প্রথিতযশা লেখক সাহিত্য এবং তার ভাষা সম্পর্কে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন সাহিত্যের ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন:

> যে ভাষা বাঙ্গালা সমাজে প্রচলিত, যাহাতে বাঙ্গালার নিত্য কার্য্য সকল সম্পাদিত হয়, যাহা সকল বাঙ্গালীতে বুঝে, তাহাই বাঙ্গালা ভাষা—তাহাই গ্রন্থাদির ব্যবহারের যোগ্য।[১]

---

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

[১] "বাঙ্গালা ভাষা: লিখিবার ভাষা," *বঙ্কিম রচনাবলী* ২য় খণ্ড (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৪০১), পৃ. ৩১৮।

এ প্রসঙ্গে তিনি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন যে অন্য ভাষার শব্দ ঋণ নিয়ে বাংলা ভাষার বাক্য রচনা করলেই কেবল তা উৎকৃষ্ট সাহিত্য হয় না। কারণ সে ভাষা সর্বজনীন নয়। সবাই বুঝতে পারে না। তাই ভাষাতত্ত্ববিদ শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তব্যের সঙ্গে সহমত প্রকাশ করে বলেছেন:

> ...সকলেই জানেন যে, বাঙ্গালা শব্দ ত্রিবিধ। প্রথম, সংস্কৃতমূলক শব্দ, যাহার বাঙ্গালায় রূপান্তর হইয়াছে, যথা—গৃহ হইতে ঘর, ভ্রাতা হইতে ভাই। দ্বিতীয়, সংস্কৃতমূলক শব্দ, যাহার রূপান্তর হয় নাই। যথা—জল, মেঘ, সূর্য্য। তৃতীয়ত, যে সকল শব্দের সংস্কৃতের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই।[২]

তারপর তিনি সাহিত্যের গুরুত্ব সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন:

> ...সাহিত্য কি জন্য ? গ্রন্থ কি জন্য ? যে পড়িবে, তাহার বুঝিবার জন্য। না বুঝিয়া, বহি বন্ধ করিয়া, পাঠক ত্রাহি ত্রাহি করিয়া ডাকিবে, বোধ হয় এ উদ্দেশ্যে কেহ গ্রন্থ লিখে না। যদি এ কথা সত্য হয়, তবে যে ভাষা সকলের বোধগম্য—অথবা যদি সকলের বোধগম্য কোন ভাষা না থাকে, তবে যে ভাষা অধিকাংশ লোকের বোধগম্য—তাহাতেই গ্রন্থ প্রণীত হওয়া উচিত। যদি কোন লেখকের এমন উদ্দেশ্য থাকে যে, আমার গ্রন্থ দুই চার জন শব্দপণ্ডিতে বুঝুক, আর কাহারও বুঝিবার প্রয়োজন নাই, তবে তিনি গিয়া দুরূহ ভাষায় গ্রন্থপ্রণয়নে প্রবৃত্ত হউন। যে তাঁহার যশ করে করুক, আমরা কখন যশ করিব না। তিনি দুই একজনের উপকার করিলে করিতে পারেন, কিন্তু আমরা তাঁহাকে পরোপকারকাতর খলস্বভাব পাষণ্ড বলিব।[৩]

নব্য লেখকদেরও বঙ্কিমচন্দ্র বারো দফা পরামর্শ দিয়েছেন। বলেছেন—যশ ও অর্থের জন্য এবং শিল্পবর্জিত বিদ্যা জাহিরের জন্য লেখা থেকে বিরত থাকতে। নতুন লেখকদের উদ্দেশে তাঁর মূল্যবান পরামর্শ হচ্ছে:

> ...লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন। যাঁহারা অন্য উদ্দেশ্যে লেখেন, তাঁহাদিগকে যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীদিগের সঙ্গে গণ্য করা যাইতে পারে। সকল অলঙ্কারের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সরলতা। যিনি সোজা কথায় আপনার মনের ভাব সহজেই পাঠককে বুঝাইতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক। কেন না, লেখার উদ্দেশ্য পাঠককে বুঝান।[৪]

বঙ্কিমচন্দ্র লেখককে লিখে বেশ কিছুদিন—অর্থাৎ দুই তিন বছর ফেলে রেখে তা সংস্কার করে প্রকাশেরও পরামর্শ দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথও সাহিত্য নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন। তাঁর *সাহিত্যের স্বরূপ* (১৩৫০) কিংবা *সাহিত্যের পথে* (১৩৪৩)সহ অন্যান্য গ্রন্থেও এ বিষয়ে অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করেছেন। সাহিত্য সৃষ্টি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো রবীন্দ্রনাথও বলেছেন:

> সকল কলাসৃষ্টিতেই সরলতার সংযম একটা প্রধান গুণ।[৫]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও সেই ধারাবাহিকতারই একজন লেখক। তাঁর বিভিন্ন রচনায় তিনিও এ বিষয়ে স্বতন্ত্র মত ব্যক্ত করেছেন।

প্রমথ চৌধুরীও বলেছেন:

---

[২] *বঙ্কিম রচনাবলী* ২য় খণ্ড, ৩১৯।

[৩] *বঙ্কিম রচনাবলী* ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২০-৩২১।

[৪] *বঙ্কিম রচনাবলী* ২য় খণ্ড, প্রবন্ধ : *বাঙ্গালার নব্য লেখকদের প্রতি নিবেদন*, পৃ. ২৩৭।

[৫] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সাহিত্যের পথে* (কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৯৪), পৃ. ৬৫।

বাক্যের বিষয় মানুষের মনোভাব।
বাক্যের উদ্দেশ্য তাহা প্রকাশ করা এবং উক্ত উদ্দেশ্যসাধনের উপায় শব্দ। সুতরাং বাক্য রসাত্মক হইতে হইলে, প্রথমত, ভাব রসাত্মক হওয়া আবশ্যক ; দ্বিতীয়ত, শব্দ রসাত্মক হওয়া আবশ্যক ; তৃতীয়ত, এরূপভাবে প্রকাশ করা কর্তব্য যাহাতে রসাত্মক ভাব রসাত্মক শব্দের সহিত সম্পূর্ণরূপে মিশ্রিত হইতে পারে।[৬]

তিনি আরো বলেছেন:

...যে রচনায় রসাত্মক ভাব সম্পূর্ণরূপ অনুরূপ ভাষায় প্রকাশিত তাহাকেই আমি কাব্য বলিয়া মানি।[৭]

সাহিত্যচিন্তা

দিবারাত্রির কাব্য (১৯৩৫) উপন্যাসে হেরম্ব আর মালতী বৌদি জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করছে। কথোকথনের এক পর্যায়ে মালতী বৌদি হেরম্বকে তার জীবনের দুটি সুখের কথা ব্যক্ত করে বলে:

'...জীবনে আমার দুটি সুদিন এসেছে। প্রথম, তোমার মাস্টারমশায় যেদিন দাদাকে পড়াতে এলেন, অন্দরের জানালায় অন্ধকারে ঠায় দাঁড়িয়ে আমি লোকটাকে দেখলাম, সেদিন। আর যেদিন আনন্দ কোলে এল। প্রসবের বেদনা কেমন জান?'
হেরম্ব জোর দিয়ে বলল, 'জানি।'
'জানো! পাগল নাকি, তুমি কি করে জানবে!'
'আমি এককালে কবিতা লিখতাম যে মালতী-বৌদি!'
'কবিতা লেখা আর প্রসববেদনা কি এক? মাথা খারাপ না হলে কেউ এমন কথা বলে! তোমাকে আর ভগবান লক্ষ্মীছাড়াতে তাহলে আর কোন প্রভেদ থাকত না বাপু। আমরা প্রসব করি ভগবানে কবিতাকে, তার তুলনায় তোমাদের কবিতা ইয়ার্কি ছাড়া আর কি! যাই হোক, আনন্দকে দেখে আমি সেদিন প্রসববেদনা ভুলে গেলাম হেরম্ব।'
'সব মা-ই তাই যায়, মালতী বৌদি।'[৮]

মায়ের সন্তান প্রসবের বেদনা আর কবিতা লেখার পূর্বে কবির মনোলোকে জমে থাকা কথা প্রকাশের উদ্যোগের মুহূর্তে যে ব্যাকুলতা, যে অস্থির বেদনা তা অভিন্ন বলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করতেন। মা সন্তান জন্ম দিয়ে তার মুখ দেখে যে আনন্দ লাভ করেন, কবিও কবিতা লেখার পর তা প্রকাশিত হলে সে রকম আনন্দ অনুভব করেন। এই দুই অনুভূতি অভিন্ন।

দিবারাত্রির কাব্য উপন্যাসকে তিনটি পর্বে বিভক্ত করে তিনি প্রতিটি পর্বের শুরুতে একটি করে কবিতা রচনা করেছেন। এটিও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবি সত্তার সঙ্গে শিল্পবোধের পরিচয় নিরূপণ করে। মনে করিয়ে দেন, তিনি কেবল কথাসাহিত্যিকই নন, কবিও। কথাসাহিত্যের প্রতি তাঁর ঝোঁক থাকলেও, ইচ্ছে করলে তিনি কবিও হতে পারতেন, এই কবিতাগুলো এবং **পদ্মানদীর মাঝি** (১৯৩৬) উপন্যাসে হোসেন মিয়ার গান রচনা ও গণেশের মুখের গান সে সাক্ষ্য দেয়।

জীবনের জটিলতা (১৯৩৩৬) উপন্যাসেও সাহিত্য রচনা সম্পর্কে মানিক বিমল নামে এক কবি চরিত্রের সংলাপে বেশ কিছু বক্তব্য পরিবেশন করেছেন।

---

[৬] প্রমথ চৌধুরী, *প্রবন্ধ সংগ্রহ* (কলকাতা: বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ১৯৮৬), পৃ. ২।

[৭] প্রমথ চৌধুরী, পৃ. ২৩।

[৮] মানিক গ্রন্থাবলী ১ম খণ্ড, উপন্যাস : *দিবারাত্রির কাব্য*, (গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ ১৯৮৬), পৃ. ১১৯-১২০।

বিমল কবিতা লেখে। তার কোনো কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়নি। সে কবিতা লেখার সমান্তরালে চাকরির খোঁজে দিনভর ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু কোথাও কোনো কাজ জোগাড় করতে না পেরে প্রতিদিনই বিধ্বস্ত হয়ে বাড়ি ফেরে। এমনি একদিন বিমল কাজের সন্ধানে শহরের নানা প্রান্তে ঘুরে বিধ্বস্ত শরীর ও মনে বাড়ি ফিরে দেখে প্রতিবেশী অঘোর বাবুর স্ত্রী শান্তা আর তার বোন প্রমীলা—ডাক নাম মিলি, ঘরের রোয়াকে বসে গল্প করছে। শান্তা ও বিমল উভয় উভয়কে পছন্দ করে। তাই শান্তা তাকে দেখে মন্তব্য করে:

> 'কোথায় টো-টো কোম্পানী করে এলেন?' প্রমীলা বলিল, 'সম্পাদকের বাড়ি বোধহয়?'
> শান্তা হাসিয়া বলিল, 'সেকি? এখনো সম্পাদকেরা আপনার বাড়িতে এসে ধর্না দেয় না? অতগুলি কবিতা ছাপলেন!'
> বিমল নীরস কণ্ঠে বলিল, 'কতগুলি কবিতা ছাপলাম?'
> 'সতেরটা।'
> 'বিমল বিস্মিত হইয়া বলিল, 'আমি কতগুলি কবিতা ছাপলাম তার হিসাব রাখার জন্য আপনি খাতা খুলেছেন নাকি?'
> 'না যে কবিতা পড়তে প্রাণ বেরিয়ে যায় তার কটা পড়লাম তা এমনি হিসাব থাকে।'
> 'আমি কাউকে আমার কবিতা পড়তে মাথার দিব্যি দিইনি।'
> 'কিন্তু জীবন দিয়েছেন। কবিতা লেখার জন্য নিজের ভবিষ্যৎটা মাটি করলেন, সে বুঝি মাথার দিব্যি দেওয়ার চেয়ে কম?'[৯]

জীবনের জটিলতা উপন্যাসে কাকীমাও কবিতা লেখেন। কাকীমার ধারণা, তিনি প্রাচীন পন্থী, তাই তার কবিতা আধুনিক সময়ের সঙ্গে তাল মেলাতে পারে না। এ ছাড়া তার আরো ধারণা যে, তাকে কেউ ছোটবেলা থেকে কবিতা লেখা শেখায়নি। এ প্রসঙ্গে বিমলের কবি ও কবিতা ভাবনার বর্ণনা দিয়েছেন পরস্পরের কথোপকথনের মাধ্যমে।

> 'সত্যি লেখেন কাকীমা?'
> কাকীমা বিনয় করিয়া বলিল, 'ভাল কি আর লিখতে পারি বাবা? আমরা হলেম সেকেলে ধরনের লোক। কবিতা লিখতে ছেলেবেলা থেকে কে আর শেখালে বল?'
> কবিতা লেখা যে লেখাপড়া শেখার মতো ছেলেবেলা হইতে কেহ শিখাইতে পারে বিমলের সে জ্ঞান ছিল না। রবীন্দ্রনাথ লেখাপড়ার বদলে কবিতা লিখিতে শিখিতেন। বোধ করি সেইজন্যই তিনি আজ অত বড় কবি। ছেলেবেলা কবিতা লেখা না শিখিয়া তার ভবিষ্যৎটা মাটি হইয়া গিয়াছে।
> 'আপনার কবিতা পড়তে দেবেন কাকীমা?'
> কাকীমা সলজ্জে বলিলেন, 'না না, সে পড়িবার মতো কবিতা নয় বাবা। যা মনে আসে লিখে যাই হিজিবিজি—
> মনে যা আসে তাই লিখিয়া ফেলিলে যে কবিতা হয় না, এ জ্ঞান কাকীমার আছে। বস্তুতঃ এই জ্ঞানটাই কবিতা লেখার সবচেয়ে বড় মূলধন। যত অঙ্ক কথা শিখিলে ডি-এসসি পাস করা যায় তার চেয়ে ঢের বেশি খাটিয়া কবিতা লিখিতে না শিখিলে কবিতা লেখা যায় না। আজ দুই বছর এই নিয়া বিমলের মন খারাপ হইয়া আছে। মনে যার কবিতা আছে সে কবি নয়, একি ট্রাজেডি জীবনে! ও চুন সুরকির স্তূপ থাকা না থাকা সমান—ওর নাম বাড়ি নয়, পরের মন ওতে বাস করিবে না।[১০]

---

[৯] মানিক গ্রন্থাবলী ১ম খণ্ড, উপন্যাস : *জীবনের জটিলতা*, পৃ. ৩০৮।
[১০] মানিক গ্রন্থাবলী ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১৮।

উচ্চশিক্ষার চেয়ে আরো বেশি আগ্রহী না হলে সাহিত্য রচনা করা যায় না। তার জন্য মানসিক প্রস্তুতি, শিল্প সচেতনতা আর জগৎকে দেখার স্বতন্ত্র দৃষ্টি থাকা অপরিহার্য। চরিত্রের মতো মানিকও বিস্মিত হন এই ভেবে যে, অন্তরে যার ভাব আছে, নিরন্তর কবিতার চাষ হয়, শিল্প সৃষ্টির দুর্বার আকাঙ্ক্ষায় সে কেনো ব্যর্থ হচ্ছে। কাকীমার এই ব্যর্থতার জন্য তিনি অনুতপ্ত হলে বা কষ্ট পেলে কিংবা নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হলেও তিনি তার কারণ হিসেবে লেখকের অর্ন্তদৃষ্টির অভাবকেই মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তবুও কবি রূপসৃষ্টির কাঙাল, বার বার সে আয়োজন করেন। নিরলস লিখে যান। রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে বলেছেন:

> এই রূপসৃষ্টির আবির্ভাব একই কবির জীবনে বার বার ঘটে থাকে। রচনার আনন্দে প্রকাশই হচ্ছে নব নব রূপে। সেই নবরূপ-আবির্ভাবের দিনে প্রত্যেক বারেই অন্তরের প্রাঙ্গণে শাঁখ বেজে ওঠে, এ কথা সকল কবিই জানে।[১১]

কাকীমারও সে চেষ্টা নিরন্তর। তিনিও রচনার আনন্দে নিরলস লিখে যান। তা কবিতা না হলেও তার চেষ্টার বিরাম নেই।

অধর কর্ম শেষে ঘরে ফিরে দেখে তার স্ত্রী শান্তা শোবার ঘরে খাতায় কী যেনো লিখছে। সে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে:

> 'কি লিখছ? কবিতা ?
> 'না।'
> 'ধোপার হিসাব?'
> 'না। এমনি হিজিবিজি কাটছি।'
> 'ওটা কবিতা লেখার প্রথম অবস্থা। হিজিবিজি কাটা দেখতে চাই না, কবিতা লিখতে আরম্ভ করলে দেখিও। দেখাবে তো?' জামা খুলিয়া সে দেয়ালে বসানো কাঠের আঙ্গুলে ঝুলাইয়া দিল। লোমশ বুকে হাত বুলাইয়া বলিল, 'কথা বলছ না যে? বোবা হয়ে গেলে নাকি? না, ভাব লেগেছে?'
> 'কি বলব?'
> 'কবিতা লিখলে আমায় দেখাবে?'
> 'কবিতা লিখব কেন?'
> 'লিখবে না?' অধর আশ্চর্য হইয়া গেল। তারপর হাসিয়া বলিল, 'সেই ভাল। লিখো না। ও রোগের চিকিৎসা নেই।'[১২]

কবি ও কবিতা সম্পর্কে এ হচ্ছে কর্মব্যস্ত ভাবাবেগহীন মানুষের কথা। কবিতা লেখা এক ধরনের রোগ, মনোরোগ—যে রোগের সত্যি কোনো চিকিৎসা নেই বলে ওসব লেখা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়েছে অধর তার স্ত্রীকে। লেখকের আর কর্মজীবীর জগৎ স্বতন্ত্র। লেখক দেশকে আর্থনীতিক ভাবে উন্নয়নের কাজে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখেন না। কিন্তু কর্মজীবী প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেন। তবে তাঁরা লেখালেখির মধ্য দিয়ে দেশ যাতে আর্থনীতিক ভাবে উন্নয়ন করতে পারে সে লক্ষ্যে সচেতন জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার দায়িত্ব পালন করেন। দেশ-জাতির সংকটে লেখক-শিল্পীই আলোর পথ নির্দেশ করেন। দুঃশাসকের এই সচেতন জনগোষ্ঠীকে ভয় বেশি। তাই মনোভূমির জমে থাকা পললে যারা চাষ দেন নিরবধি, তাঁদের ওপর দুঃশাসকের নৃশংস আক্রমণও পরিচালিত হয়। চর্যাযুগে যেমন হয়েছে, এ যুগেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। তাঁদের রচনা বাজেয়াপ্তও করে রাষ্ট্র পরিচালকের দল। দেশ থেকে বহিস্কার করা হয়, কারা প্রকোষ্ঠে ভরে

---

[১১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রবন্ধ : সাহিত্যরূপ, পৃ. ২০৬।

[১২] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, উপন্যাস : *জীবনের জটিলতা*, পৃ. ৩২০-৩২১।

নিপীড়ন করা হয়। স্ত্রী করায়ত্তহীন হবে ভয়ে কর্মজীবী অধরও কবি বিমলের প্রভাবমুক্ত থাকাকে *সেই ভালো। লিখো না। ও রোগের চিকিৎসা নেই*'—বলে মন্তব্য করে তাকে কবিতা লেখা থেকে বিরত থাকতে উৎসাহিত করেছে। শিল্পবোধহীন এ রকম স্বামীর সঙ্গ বরং শান্তাকে নিরাশ করে, সর্বকর্মে অনুৎসাহ সৃষ্টি করে। মানিকও কি কবিতা লেখাকে এই দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছেন? হয়তো না। কেনো না, তিনি নিজেও প্রথম যৌবনে কবিতা লিখেছেন। তাঁর উপন্যাসেও কবিতা ও গান যুক্তসহ শিল্প-সাহিত্য নিয়ে আলোচনাও করেছেন। যেমন বিমলের বোন প্রমীলা দাদাকে গল্প লেখার জন্য অনুরোধ করলে বিমল বলে:

> 'আমি ফরমাসী ফাঁকিবাজ সাহিত্যিক নই মিলি। তিনদিন সিগারেট না খেয়ে থেকেছি, নির্লজ্জের মতো টাকা ধার করেছি, কিন্তু বাজে লেখা একটা লিখিনি।'
> 'তবু—'
> বিমল একটু ভাবিল।
> 'আচ্ছা লিখব।'
> রাত্রি তিনটা পর্যন্ত বিমল লিখিল। সমস্ত সকালটা লেখা সংশোধন করিল এবং দুপুরবেলা টাকা আনিতে গেল।
> কেদার বলিলেন, 'সাংঘাতিক গল্প। দিস তো রে এরকম আর একটা দুটো। মাঝে মাঝে বড় বিপদে পড়ি।'[১৩]

কেবল অর্থ-লোভে লিখতে হবে কিংবা নিছক লেখা প্রকাশের লোভে লিখতে হবে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সমর্থন করেন না। লেখা বা শিল্প সৃষ্টি কখনোই ফরমাশ দিয়ে হয় না। ভেতর থেকে যদি লেখার তাগিদ অনুভব লেখক না করেন, তাহলে সেটা লেখা হবে ঠিক, কিন্তু শিল্প হবে না। তাই উৎকৃষ্ট শিল্প পণ্য নয় যে বলা মাত্রই তা সৃষ্টি করা যাবে। সত্যিকারে শিল্প সৃষ্টি করতে হলে শিল্পী অন্তর থেকে তা প্রকাশের তাগিদ অনুভব করবেন। তাই লেখা বাজারের পণ্য নয়, খাতকের চাহিদা মতো নির্ধারিত মূল্যের বিনিময়ে সরবরাহ করা যাবে। বস্তুবাদী আদর্শে আস্থাবান মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সে রকমই মনে করতেন। উল্লেখ্য, মানিক শেষ পর্যন্ত এই মতে স্থির থাকতে পারেননি। কেনো না, তাঁর অনেক রচনাই নিছক আর্থিক প্রয়োজনে সম্পাদকের হাতে তুলে দিতে হয়েছে। সেগুলো তাঁর নামের কারণে কাটতি হয়েছে। কিন্তু তা যে পুনরাবৃত্তি বা নির্ভেজাল বিশেষ রাজনীতিক মতবাদের সমর্থনে বক্তব্যধর্মী হয়ে উঠেছে, তা বলাই বাহুল্য। সেই সঙ্গে ফরমায়েশি লেখাগুলোর শিল্পমান নিয়েও প্রশ্ন উথাপনের সুযোগ আছে তুখোড় আলোচকের। তিনি নিজেও সে সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। আত্মসমালোচনা করতে দ্বিধা করেননি।

কেদার বিমলের দূর সম্পর্কের মামা। সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক। তিনি এসেছেন তার কাছে কবিতা নেয়ার জন্য। ভাগ্নের কাছে কবিতা দাবি করেন। বিমল বলে, কবিতা নেই। কেদার নাছোড়বান্দা। বলেন:

> 'বস্তা বের কর,—বাছি।'
> ভাঙ্গা সুটকেস খুলিয়া অবাক হইয়া গেলেন।
> 'খালি যে রে!'
> 'যা ছিল পুড়িয়েছি।'
> 'সব?' কেদার স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।
> 'ছেলেমানুষি লেখা সব, কি হবে রেখে?'

---

[১৩] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৩৬৫।

'যা হবার হত, পোড়াতে গেলি কেন ? আমাকে দিলি না কেন? না হয় আমি নিজের নামে ছাপতাম!'
'কি চাও বল না, কেদারমামা।'
'গল্প দে—ভাল আর ভদ্র অশ্লীল গল্প।'
'নেই।'
'টাকা দেব—দশ টাকা।'
'নেই মামা।'
আচ্ছা ভাল হলে পনেরই দেব'খন, ডাকাত কোথাকার।'
বিমল মাথা নাড়িল।
'তবে সত্যিই নেই গাধা ?'
'নেই।'
'কবিতা ? বল তাও নেই!'
'কবিতা দিতে পারি একটা।'
কবিতার নূতন খাতাটা সে কেদারের সামনে ফেলিয়া দিল। পাতা উল্টাইয়া কেদার বলিলেন, 'মোটে একটা ?'
'ওই ছাপ না, আরও দেব।'
কেদার নীরবে কবিতাটি পাঠ করিলেন। বিমলের গায়ে খাতাটা ছুঁড়িয়া দিয়া বলিলেন, 'তুই গোল্লায় যা।'[১৪]

মানসিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে সৃষ্টি হয় শিল্প। শিল্প কোনো অবজ্ঞার বিষয় নয়। তার জন্য প্রয়োজন হয় সুস্থ মানসিক আয়োজনের। শান্তার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক বিমলকে বিধ্বস্ত করে। করে মানসিকভাবে উদ্ভ্রান্ত। আর সে কারণে সে তার লেখা কবিতা পুড়িয়েছে। পুড়িয়েছে সেগুলো ছেলেমানুষিতে পরিপূর্ণ বলে। তার শিল্পমূল্য সম্পর্কেও বিমলের যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। এই দোটানায় পড়ে সে কবিতাগুলো পুড়িয়েছে। মামা কেদারকে ভালো কবিতা দিতে পারেনি। পরে অবশ্য ভালো গল্প দিয়েছিলো। কেদার সে গল্পের প্রশংসার সঙ্গে আরো লেখা দেয়ার দাবি করেন।

কবিতা সম্পর্কে তিনি বিশদ আলোচনাও করেছেন *ছন্দপতন* (১৯৫১) উপন্যাসে।[১৫] কোন্ কবিতা আবৃত্তি উপযোগী সে সম্পর্কেও তিনি মতামত ব্যক্ত করেছেন। কবি ও কবিতা কী রকম হলে ভালো কবিতা হিসেবে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকে, সে নিয়েও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপন্যাসের শুরুতে তাঁর অভিমত তুলে ধরেছেন। বলেছেন{

আমি একজন কবি।
গোড়াতে একথাটাও জানিয়ে রাখি যে আমার বয়স মোটে পঁচিশ বছর।
নীরব কবি, হবু কবি বা অখ্যাত কবি আমি নই। দু'খানা কবিতা সংকলনের রীতিমত নামকরা কবি। বই দু'খানা চারিদিকে প্রচুর সাড়া তুলেছে। আমার কবিতা নিয়ে বিশেষ করে তরুণ মহলে গুঞ্জনের অন্ত নেই।[১৬]

এ রকম পরিচয়ের এক পর্যায়ে লেখক কবি চরিত্রের সংলাপে উচ্চারণ করেন:

আমি বস্তুবাদী কবি।

---

[১৪] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৩৬৪-৩৬৫।

[১৫] গ্রন্থ রচনাকালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিকল্পনায় এই গ্রন্থের নাম ছিল *কবির জবানবন্দী*। পরে গ্রন্থ প্রকাশের সময় নাম দিলেন *ছন্দপতন*। মানিক গ্রন্থাবলী ৮ম খণ্ড, (কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৩), পৃ. ৪৫৯।

[১৬] মানিক গ্রন্থাবলী ৮ম খণ্ড, উপন্যাস : *ছন্দপতন*, পৃ. ১৬৩।

শুধু কবিতায় নয় সব বিষয়েই বস্তুবাদী।
বস্তুবাদী কবি কি ?
যে সত্যবাদী কবি। দুটো একই কথা। বস্তুই সত্য, সত্যই বস্তু।
আমি কবিতা লিখি, শব্দ মদ চোলাই করি না। আকাশ চষে আমি কাব্যফুলের চাষ করি না, মাটির পৃথিবীতে মানুষেরই জীবন নিয়ে কাব্যের ফসল ফলাই। জীবন্ত মানুষের বিচিত্র কাব্যময় প্রাণবস্তু জগৎ থেকে ভিন্ন মানব জগতের অস্তিত্ব নেই আমার কাছে। ভাব চিন্তা আবেগ অনুভূতি সবই পার্থিব জীবনের রসে পুষ্ট।
ছেলেবেলা থেকেই কবিতায় খোকামি আর ন্যাকামি আমার পিত্তি জ্বালিয়ে দিয়েছে। মনে পড়ে পনের বছর বয়সে লিখেছিলাম:

শব্দ মদ বেচা শুঁড়িগুলো
কাব্যলক্ষ্মীর দেহ চিরদিন কচি রেখে দিল।
শুঁড়িগুলো সব মরে যাক,
কাব্যলক্ষ্মী দেহে যৌবনের জোয়ার ঘনাক।

ইচ্ছারূপিণী কাব্যলক্ষ্মীর সব বয়সের বিচিত্র রূপের সঙ্গে তখনও অবশ্য আমার পরিচয় ঘটেনি, কিন্তু এ থেকে বোঝা যাবে সতেজ প্রাণবন্ত কবিতার দিকে ওই বয়সেই আমার কেমন পক্ষপাতিত্ব ছিল।
শুধু কবিতায় নয়, জীবনেও আমি বস্তুবাদী।
কবি তার কবিতার একরকম, জীবনে অন্যরকম—এটা আমার উদ্ভট ব্যাপার মনে হয়। এ যেন ব্রহ্মচারীর নারী অঙ্গ স্পর্শ না করেও শুধু ইচ্ছা শক্তির সাহায্যে পুত্রোৎপাদন।
কবি ছাড়া কবিতা হয় না। কবিতায় আত্মপ্রকাশ না করে কবির উপায় নেই। যে কোন কবির কবিতা পড়ে বলে দেওয়া সম্ভব কবি আসলে কি রকম মানুষ।[১৭]

মানিক সত্যিকারার্থেই বস্তুবাদী লেখক ছিলেন। বস্তুবাদের একটা সংজ্ঞার্থও তিনি দিয়েছেন। সত্যবাদী অর্থাৎ দায়িত্বশীল আর ভাবাবেগ বর্জন করে সমাজ ও জীবনের সঠিক চিত্র সাহিত্যে পরিবেশন করা, সমাজ সচেতন লেখকের নৈতিক কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। লেখালেখিতে আদর্শের বাণী প্রচারের সমান্তরালে দৈনন্দিন কর্মেও তার সামঞ্জস্য থাকা আবশ্যক বলে মনে করেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। একজন শিল্পীর নৈতিক দায়িত্বও সেটা। না হলে তাঁর শিল্প ও কর্ম সম্পর্কে পাঠক-সমালোচক বিরূপ সমালোচনা করার অধিকার রাখেন। শিল্পসম্মত কবিতা সম্পর্কে তিনি আলোচনার এক পর্যায়ে বলেছিলেন:

কবিতা বাজারের মাল নয়, কাজেই তার জন্য প্রচার বা বিজ্ঞাপন দরকার নেই; এ কথার ফাঁকি কুড়ি একুশ বছর বয়সেই আমার কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিল। অদৃষ্টবাদী ভাববাদী কবি নিজের কবিতার প্রচার জোরের সঙ্গে চালাতে ভয় পান, কারণ প্রচার মানে তিনি জেনে নিয়েছেন মাল কাটাবার সস্তা ফাঁকিবাজী বিজ্ঞাপন। পাছে লোকে নামের কাঙাল ভাবে এই ভয়ে তাকে উদাসীন সেজে থাকতে হয়। নিজেকে জাহির করার সস্তা কৌশল—খাতিরের মূল্যে নিজের লেখার প্রশংসা করানো—এর সঙ্গে নিজের সৃষ্টির দিকে দশজনের দৃষ্টি আকর্ষণের সুস্থ স্বাভাবিক চেষ্টা তার কাছে একাকার।

প্রত্যেক কবিই প্রচার চায়—নইলে কবিতা লেখার কোন মানে হয় না।
নীরব কবিরাই জগতের কবিদের মধ্যে সবচেয়ে হাস্যস্পদ।[১৮]

---

[১৭] মানিক গ্রন্থাবলী ৮ম খণ্ড, উপন্যাস : *ছন্দপতন*, পৃ. ১৬৩।
[১৮] মানিক গ্রন্থাবলী ৮ম খণ্ড, উপন্যাস : *ছন্দপতন*, পৃ. ১৬২।

কবি ও কবিতা সম্পর্কে এই বক্তব্যের পর মানিক কবিতা লেখার সঙ্গে *দিবারাত্রির কাব্য* উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র হেরম্বের উক্তিকে পুনরায় *ছন্দপতন* উপন্যাসে ব্যক্ত করে শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর মতামতকে আরো দৃঢ় করেছেন।

> ...একটি কবিতা লেখা কত শত বা কত হাজার মায়ের সন্তান প্রসবের প্রাণান্তকর পরিশ্রমের সামিল সেটা আমার জানা নেই, সে উদ্ভট উপমার হিসাবও কখনও করতে বসিনি। কিন্তু কবিতা লিখে আমি তো জেনেছি কি করে মানুষ কবিতা লেখে। আমি তো জেনেছি কেন আর কি ভাবে মানুষ কবি হয়।
> দেবতা দানব মহাপণ্ডিত মহাপুরুষ কারো রামায়ণ রচনার সাধ্য হয়নি কেন রত্নাকর ছাড়া, এ রহস্য আমার কাছে গোপন নেই। নোবেল-প্রাইজ পাবার পর দেশ রবীন্দ্রনাথকে সম্মান জানাতে গেলে রবীন্দ্রনাথ কেন সে সম্মানকে ঠিকমত অসম্মান করেছিলেন, পনের ষোল বছর বয়সেই আমি তো তা অনুভব করেছিলাম।
> আমি তাই একদিকে যেমন প্রাণপাত করে কবিতা লিখেছি অন্যদিকে তেমনি প্রাণপাত করে চেষ্টা করেছি দেশের মানুষ যাতে আমার কবিতা পড়ে।
> মানুষকে আমার কবিতা পড়াব—মানুষ পড়ে স্থির করবে আমার কবিতা কোন দরের। দৃঢ়ভাবে এই নীতি মেনে চলেছি বলে বিবেক আমাকে কখনো কামড়ায়নি, সস্তা আত্মপ্রচার হতে দিইনি বলে নিজের কাছে নিজেও আমি সস্তা হয়ে যাইনি।
> অনেকে অবশ্য মনে করেছে অনেক রকম। কিন্তু মানুষের ভুল বোঝার আতঙ্কে বিচলিত হয়ে ভুল করার ধাত আমার নয়।[১৯]

কবি, কবিতা এবং তার শিল্প সম্পর্কে *ছন্দপতন* উপন্যাসে মানিক বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপে আলোচনার বিস্তার ঘটিয়েছেন। এই ধরনের সংলাপে মানিক মানসের শিল্প-দর্শনের দিক অনেকটা উন্মোচিত হয়েছে। খ্যাতিমান ও প্রতিষ্ঠিত কবি সম্পর্কে মানিকের মনোভাবও এই আলোচনায় উঠে এসেছে। সভার সভাপতি রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তির জন্য শ্রীনবনাথ রায়ের নাম ঘোষণা করলে নবনাথ মঞ্চে উঠে নিজের কবিতা আবৃত্তি করেন এবং স্বরচিত কবিতা আবৃত্তির একটা ব্যাখ্যাও দেন। তাতে নবনাথের প্রেমিকা মানসী ক্ষুব্ধ হয়ে বলে:

> : একটু বিনয় তো থাকা উচিত ? রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করতে বলা হলো—
> : সেটা আমার দোষ নয়। আর বলা হয়ে থাকলেই বা কি ? এতে কি রবীন্দ্রনাথ ছোট হয়ে গেলেন ? হাজার হাজার মানুষ তার কবিতা আবৃত্তি করে আসছে, পরেও করবে। ওসব তো আমাদের সম্পদ হয়ে গেছে, স্থায়ী জিনিস। আমি না করলে আমার কবিতা আজ কে আবৃত্তি করবে ? আমি কি ভেসে এসেছি !
> : তুমি আর রবীন্দ্রনাথ !
> : তাকে ছোট করো না। চারা মাথা তুলতে চাইলে গাছের অপমান করা হয় না। তিনিও নিজের কবিতা আবৃত্তি করতেন, নিজের লেখা গান গাইতেন। তিনিই পথ দেখিয়েছেন, সাহস দিয়েছেন।
> : তবু—
> এ তবুর মানে আমি জানি। এ নিছক সংস্কার—সাংস্কৃতিক কুসংস্কার ! যেহেতু রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ এবং আমি নামহীন নগণ্য তরুণ সেইহেতু আমার নিজের কবিতার চেয়ে বেশি আপন ভাবতে হবে, বেশি খাতির করতে হবে রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে ! এ হলো মহান আত্মলোপন—মিথ্যা হলেও— উদারতা দেখিয়ে হতে হবে সুবোধ সুশীল বালক ! নিজের ছেলেকে মানুষ জগতের অতীত ও বর্তমান সব ছেলের চেয়ে বেশি ভাল বাসবে

---

[১৯] মানিক গ্রন্থাবলী ৮ম খণ্ড, উপন্যাস : *ছন্দপতন*, পৃ. ১৬৩।

> এটা স্বাভাবিক ও সঙ্গত, এতে কারো আপত্তি নেই ; রূপে গুণে মদনকে লজ্জা দেবার মতো রাজপুত্র থাকতে কোন বাপ তার কালো ছেলেকে আদর করছে এর মধ্যে সম্রাটের অপমানের প্রশ্ন কেউ কল্পনাও করবে না ; রবীন্দ্রনাথের কবিতার বদলে আমি আমার কবিতাকে তুলে ধরলে সেটা কিন্তু হবে রবীন্দ্রনাথকে অসম্মান করা !
>
> রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আজকের দিনের নতুন কবির কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। রবীন্দ্রনাথকে ছোট করা বড় করার প্রশ্নই হাস্যকর।
>
> কিন্তু কুসংস্কার যাবে কোথা ![২০]

শিল্প-সাহিত্যের অস্তিত্বের অক্ষুণ্নতা সম্পর্কেও তিনি দৃঢ় প্রত্যয় এবং উচ্চাশা ব্যক্ত করেছেন। মানসী বলেছে:

> ...রবীন্দ্রনাথের বই পড়তে ইচ্ছা হতো না। কি হবে পড়ে ? আরও ঝিমিয়ে যাব, আরও খারাপ লাগবে। আপনার আবৃত্তি শুনে বাড়ি গিয়েই আবার বই নিয়ে বসলাম, বেশ বুঝলাম রবীন্দ্রনাথকে নিয়েও চোরাকারবার চলছে।
>
> : চলবে না ? ভাতকাপড়ের চোরাকারবার যদি চলে, শিল্পসাহিত্য কখনো বাদ যায় ? কবিতার জাত থাকে ? এ সবের মধ্যে গাঁটছড়া বাঁধা। আপনারা ছেলেমানুষ, যেমন হালকা তেমনি নরম। কর্তারা যে রসে মজাতে চান সেই রসেই মজে যান। কিছুদিন জাতীয় সঙ্গীত শোনালে আপনারা দেশের জন্য ক্ষেপে ওঠেন। আবার কিছুদিন বেড়াল ছানার বৈরাগ্যের কাঁদুনি শোনালে ভাবেন, নাঃ, বেঁচে থাকা মিছে। নইলে এমন সস্তা সিনেমা দেখিয়ে আপনাদের এত সস্তা করে দেওয়া যেত ?[২১]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বস্তুবাদী চেতনায় সমৃদ্ধ এক শিল্পী ব্যক্তিত্ব। সে কারণে তিনি সহজে সত্যকে স্বীকার করেন এবং সত্য অনুসন্ধানে দৃষ্টিটাকে আরো প্রসারিত করতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হন। মিথ্যে বা আপ্ত বাক্য দিয়ে তিনি কাউকে ভোলানোর উপায়কে ঘৃণা করেন। সমস্যা-সংকটে আবর্তিত জীবনকে তিনি কাছে থেকে জানা বোঝার জন্য উদ্গ্রীব। তাই সহজেই তাঁর কবিতাকে সংগ্রামী জীবনের হাতিয়ার হিসেবেই শাণিত করেন। বলেন:

> এই মাটির জীবনকে আমি ভালোবাসি। মানুষের সংগ্রামী জীবনের মর্মবাণীকে ভাষা দিতেই আমার কবি হওয়ার সাধ।
>
> এই সহরের পাকা দালান থেকে বস্তির খোলার ঘর থেকে গ্রামের ওই খড়ের ঘরের অগণিত মানুষ আমার পথ চেয়ে আছে, উৎকীর্ণ হয়ে আছে ছন্দেও সুরে আমার আহ্বান শোনার জন্য। এ মিথ্যা নয়, অলীক কল্পনা নয়। দেহের প্রতিটি অণু পরমাণু দিয়ে আমি লক্ষ কোটি মানুষের এই অসীম ধৈর্যের প্রতীক্ষা অনুভব করি।
>
> আমায় তারা জানে না, চেনে না।
>
> কিন্তু আমি তো তাদের অবিচল দৃঢ় আহ্বান শুনি। কে তুমি আসছ নবাগত কবি, ভাষা দাও, ভাষা দাও ! আমরা তোমারি পথ চেয়ে মূক হয়ে আছি। হে আমাদের কবি, হে আমাদের নবজন্মের নবজীবনের নববসন্তের মুখর প্রতীক, আমরা তোমায় বরণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি, তুমি প্রস্তুত হয়ে এস!
>
> কী রোমাঞ্চকর প্রাণান্তকর এই কবি হবার প্রস্তুতি!...[২২]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লেখককে *কলম-পেষা মজুর* হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[২৩] তাঁর *কেন লিখি* প্রবন্ধে এই মন্তব্য করেছেন।

---

[২০] মানিক গ্রন্থাবলী ৮ম খণ্ড, উপন্যাস : *ছন্দপতন*, পৃ. ১৬৪।

[২১] মানিক গ্রন্থাবলী ৮ম খণ্ড, উপন্যাস : *ছন্দপতন*, পৃ. ১৬৫।

[২২] মানিক গ্রন্থাবলী ৮ম খণ্ড, উপন্যাস : *ছন্দপতন*, পৃ. ১৯৪।

লেখক নিছক কলম-পেষা মজুর।[২৪]

একই প্রবন্ধে তিনি লেখক সম্পর্কে বলেছেন:

> লেখার ঝোঁকও অন্য দশটা ঝোঁকের মতোই। অঙ্ক শেখা, যন্ত্র বানানো, শেষ মানে খোঁজা, খেলতে শেখা, গান গাওয়া, টাকা করা ইত্যাদির দলেই লিখতে চাওয়া। লিখতে পারা ও লিখতে চাওয়ার উগ্রতা আর লিখতে শেখার একাগ্রতার ওপর নির্ভর করে। বক্তব্যের সঞ্চয় থাকা যে দরকার সেটা অবশ্য বলাই বাহুল্য,—দাতব্য উপলব্ধির চাপে ছাড়া লিখতে চাওয়ার উগ্রতা কিসে আনবে![২৫]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্বভাবে ছিলেন কবি ও রোমান্টিক। বস্তুবাদ কিংবা বাস্তববাদ—যা-ই বলা হোক না কেনো, তাঁর কবি চিত্ত ছিলো মার্কস্‌বাদী রাজনীতিক সচেতনতার সমান্তরালে প্রবহমান। না হলে হোসেন মিয়ার মতো একজন চোরাকারবারির কণ্ঠে গান এবং রাতভর নৌকোয় মাছ ধরতে ধরতে সরল-সহজ গণেশ গ্রাম্য পালায় দেখে শেখা যে সুরে গান গায়, তাতে লেখকের রোমান্টিক চেতনারই প্রকাশ লক্ষ করা যায়। একই সঙ্গে চরিত্র ও গীতিকবিতার সুর-শিল্পের প্রতিও তাঁর পক্ষপাতিত্বের বিষয়টিও সামনে চলে আসে। সে কারণেই হোসেন মিয়ার কণ্ঠে গান, গ্রন্থের সূচনা পর্বে কবিতা সংযোজন তিনি করেছেন। তারপরও তিনি বলেছেন:

> লিখতে আরম্ভ করার আগেও বলে দেওয়া সম্ভব ছিল—যদি কোনদিন আমি লিখি ঝোঁকটা আমার পড়বে উপন্যাসের দিকে।[২৬]

তারপর তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন:

> আমার বিজ্ঞান-প্রীতি, জাত বৈজ্ঞানিকের কেন-ধর্মী জীবন-জিজ্ঞাসা, ছাত্র বয়সেই লেখকের দায়িত্বকে অবিশ্বাস্য গুরুত্ব দিয়ে ছিনিমিনি লেখা থেকে বিরত থাকা প্রভৃতি কতকগুলি লক্ষণে ছিল সুস্পষ্ট নির্দেশ যে, সাধ করলে কবি হয়তো আমি হতেও পারি; কিন্তু ঔপন্যাসিক হওয়াটাই আমার পক্ষে হবে উচিত ও স্বাভাবিক।
>
> কথাটা কী দাঁড় করাচ্ছি ? আনুষ্ঠানিকভাবে বিজ্ঞানের ছাত্র না হলে, কিঞ্চিৎ বিজ্ঞান চর্চা না করলে, উপন্যাস লেখা যায় না ? আজ পর্যন্ত যাঁরা উপন্যাস লিখেছেন তাঁরা সকলেই—?
>
> ...কথাটা এখানেই পরিষ্কার করা দরকার। সরাসরি বিজ্ঞানের কিছু শিক্ষা পাওয়া নয়, উপন্যাস লেখার জন্য দরকার খানিকটা বৈজ্ঞানিক বিচারবোধ। বিজ্ঞান-শাস্ত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে কিছু মাত্র পরিচয় না থাকলেও এ বিচারবোধ মানুষের আয়ত্ত হতে পারে। সমাজ ও জীবনে বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ প্রভাব ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।...বিজ্ঞান চর্চা না করেও এবং সম্পূর্ণরূপে নিজের অজ্ঞাতসারে হলেও ঔপন্যাসিক খানিকটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করবেন তাতে বিস্ময়ের কিছুই নেই।[২৭]

মানিক তাঁর এই বক্তব্যেরও যৌক্তিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন প্রবন্ধের নিচের লাইনে।

> সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্পর্কহীন নয়। সমাজের মাধ্যমে সে সম্পর্কের সূত্রগুলি পাওয়া যায়। সাহিত্যের তথাকথিত সবচেয়ে অবৈজ্ঞানিক অঙ্গ কবিতার গতি-প্রকৃতি বিজ্ঞানের সমকালীন বিকাশের সাথে কি ভাবে জড়িত তা খুঁজে বার করা কষ্টসাধ্য কাজ, কিন্তু উপন্যাসের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক অনেক বেশি স্পষ্ট ও ঘনিষ্ঠ। সাহিত্যের ক্ষেত্রে উপন্যাস হলো সভ্যতার অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ অবদান।

---

[২৩] মানিক গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড, প্রবন্ধ : *কেন লিখি*, পৃ. ৩৮৩।
[২৪] ঐ
[২৫] ঐ
[২৬] ঐ, প্রবন্ধ : *উপন্যাসের ধারা*, ঐ, পৃ. ৩৯৯
[২৭] ঐ, পৃ. ৩৯৯-৪০০

বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের একটা স্তর পর্যন্ত সাহিত্য ছিল উপন্যাস ছিল না। বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি সমাজ জীবন ও মানুষের চেতনায় বিশেষ পরিবর্তন ঘটানোর ফলেই সাহিত্যে উপন্যাসের আঙ্গিক প্রয়োজনীয় এবং আদরণীয় হয়।

কাব্য ও নাটকের আঙ্গিকে ভাববাদ অবাধে অত্মপ্রকাশ করেছে। কার্য ও কারণেকে রাখা গিয়েছে ভাববাদেরই স্তরে, মানে খোঁজা সম্ভব হয়েছে জীবন ও জগতের। আধ্যাত্মবাদকে টেনে আনা গিয়েছে যতখানি প্রয়োজন। কিন্তু বিজ্ঞান তো ছেড়ে কথা কয় না। বিজ্ঞানকে যে যুগে যাই ভেবে থাকুক মানুষ, বিজ্ঞানের ভিত্তি চিরদিনই স্বীকৃত বা অস্বীকৃত বস্তুবাদ। যে বিশ্বাস নিয়েই বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও গবেষণা করে থাকুন, বস্তুজগতে মানবতার বাস্তব অগ্রগতিই চিরদিন তাঁর একমাত্র লক্ষ্য।

নিত্য নতুন আবিস্কারে বিজ্ঞান বদলে দিয়ে চলে সমাজ ও জীবনকে, বদলে দিয়ে চলে মানুষের চেতনাকে। এই চেতনায় জাগে সাহিত্যের কাছে নতুন চাহিদা এবং এই চেতনা প্রতিফলিত হয় নতুন আঙ্গিকে উপন্যাস রচনায়।

গদ্য ভাষায় সাহিত্যে এল বাস্তব জীবনের পরিবেশ, চরিত্র ও ঘটনা; নতুন পদ্ধতিতে মানুষের জীবন বোধের আকাঙ্ক্ষা মেটাতে আরম্ভ করলো উপন্যাস।[২৮]

রবীন্দ্রনাথও প্রায় একই কথা বলেছেন:

> এখনকার মানুষ জীবনের যে-সব সমস্যা পূরণ করতে চায় তার চিন্তাপ্রণালী প্রধানত বৈজ্ঞানিক, তার প্রবৃত্তি বিশ্লেষণের দিকে, এইজন্যে তার মননবস্তু জমে উঠেছে বিচিত্র রূপে এবং প্রভূত পরিমাণে। কাব্যের মধ্যে তার স্থান হওয়া সম্ভব নয়।[২৯]

এ কথা অবশ্যই অনস্বীকার্য যে, গদ্যরীতির সাহিত্যেই প্রথম বাস্তব জীবনের চিত্র প্রতিফলিত হওয়ার সুযোগ আসে। কাব্যে সেটা সম্ভব ছিল না। জীবনকে নতুন আঙ্গিকে, নতুন দৃষ্টির আলোকে পর্যবেক্ষণের দুয়ার খুলে যায় গদ্যের সাহায্যে। তাই বস্তুবাদী আদর্শ প্রকাশের উন্মুক্ত প্রান্তর হয়ে যায় গদ্যসাহিত্য। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যে ভাবালুতা বা আবেগের প্রকাশ অনুধাবন করতে পেরেই গদ্যরীতিতে সাহিত্য রচনার দিকে ঝুঁকেছিলেন। আর সে কারণেই তিনি বলেছিলেন, *যদি কোনদিন আমি লিখি ঝোঁকটা আমার পড়বে উপন্যাসের দিকে*।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রগতি সাহিত্য সম্মেলনের তৃতীয় বাষিক সম্মেলনে সভাপতির বক্তব্যে সমাজ ও সাহিত্য সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলেছিলেন। তিনি আদর্শ ও সংগঠন যে নিরপেক্ষ নয় এ প্রসঙ্গে সে ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। বলেছেন—

> আদর্শে খুঁত থাকবে, অথচ সংগঠন নিখুঁত হবে, বা সংগঠনে খুঁত রেখেও নিখুঁত আদর্শ সার্থক হবে, এটা অসম্ভব। আদর্শ ও সংগঠন বা আন্দোলন পরস্পরের পরিপোষক ও পরিপূরক; অবিচ্ছিন্ন, অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। সমাজ-জীবন ও শিল্প-সাহিত্যের সম্পর্কে মার্কসিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি কি তখন আমাদের নিখুঁত ছিল? আজকের চেয়ে পরিষ।কার ধারণা ছিল শিল্পী ও সাহিত্যিকের সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে? তা নয়, দৃষ্টি তখন আমাদের অনেকখানি ঝাপসাই ছিল, আদর্শগত সমগ্রতার দিক থেকে।[৩০]

লেখক-শিল্পীদের সামাজিক দায় নিতে হবে। সমাজের কাছে সচেতন মানুষের পরিচ্ছন্নতার প্রশ্নে জবাবদিহিতা অনস্বীকার্য। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বোধ অত্যন্ত বাস্তবসম্মত। তাঁর নিজের লেখা সম্পর্কে সিতাংশবাবুর একটি লেখার জবাব লিখতে গিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করে

---

[২৮] ঐ, পৃ. ৪০০।

[২৯] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সাহিত্যের স্বরূপ*, প্রবন্ধ : *সাহিত্যের মাত্রা*, ঐ, পৃ. ১২

[৩০] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ, প্রবন্ধ : *প্রগতি সাহিত্য*, পৃ. ৩৮৫

বাংলাসাহিত্যে আত্মসমালোচনার ধারা প্রবন্ধে কিছু যৌক্তিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। আত্মসমালোচনা করে বলেছেন—

> সব কিছু বাতিল হোক বা না হোক, সব কিছুই নতুনভাবে বিচার করতে হবে। আনুষাঙ্গিক বা আংশিক সত্য যদি বলা হয়ে থাকে, তার স্থান হবে ভুলভ্রান্তি সংশোধন করা ও নতুনভাবে বিচারের ভিত্তিতে লেখা প্রবন্ধে।[৩১] পৃ. ৩৮৯

লেখক কে, তাঁর দায়িত্ব কি ইত্যাদি সম্পর্কেও *সাহিত্য সমালোচনা প্রসঙ্গে* শিরোনামের প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন—

> লেখক কে? পিতার মতো যিনি দেশের মানুষকে সন্তানের মতো জীবনাদর্শ বুঝিয়ে শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করার ব্রত নিয়েছেন। পিতার মতো, গুরুর মতো জীবনের নিয়ম অনিয়ম, বাঁচার নিয়ম অনিয়ম শেখান বলেই অল্পবয়সী লেখক-শিল্পীও জাতির কাছে পিতার মতো, গুরুর মতো সম্মান পান। দেশের মানুষের মন যোগাতে চেয়েছিল বলে কি আমাদের কিশোর সুকান্তকে দেশের আবালবৃদ্ধবণিতা এত ভালবাসে, এত সম্মান করে? দেশের মানুষকে সন্তানের মতো দেখে কাব্যের মারফতে তাদের মানুষ করার ব্রত নিয়েছিল বলেই কিশোর কবিকে জাতি পিতার আসনে বসিয়েছে।
>
> এটাই আসল কথা। দেশের লোকের সস্তা খাতিরকে লেখক-শিল্পী খাতির করেন না। দরকার হলে দেশের মানুষকে কান মলে শাসন করার অধিকার খাটাতে লেখক-শিল্পীর দ্বিধা বা ভয় হবার কথা নয়। তেতো ওষুধ খেকে পছন্দ করবে না বলে বাপ কি রুগ্ন শিশুকে ওষুধ খাওয়ানো থেকে বিরত থাকেন?[৩২]

সাহিত্যিক সম্পর্কে মানিকের এ সিদ্ধান্ত আজকের প্রেক্ষপটে কতোটা গ্রহণযোগ্য তা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। তবে এটা সত্যি, একজন শিল্পীকে নির্ভীক আর নিষ্ঠাবান হতে হবে। সমাজের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে হবে কোন্‌টা ভালো আর কোন্‌টা মন্দ। আজকে লেখকের স্বাধীনতা নেই। ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় ইত্যাদি রক্ষার মুখোশ পড়ে এক শ্রেণির অন্ধ ও স্বার্থপর মানুষ তলোয়ার উন্মুক্ত করে খুনের হুমকি দেবে কিংবা সুযোগ পেলে খুন করবে। যেমন এদেশে খুন হয়েছেন হুমায়ুন আজাদ। দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছেন দাউদ হায়দার, তসলিমা নাসরিণ প্রমুখ। হাসান আজিজুল হকসহ অনেক লেখক-শিল্পীকে হত্যার হুমকিও দেয়া হয়েছে। তাই সমাজকে শিক্ষা দেয়ার লক্ষ্যে লেখক পিতৃত্বের আসন অধিকার করবেন—এমন বক্তব্য মার্কসবাদী চিন্তায় উর্বর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরল চিন্তারই শুভবোধের প্রকাশ।

তারপরও একথা বললে অত্যুক্তি হবে না, মানিকের সাহিত্য রচনার সূচনা ঘটে আর দশজন লেখকের মতো কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে। অবশ্য তাঁর কবিতাগুলো সমকালীন কবিদের ভাষা ও আঙ্গিক স্বাতন্ত্র্যে নির্দিষ্ট। তিনি কবি হিসেবেও বিজ্ঞান মনস্ক। বিজ্ঞানীর মতো অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টির প্রখরতায় সমৃদ্ধ ছিল তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি। উপন্যাসের পক্ষে মানিক অবস্থান নিয়েছিলেন বিজ্ঞানমনস্ক চেতনার আলোকে। কবিতা ও নাটকেই যে কেবল ভাববাদ আত্মপ্রকাশ করে, এমন উচ্চারণ দৃঢ়বদ্ধ নয়। উপন্যাসেও কি তার ছোঁয়া লাগেনি? শরৎচন্দ্রের (১৮৭৬-১৯৩৮) *দেবদাস* কি ভাববাদের তাপে পরিপুষ্ট নয়? রবীন্দ্রনাথের *শেষের কবিতা* বা *দুইবোন* ? আসলে যান্ত্রিক সভ্যতার বিকাশের ফলে জীবনের গতি বৃদ্ধি হয়েছে। অর্থের চরিত্র গেছে বদলে। পাথুরে অস্ত্র কিংবা তীর-ধনুক আর তলোয়ারের পরিবর্তে আগ্নেয়াস্ত্র আবিষ্কার হয়েছে প্রতিপক্ষকে মোকাবেলা

---

[৩১] ঐ, প্রবন্ধ : *বাংলা সাহিত্যের আত্মসমালোচনা*, পৃ. ৩৮৯

[৩২] ঐ, প্রবন্ধ : *সাহিত্য সমালোচনা প্রসঙ্গ* : ৩৯৪

করার উদ্দেশ্যে। হেঁটে বা গরু-ঘোড়ার গাড়ির পরিবর্তে মানুষ মুহূর্তে পাড়ি জমাচ্ছে শত শত কিলোমিটার পথ। ইন্টারনেটে এক পলক সময়ের মধ্যে হাজার হাজার তথ্য বিশ্বময় ছড়নো সম্ভব। ব্যয়ও কম। এই গতির সমান্তরালে মানুষের চিন্তাও গতি পেয়েছে মনের গতির মতো। সুতরাং এখানে ভাববাদের ঠাঁই মিলেবে না সেটাই স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিকতার সৃষ্টি হয়েছে বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সূত্র ধরে। শিল্প ও সাহিত্যেও লেগেছে তার সুবাতাস। সে বাতাস এড়িয়ে চলা লেখক-শিল্পীর পক্ষে কি সম্ভব? মানিক সে বিষয়টি উপলব্ধি করেছিলেন নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে। আর তাই তাঁর উপন্যাস সম্পর্কে এই যৌক্তিক ব্যাখ্যা।

বস্তুবাদী লেখকেরও সাহিত্য সম্পর্কিত চিন্তার ধারাবাহিকতায় সাহিত্য রস বিষয়ে আলোচনা অনস্বীকার্য। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সে বিষয়ে আলোচনা অনুপস্থিত। সবার জনা, সাহিত্যের প্রাণ হচ্ছে রস। সে বিষয়েও বস্তুবাদী চিন্তাশীলদের একটা সিদ্ধান্ত অনিবার্য। জীবন তো আর কোনো যন্ত্র নয়। যান্ত্রিক আয়োজনের ভেতরেও প্রাণধারা সঞ্চালন শিল্প-অভিজ্ঞান সম্পন্ন প্রকৌশলী করে থাকেন। বিভিন্ন বস্তুর মডেল, তার সঙ্গে অন্যান্য বিনোদনমূলক সংযোজন শিল্প রসের পরিচয় বহন করে। নতুনকে বরণ করে নেয়ার মধ্যে সাহস থাকলেও পুরাতনকে অনুসরণ ও অনুকরণ বা স্বীকরণ না করলেও তার প্রতি সম্মান জানানোর মানসিকতা আধুনিক লেখকদের ধারণ করা বাঞ্চনীয়। কারণ পুরাতনের ওপরই নতুনের বিকাশ। রবীন্দ্রনাথও সে কথা বলেছেন এভাবে—

> আমাদের দেশের তরুণদের মধ্যে কাউকে কাউকে দেখেছি যাঁরা আধুনিক ইংরেজি কাব্য কেবল যে বোঝেন তা নয়, সম্ভোগও করেন। তাঁরা আমার চেয়ে আধুনিক কালের অধিতর নিকটবর্তী বলেই য়্যুরোপের আধুনিক সাহিত্য হয়তো তাঁদের কাছে দূরবর্তী নয়। সেইজন্য তাঁদের সাক্ষ্যকে আমি মূল্যবান বলেই শ্রদ্ধা করি। কেবল একটা সংশয় মন থেকে যায় না। নূতন যখন পূর্ববর্তী পুরাতনকে উদ্ধতভাবে উপেক্ষা ও প্রতিবাদ করে তখন দুঃসাহিক তরুণের মন তাকে যে বাহবা দেয় সকল সময়ে তার মধ্যে নিত্যসত্যের প্রামাণিকতা মেলে না। নূতনের বিদ্রোহ অনেক সময়ে একটা স্পর্ধামাত্র। আমি এই বলি, বিজ্ঞানে মানুষের কাছে প্রাকৃতিক সত্য আপন নূতন নূতন জ্ঞানের ভিত্তি অবারিত করে, কিন্তু মানুষের আনন্দলোক যুগে যুগে আপন সীমানা বিস্তার করতে পারে কিন্তু ভিত্তি বদল করে না। যে সৌন্দর্য, যে প্রেম, যে মহত্ত্বে মানুষ চিরদিন স্বভাবতই উদ্‌বোধিত হয়েছে তার তো বয়সের সীমা নেই ; কোনো আইনস্টাইন এসে তাকে তো অপ্রতিপন্ন করতে পারে না, বলতে পারে না 'বসন্তের পুষ্পোচ্ছ্বাসে যার অকৃত্রিম আনন্দ সে সেকেলে ফিলিস্টাইন'। যদি কোনো বিশেষ যুগের মানুষ এমন সৃষ্টি-ছাড়া কথা বলতে পারে, যদি সুন্দরকে বিদ্রুপ করতে তার ওষ্ঠাধর কুটিল হয়ে ওঠে, যদি পূজনীয়কে অপমানিত করতে তার উৎসাহ উগ্র হতে থাকে, তা হলে বলতেই হবে, ৰইে মনোভাব চিরন্তন মানুনস্বভাবের বিরুদ্ধে। সাহিত্য সর্ব দেশে এই কথাই প্রমাণ করে আসছে যে, মানুষের আনন্দনিকেতন চিরপুরাতন।[৩৩]

পুরাতনের পরিবর্তন অনিবার্য। প্রাকৃতিক ও আর্থনীতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের সমান্তরালেই এই পরিবর্তন আসে। তবে সে ক্ষেত্রে অতীতকে—বিশেষ করে গৌরবময় অতীতকে অবশ্যই সশ্রদ্ধভাবে স্মরণ রাখতে হবে। আজকে আমরা যেমন *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কিংবা *মহুয়া পালাকে* অতীত গৌরব বলে সম্মান করি। এইসব রচনায়ও একটা ম্যাসেজ আছে। আছে একটি জাতির সহস্র বছর পূর্বের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও আর্থনীতিক ব্যবস্থার চিত্র। বাস্তব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথও একটা ব্যাখ্য দিয়েছেন। বলেছেন—

---

[৩৩] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রবন্ধ : *সাহিত্যে আধুনিকতা*, ঐ, পৃ. ২৫

> বাস্তব সাহিত্যের বিপুল ক্ষেত্র ও আয়োজন দেশ জুড়িয়া রহিয়াছে, তাহার মধ্যে ছিটাফোঁটা অবাস্তব মুহূর্তকালও টিঁকিতে পারিবে না।

কিন্তু সেই বৃহৎ বাস্তব সাহিত্যকে চোখে দেখিলে কাজে লাগিত, একটা আদর্শ পাওয়া যাইত। যতক্ষণ তাহার পরিচয় নাই ততক্ষণ যদি গায়ের জোরে তাহাকে মানিয়া লই তবে সেটা বাস্তবিক হইবে না, কাল্পনিক হইবে।[৩৪]

৪.

আধুনিক কথাসাহিত্যের একজন লেখকের এই চিন্তা বাংলা সাহিত্যের নতুন পথ রচনার ক্ষেত্র তৈরি করেছে। আধুনিক সাহিত্যের যাত্রাকে গতিশীলও করেছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যভাবনা বলয়ের সমান্তরালে এই ধারার সম্মিলন ঘটেছে। বলা যায়, একে অপরের পরিপূরক হিসেবে অচ্ছেদ্য শিল্প-নির্মাণের পথ গড়ে তুলেছে। তাতে বাংলা সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। রবীন্দ্র চিন্তা বলয় যে পথে এগোয়নি, এই সাহিত্য চিন্তা সে ঘাটতি পূরণ করে মণি-কাঞ্চনে পরিপূর্ণ করেছে। এখানেই মানিকসাহিত্য ও সাহিত্যচিন্তার গুরুত্ব।

সমাজ ও রাজনীতিক সচেতন বস্তুবাদী চিন্তা-দর্শনে বিশ্বাসী একজন লেখক হিসেবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সমকালে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। তাঁর সমকালে কথাসাহিত্যে সমাজের নিম্ন শ্রেণি-পেশার শোষিত-বঞ্চিত মানুষদের নিয়ে এমন সচেতনভাবে সাহিত্য রচনার দায়িত্ব খুব কম লেখকই পালন করেছেন। *প্রগতি লেখক সংঘের* ঢাকার কর্ণধার সোমেন চন্দ (১৯২০-১৯৪২) অনেকটা সে দায়িত্ব পালন করেছেন। মাত্র একুশ বছর বয়সে প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিক প্রতিপক্ষের আক্রমণে তিনি নিহত হলে বাস্তববাদী ধারার সাহিত্য এপার বাংলায় খানিকটা থমকে যায়। মানিক তাঁর লেখা পড়তেন এবং সেগুলো সম্পর্কে ধারণাও রাখতেন। তাঁর অপ্রত্যাশিত মৃত্যুতে সে জন্য তিনি শোকাহত হন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে বাস্তবের কথা বারংবার উচ্চারণ করেছেন, তার অধিকাংশই নিম্নবিত্তের করুণ জীবনচিত্রের সমার্থক বলে প্রতীয়মান হয়। তিনি যে সূত্র মনে গেঁথে এমন উচ্চারণে স্থিত হয়েছিলেন, সে দর্শনও জীবন পরিক্রমার বাইরে নয়। সেটাও মানুষ সৃষ্ট আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার নতুন উদ্যোগের প্রস্তাব। তার সঙ্গে শিল্প-সাহিত্যেরও নবমাত্রা যুক্তের পরামর্শ ছিলো। সাংস্কৃতিক পথ-নির্মাণের বাইরে কোনো নতুন সমাজ-আর্থনীতি গড়ে ওঠে না। এই সংস্কৃতিই টিকিয়ে রাখে নতুন যাত্রার শক্তি ও উদ্যোগকে। তাই জীবন কেবল বাস্তবের ঘেরাটোপে বন্দি যন্ত্র নয়। সেখানে রূপ-রসের পরিচর্যাও নিয়মিত অনুশীলিত হয়। নইলে জীবন নির্ভেজাল যন্ত্রে রূপান্তরিত হবে। মার্কবাদী সাহিত্য-দর্শনও নীরস কোনো আয়োজন নয়। জীবনকে মার্কসবাদীরা কি যন্ত্র হিসেবে বিবেচনা করেন? মার্কসীয় দর্শনে এমন বিষয় অনুপস্থিত। কারণ উৎপীড়িত মানুষকে মার্কসবাদীরা শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে দৃঢ় হতে দীক্ষা দেন। জীবনকে তাঁরা সতেজ-সজীব এবং ক্রিয়াশীল করতে চাহিদা অনুযায়ী ন্যায্য প্রাপ্তির আন্দোলনকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেন। মানিকের আলোচনায় কেবল সাহিত্যের বস্তুবাদী আদর্শিক দিকটা প্রাধান্য পেয়েছে। ফলে তাঁর আলোচনা একপেশে হয়েছে বললে খুব ভুল হবে না। তাঁর যে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবেশিত হয়েছে, সে জন্য তা বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। সাহিত্য সম্পর্কিত তাঁর আলোচনা সচেতন তত্ত্ববিদ না মানলেও তাঁকে খুব দোষ দেয়া যায় না। কিন্তু তাঁর মতামত যে একটা গুরুত্বপূর্ণ

---

[৩৪] ঐ, *সাহিত্যের পথে*, প্রবন্ধ : বাস্তব, পৃ. ২১

দিককে আলোকপাত করেছে, সেটারও মূল্য অনস্বীকার্য। মহামতি লেলিনও সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, An artist great must have reflectioned in his work at least some essential aspects of his revolution.[35] তিনি এ সম্পর্কে আরো বলেছিলেন, Learn from the masses try to comprehend their action; carefully study the practical exprience of the masses.[36] জনসাধারণের জীবনবৈচিত্র্যের শিক্ষা নিয়েই মানিক সাহিত্যাঙ্গনে উপস্থিত হয়েছিলেন। জনবিচ্ছিন্ন ভাবাবাদী বিষয়ের প্রতি তাঁর ছিলো প্রবল অনীহা। সে বিষয়ে সচেতন থেকেই উচ্চারণ করছিলেন—

এবার চাষ করো,
গজাও
গজাও বিদ্রোহ,
রাশি রাশি,
সবাই বাঁচুক বিদ্রোহে।[৩৭]

অশুভ—তা সামাজিক, রাজনীতিক কিংবা সাহিত্য, সকল বিষয়ের জীবন বিচ্ছিন্ন চিন্তার বিপরীতে স্বতন্ত্র ভাবনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্য বিষয়ে তাঁরই রচনায় তার আরো অসংখ্য পরিচয় মেলে। যেমন *বৌ* গল্পগ্রন্থের উল্লেখযোগ্য গল্প লেখকের বৌ তার অন্যতম। এই সব রচনার মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য ও সাহিত্যিকচিন্তা প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর অন্যান্য রচনায়ও রাজনীতিক এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির অঙ্গনের তাঁকে একজন সাহসী কর্মী হিসেবে দেখা যায়। কথা ও কাজে—এমন কি সাহিত্যাঙ্গনেও মানিক ছিলেন অভিন্ন মাত্রার এক লেখক ব্যক্তিত্ব। এই স্বাতন্ত্র্যই তাঁকে বিশিষ্ট করেছে।

---

[৩৫] V. I. Lenin-এর এই উক্তি মোস্তফা আলী তাঁর *মানিক চেতনা* গ্রন্থের ৩৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার করেছেন। (ঢাকা, ঋত্বিক, ১৯৯১)।

[৩৬] ঐ

[৩৭] মানিক গ্রন্থাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, (গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-১৯৮৬), পৃ. ৪৯

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, সপ্তদশ সংখ্যা ১৪১৬

বিষাদ-সিন্ধু : নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত জীবন

গৌতম কুমার দাস*

Abstract: This paper attempts to study the treatment of fate by Mir Mosarraf Hossain in his famous writing, Bisadsindhu. Mir Mosarraf Hossain is a prominent figure of Bengali literature in 19th century and his popularity mostly depends on Bisadsindhu—a book widely read for its historical and religious contents. A critical analysis makes it clear that the thoughts and actions of the main characters, the birth of Azid, death of Hasan-Hossain, Mohammad Hanifa episode and above all the development of the story are totally destined by fate. In short, the fate plays the key role in determining everything. This article would probe into the detail of Mir's presentation of fate in Bisadsindhu from different angles.

ভূমিকা

বাংলা গদ্য-সাহিত্যে মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২) বিশেষ অবদান রেখেছেন। যদিও তিনি কাব্য, নাটক, প্রহসন, উপন্যাস রচনা করেছেন, তবুও তাঁর প্রধান কৃতিত্ব গদ্য-সাহিত্যে। 'রত্নবতী' (১৮৬৯) 'বসন্তকুমারী নাটক' (১৮৭৩), 'জমীদার দর্পণ' (১৮৭৩) 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' (১৮৮৯)'উদাসীন পথিকের মনের কথা' (১৮৯০) প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গদ্যরচনা। মীর মশাররফ হোসেনের শ্রেষ্ঠ রচনা 'বিষাদ-সিন্ধু' (১৮৮৫-১৮৯১)।[১] বাংলা সাহিত্যে এ বিশাল উপন্যাস তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয় ; এগুলো হল মহরম পর্ব (১৮৮৫),উদ্ধার পর্ব (১৮৮৭) ও এজিদ বধ পর্ব (১৮৯১), মহরম পর্বে উপক্রমণিকাসহ ২৭টি প্রবাহ, উদ্ধার পর্বে ৩০টি প্রবাহ ও এজিদ বধ পর্বে উপসংহারসহ ৫টি প্রবাহ রয়েছে। দীর্ঘ সাত বছর ধরে এ উপন্যাস রচিত হয়। মশাররফ হোসেনের অনবদ্য সৃষ্টি 'বিষাদ-সিন্ধু'। সমালোচকের মতে, মশাররফ হোসেন ও 'বিষাদ-সিন্ধু' একে অন্যের প্রতিশব্দ।[২] এ-উপন্যাসের কাহিনী-নির্মাণ, চরিত্র-চিত্রণ ও ভাষাসৃষ্টির ব্যাপারে ঔপন্যাসিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। 'বিষাদ-সিন্ধু' গ্রন্থাকারে প্রকাশের শতবর্ষের

---

* ড. গৌতম কুমার দাস, প্রফেসর, বাংলা বিভাগ. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়,কুষ্টিয়া।

[১] মুনীর চৌধুরী, 'বিষাদ-সিন্ধুর পুনর্বিচার' *মীর মানস*, আনিসুজ্জামান সম্পাদিত, *মুনীর চৌধুরী রচনা সমগ্র*-৩ (ঢাকা : অন্য প্রকাশ,২০০১) পৃ. ২৭।

[২] রমাপ্রসাদ দে, 'মীর মশাররফ হোসেন : মৌখিক মহাকাব্যের অনুসৃতি' অরুণ সান্যাল সম্পাদিত, *প্রসঙ্গ : বাংলা উপন্যাস* (কলকাতা : ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৯৯১) পৃ. ৪৭।

পরেও এর পাঠক জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়নি। 'বিষাদ-সিন্ধু' আজও বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্লাসিকধর্মী উপন্যাস বলে স্বীকৃত হয়ে আসছে।[৩]

'বিষাদ-সিন্ধু' নিয়তি-নির্ভর উপন্যাস

মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ-সিন্ধু' নিয়তিলাঞ্ছিত মানবভাগ্যের এক মর্মস্পর্শী গদ্য—মহাকাব্য।[৪] তিনি 'পারস্য ও আরব্য গ্রন্থ' থেকে মূল ঘটনার সারাংশ নিয়ে 'বিষাদ-সিন্ধু' রচনা করার কথা বলেছেন। তবে যেখান থেকেই তিনি এ উপন্যাসের উপাদান সংগ্রহ করে থাকেন না কেন—সেটা বড় কথা নয়, উপন্যাস হিসেবে এটি কতটা সার্থক এবং পাঠক একে কীভাবে গ্রহণ করল, সেটাই বিবেচ্য বিষয়। মুসলমানদের অতি পরিচিত কাহিনী অবলম্বনে 'বিষাদ-সিন্ধু' রচিত। এতে বিবৃত হয়েছে নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত জীবন-কাহিনী। এ সম্পর্কে আনিসুজ্জামান মন্তব্য করেছেন :

> মশাররফ হোসেন কিন্তু ধর্ম বুদ্ধির দ্বারা প্ররোচিত হয়ে উপাখ্যান রচনা করতে বসেননি– ঐতিহাসিক চেতনার দ্বারা প্রণোদিত হয়ে তো নয়ই। কারবালা কাহিনীর মধ্যে নিয়তি পিড়ীত মানব ভাগ্যের যে করুণ লীলাখেলা প্রত্যক্ষ করে মাইকেল মধুসূদন এই বিষয় নিয়ে মহাকাব্য রচনার প্রেরণা অনুভব করেছিলেন, ধর্ম নিরপেক্ষ সেই প্রবল মানবীয় চেতনাই মশাররফ হোসেনকে 'বিষাদ-সিন্ধু' রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে।[৫]

'বিষাদ-সিন্ধু' মূলত চরিত্র-প্রধান উপন্যাস,কাজেই এ উপন্যাসে রয়েছে অসংখ্য চরিত্র। চরিত্রগুলো দু'শ্রেণীতে বিভক্ত; একদিকে রয়েছে হযরত মুহাম্মদ (স:) এর বংশধর, এদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো—তাঁরা অত্যন্ত সৎ ও মহৎ, তাঁরা নিয়তি ও বিধাতাকে একান্তভাবে বিশ্বাস করেন।[৬] অন্যদিকে পুরুষ চরিত্রের মধ্যে এজিদ,মারোয়ান,আবদুল্লাহ জেয়াদ, সীমার আব্দুল জব্বার এবং নারী চরিত্রের মধ্যে জয়নাব জায়েদা,মায়মুনা অন্যতম। এ সব চরিত্রের অনেকেই নিয়তির ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল।

'বিষাদ-সিন্ধু'র কাহিনী ও চরিত্র বিশ্লেষণে নিয়তির আধিপত্য নির্ণয়

'বিষাদ-সিন্ধু'র শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রয়েছে নিয়তির আধিপত্য। নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত এ উপন্যাসের শুরু হয়েছে নিয়তির প্রসঙ্গ দিয়েই। মশাররফ হোসেন 'উপক্রমণিকা'য় লিখেছেন :

> একদা প্রভু মোহাম্মদ প্রধান প্রধান শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে উপবেশন করিয়া ধর্মোপদেশ প্রদান করিতেছিলেন,সেই সময় স্বর্গীয় প্রধান দূত 'জিব্রাইল' আসিয়া তাঁহার নিকট পরম কারুণিক পরমেশ্বরের আদেশবাক্য কহিয়া অন্তর্ধান হইলেন। ... প্রভু মোহাম্মদ নম্রভাবে কহিলেন, তোমাদের মধ্যে কাহারও সন্তান আমার প্রাণাধিক প্রিয়তম হাসান-হোসেনের পরম শত্রু হইবে। হাসানকে বিষপান করাইয়া মারিবে

---

[৩] অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত* (কলকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা.লি. ১৯৯২) পৃ. ৪৬১।

[৪] আবুল আহসান চৌধুরী, *মীর মশাররফ হোসেন : সাহিত্যকর্ম ও সমাজচিন্তা* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬) পৃ. ১২৭।

[৫] আনিসুজ্জামান, *মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য* (কলকাতা : মুক্তধারা, ১৯৯১) পৃ. ২০৬।

[৬] সেলিম জাহাঙ্গীর, *মীর মশাররফ হোসেন : জীবন ও সাহিত্য* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩) পৃ. ১৪২।

> এবং হোসেনকে অস্ত্রাঘাতে নিধন করিবে।'... ভাই সকল ! ঈশ্বরের নিয়োজিত কার্যে বাধা দিতে এ জগতে কাহারও সাধ্য নাই; তাঁহার কলম রদ করিতে কাহারও ক্ষমতা নাই। তাঁহার আদেশ অলঙ্ঘনীয়।... তোমাদের মধ্যে এই প্রিয়তম মাবিয়ার এক পুত্র জন্মিবে; সেই পুত্র জগতে এজিদ নামে খ্যাত হইবে; সেই এজিদ হাসান-হোসেনের পরম শত্রু হইয়া প্রাণবধ করাইবে। যদিও মাবিয়া এ পর্যন্ত বিবাহ করেন নাই, তথাচ সেই অসীম জগন্নিধান জগদীশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন হইবার নহে, কখনই হইবে না।[৭]

মাবিয়া ধর্ম সাক্ষী করে বিবাহে অস্বীকৃতি জানান, কিন্তু দৈবক্রমে তিনি 'অশীতিবর্ষীয়া বৃদ্ধাকে' বিবাহ করতে বাধ্য হন এবং যথাসময়ে তাঁর পুত্র সন্তান হওয়ার পর তিনি দামেস্ক বসবাসের সিদ্ধান্ত নেন। এ সময় 'প্রভু মোহাম্মদ কহিলেন, মাবিয়া ! দামেস্ক কেন, এই জগৎ হইতে অন্য জগতে গেলেও ঈশ্বরের বাক্য লঙ্ঘন হইবে না।'[৮] নিয়তির কাছে পারজিত হতে হয় মাবিয়াকে। এজিদ আব্দুল জব্বারের স্ত্রী জয়নাবকে দেখার পর,তাঁকে পাওয়ার জন্য কূটকৌশল অবলম্বন করেন। মাবিয়া এজিদকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করেন। অন্যদিকে মাবিয়া-পত্নী পুত্রের জন্য অন্যায়কেও সমর্থন করেন। আব্দুল জব্বার সুন্দরী, প্রেমময়ী, ধর্মপরায়ণা, সতী-সাধ্বী স্ত্রী পেয়েও 'নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে' এজিদের ঐশ্বর্য দেখে ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন। আব্দুল জব্বার নিজের ভাগ্যের পরিবর্তনের জন্য এজিদ-মারওয়ানের ষড়যন্ত্রে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে গৃহত্যাগ করে ফকির হন। এজন্য তিনি দায়ী করেন নিজ কর্মফলকে। জয়নাবও নিয়তিতে বিশ্বাসী। আব্দুল জব্বারের পরিণতি এবং বিধবা হওয়ার জন্য তিনি দায়ী করেন নিয়তিকে। তাঁর মনে হয়েছে আব্দুল জব্বারের 'সংসারে ঘৃণা, পরিণামে ফকিরী গ্রহণ। সকলই সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা। আমার অদৃষ্টে যাহা লেখা ছিল,তাহা হইয়া গেল। বিধবা হইলাম। পূর্ণ বয়সে স্বামী-সুখে বঞ্চিত হইলাম।'[৯] স্বামীপরিত্যক্ত হওয়ার পরে মোসলেমের কাছে আক্কাস,এজিদ ও হাসানের বিবাহের প্রস্তাব পেয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন :

> দয়াময় ঈশ্বর আমাকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন,যে প্রকারে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে নিয়োজিত করিয়াছেন,বিধাতা অদৃষ্টফলকে যাহা যাহা অঙ্কিত করিয়াছেন,তাহা অখন্ডনীয় এবং অনিবার্য। ...ধন-সম্পত্তি,রাজ্য বা রূপের আমি প্রত্যাশী নহি।...আমার বৈধব্যব্রত পূর্ণ হইলেই প্রভু হাসান যে সময়ে আমাকে দাসিত্বে গ্রহণ করিবেন,আমি মনের আনন্দে সেই সময়েই সেই পবিত্র চরণে আত্মসমর্পণ করিব। অন্য কোন প্রার্থীর কথা আর মুখে আনিব না।[১০]

অদৃষ্টের কথা ভেবেই সুপুরুষ আক্কাসের বিষয়বৈভব, এজিদের রাজপ্রাসাদে রাজভোগের পরিবর্তে ইহকাল-পরকালের মুক্তির লক্ষ্যে বিত্তহীন হাসানকে স্বামী হিসেবে গ্রহণের দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন জয়নাব। পার্থিব ধন-সম্পত্তি, সুখ বিলাসের চেয়ে অপার্থিবই তাঁর কাছে বড় হিসেবে দেখা দিয়েছে। পরবর্তীকালে তাঁকে না পেয়ে এজিদ একে একে হাসান-হোসেনসহ তাঁদের বংশধরদের অনেককে হত্যা করেন এবং জীবিতদের ওপর চালান কঠিন নির্যাতন।

---

[৭] মীর মশাররফ হোসেন, *বিষাদ-সিন্ধু* (ঢাকা : আজকাল প্রকাশনী, ২০০৩) পৃ. ৯।

[৮] *বিষাদ-সিন্ধু*, উপক্রমণিকা, পৃ. ১০।

[৯] এজিদ বধ পর্ব, ৩য় প্রবাহ, পৃ. ২২৮।

[১০] মহরম পর্ব, ৫ম প্রবাহ, পৃ. ২৩।

এজিদের নির্দেশে দামেস্কের কারাগারে অনেকের সঙ্গে বন্দী অবস্থায় জয়নাবের মনে হয়েছে তিনিই 'বিষাদ-সিন্দু'র সমস্ত করুণ ঘটনার জন্য দায়ী। তিনি ভেবেছেন :

> হায় ! কোথায় আমি জয়নাব।... আমার নিজ জীবনের আদি অন্ত ঘটনা মনোযোগের সহিত ভাবিয়া দেখিলে প্রত্যক্ষ প্রমাণের সহিত সপ্রমাণ হইবে, এই হতভাগিনীই বিষাদ-সিন্ধুর মূল। জয়নাব এই মহা প্রলয়কাণ্ডের মূল কারণ ! হায় ! হায় ! আমার জন্যই নূর নবী মোহাম্মদের পরিবার পরিজনপ্রতি এই সাংঘাতিক অত্যাচার।... আমারই জন্য জাএদার কোমলান্তরে হিংসার সূচনা। এ হতভাগিনীর রূপ-গুণেই জাএদার মনের আগুন দ্বিগুণ ত্রিগুণ পঞ্চগুণে বৃদ্ধি। ... সপত্নীবাদে মনের আগুন কি নির্বাণ হয়? সপত্নী ছাড়িয়া শেষে স্বামীকেই আক্রমণ করে। মন যাহা চায়, নিয়তির বিধান থাকিলে তাহা পাইতে কতক্ষণ। ...জাএদার মনসাধ পূর্ণ করিতে মায়মুনার আবশ্যক।... যদি জয়নাব হতভাগিনী হাসানের দাসী শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিতা না হইত, যদি রূপ গুণ, না থাকিত,যদি স্বামীসোহাগিনী না হইত, তাহা হইলে জাএদার হস্তে কখনই বিষ উঠিত না।[১১]

এজিদ সৈন্য-সামন্ত নিয়ে মৃগয়ায় যাওয়ার সময় জয়নাবকে প্রথম দেখে তাঁকে পেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু জয়নাব কোনোদিনই এজিদকে পছন্দ করেননি বা তাঁকে পেতেও চাননি বরং চিরকাল তাঁকে ঘৃণা করেছেন। দামেস্কে বন্দী অবস্থায় এসেও তিনি এজিদকে দেখতে চাননি, কিন্তু দেখতে বাধ্য হয়েছেন। এ বিষয়ে তিনি বলেছেন, 'পাপীর চক্ষু, এ পাপচক্ষে কখনই দেখিব না, ইচ্ছা ছিল। কিন্তু নিয়তির বিধানে সে প্রতিজ্ঞা রহিল না। দামেস্কে আসিবা মাত্রই এজিদের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে হইল।'[১২] শেষপর্যন্ত তাঁর দৃঢ় মনোবল এবং অসীম সাহসের কাছে পরাজিত হতে হয় এজিদকে।

এজিদের পিতা মাবিয়া অসুস্থ, কিন্তু সেদিকে তাঁর কোনো লক্ষ্য নেই। তিনি জয়নাবকে পাওয়ার চিন্তায় এতটা ব্যাকুল যে, আহার-নিদ্রা পর্যন্ত ভুলে গেছেন। তাঁর ধারণা সহজেই জয়নাব তাঁকে বিবাহে সম্মত হবে। 'আজ খাদ্য-সামগ্রী যথাস্থানেই পড়িয়া রহিয়াছে, সেবকগণ প্রভুর আহারের প্রতীক্ষায় কিঞ্চিৎ দূরে বসিয়া কত কি বলিতেছে, মৃদু মৃদুভাবে নানাপ্রকার অকথ্য কথনে এজিদের নিন্দা করিতেছে,'ঈশ্বর দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছে, কি করিব উপায় নাই' এই বলিয়া নিজ নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছে।'[১৩] এ উদ্ধৃতি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, এজিদের সেবকগণও প্রবলভাবে নিয়তিতে বিশ্বাসী। এজিদ জয়নাবকে না পেয়ে হাসানের পরম শত্রু হয়ে দাঁড়ান। এজিদের পরামর্শে মারওয়ান মায়মুনার সহযোগিতায় হাসানকে হত্যার পরিকল্পনা করেন জায়েদার মাধ্যমে। হাসানের প্রথম স্ত্রী হাসনেবানু, দ্বিতীয় স্ত্রী জায়েদা। অদৃষ্টে বিশ্বাসী জায়েদা স্বামীর ভাগ কাউকে দিতে চান না। হাসানের সঙ্গে জয়নাবের বিবাহের পর জাএদা স্বামীকে আপন করে না পেয়ে মায়মুনার কাছে দুঃখ করে বলেছিলেন :

> কৌশলে স্বমী-বশ,মন্ত্রের গুণে স্বামীর মন ফিরান,মন্ত্রে ভালবাসা,ঔষধের গুণে স্বামী বশে আনা –এ সকল বড় লজ্জার কথা। স্বাভাবিক মনে যে আমার হইল না,তাহার জন্য আর কেন? সকলই অদৃষ্টের লেখা।[১৪]

---

[১১] এজিদ বধ পর্ব, ৩য় প্রবাহ, পৃ. ২২৭।

[১২] তদেব, পৃ. ২৩১।

[১৩] মহরম পর্ব, ৬ষ্ঠ প্রবাহ, পৃ. ২৫।

[১৪] মহরম পর্ব, ১৩শ প্রবাহ, পৃ. ৪৫।

এ কথা মুখে বললেও মনে-মনে জয়নাবকে হিংসা করতেন 'সপত্নীর ঈর্ষানলে দগ্ধীভূত জাএদা'। মায়মুনার বহু চেষ্টার পরে এজিদের রাজরাণী ও সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার প্রাপ্তির লোভে তিনি হাসানকে হত্যা করতে সম্মত হলে মায়মুনা মহাসন্তুষ্ট হয়ে বলেন, 'বোন ! এতদিনে যে বুঝিয়াছ,সেই ভাল। আর বিলম্ব নাই, কোন সময়ে কাহার অদৃষ্টে কি ঘটে,কে বলিতে পারে? যত বিলম্ব হইবে ততই তোমার অমঙ্গলের ভাগ বেশি হইবে।'[১৫] মায়মুনার সহযোগিতায় জাএদা প্রথমে বিষমিশ্রিত মধু পান করান হাসানকে। বিষের জ্বালায় জর্জড়িত হাসানের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে জাএদা বলেন, 'সকলই আমার কপালের দোষ। মধুতে এমন হইবে তাহা কে জানে?'[১৬] অদৃষ্টে বিশ্বাসী হাসান জয়নাবকে বলেন, 'গতরাত্রে জাএদার গৃহে বাস করিব ইচ্ছা ছিল, দৈববশে এমনি একটি ঘটনা ঘটিল যে, সমস্ত রাত্রি পেটের বেদনায়, শরীরের জ্বালায় অস্থির ছিলাম।'[১৭] পরবর্তী রাত্রে জাএদার গৃহে পুনরায় বিষমিশ্রিত খেজুর খেয়ে হাসান মনে মনে বলেন :

> আমি জ্ঞানপূর্বক জাএদার কোন অনিষ্ট করি নাই, কোন প্রকার কষ্টও দিই নাই। জয়নাবকে বিবাহ করিয়াছি বলিয়াই কি জাএদা আমার প্রাণ লইতে সংকল্প করিয়াছে? স্বহস্তে পতিবধে প্রবৃত্ত হইয়াছে ? ... স্ত্রী ও স্বামীতে দেহ ভিন্ন বটে, কিন্তু আমি তো আর কিছুই ভিন্ন দেখি না। স্বামী ও স্ত্রী এক দেহ হইতে পারে না বলিয়াই ভিন্নভাবে থাকে; কিন্তু আত্মা এক, মন এক, আশা এক, ভরসা এক, প্রাণ এক–সকলই এক। কিন্তু কি দুঃখ ! কি ভয়ানক কথা ! হ্যাঁ অদৃষ্ট ! আমারও সেই এক আত্মা এক প্রাণ স্ত্রীর–তার হস্তে স্বামী বিনাশের বিষ ! কি পরিতাপ। যেই কমল হস্ত স্বামীর জীবন-প্রদীপ নির্বাণের জন্য প্রসারিত! আর এ স্থানে থাকিব না বনে বনে পশু পশুপক্ষীর সহবাসে থাকাই ভাল। এ পৃথিবীতে আর থাকিব না।[১৮]

বিষমিশ্রিত মধু ও খেজুর খেয়ে বিষক্রিয়ায় কষ্ট পেয়েও অলৌকিকভাবে সুস্থ হয়ে হাসান গৃহ ত্যাগ করে প্রধান প্রধান মিত্রদের নিয়ে মুসালনগরে যান বাঁচার আশায়। কিন্তু নিয়তির হাত থেকে নিস্তার পান না তিনি। এ সম্পর্কে মশাররফ লিখেছেন:

> কপাল মন্দ হইলে তাহার ফলাফল ফিরাইতে কাহারও সাধ্য নাই। মুসালনগরে আসিয়া কয়েক দিন থাকিলেন। জাএদার ভয়ে গৃহ পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু অদৃষ্টলিপি যাহা, তাহাই রহিয়া গেল। যখন কপাল টলিয়া যায়, দুঃখ-পথের পথিক হইতে হয়, তখন কিছুতেই আর নিস্তার থাকে না। এক জাএদার ভয়ে গৃহত্যাগ করিয়া মুসালনগরে আসিলেন, কিন্তু সেরূপ কত জাএদা শত্রুতা সাধনের জন্য তাঁহার অপেক্ষা করিতেছিল, তাহা কি তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন?[১৯]

মুসালনগরের একচক্ষুবিহীন বৃদ্ধ হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর জাতশত্রু ছিলেন। সেই বৃদ্ধের বিষযুক্ত বর্শার আঘাতে হাসান প্রাণে বেঁচে গেলেও চরম আহত হয়ে প্রিয় মিত্র আব্বাসকে বলেছেন: 'আমার অদৃষ্টে কি আছে জানি না, আমি কাহারও মন্দ করি নাই, তথাচ আমার শত্রুর

---

[১৫] মহরম পর্ব, ১৪শ প্রবাহ, পৃ. ৪৭।
[১৬] তদেব, পৃ. ৪৮।
[১৭] মহরম পর্ব, ১৪শ প্রবাহ, পৃ. ৫০।
[১৮] তদেব, পৃ .৫০-৫১।
[১৯] মহরম পর্ব, ১৫শ প্রবাহ, পৃ.৫১।
[২০] তদেব,পৃ.৫৩

শেষ নাই।...আমি ভাবিয়াছিলাম, জাএদা আমার পরম শত্রু,এখন দেখি,জগৎময় আমার শত্রু।'[২০] অসুস্থ হাসান গৃহে প্রত্যাবর্তন করার পর তাঁর প্রথম স্ত্রী এবং হোসেন তাঁকে যত্ন করেন। এসময় কোনো খাদ্যসামগ্রী আগে না খেয়ে হাসনেবানু হাসানকে খেতে দিতেন না। হাসনেবানুকে হাসান বলেছেন, 'অদৃষ্টের লেখা খণ্ডাইতে কাহারও সাধ্য নাই। তোমার যাহাতে সন্দেহ দূর হয়, তুমি সেই প্রকারে আমার আহারীয় ও পানীয় সমুদয় দ্রব্য সাবাধানে ও যত্নে রাখিও।'[২১] অত্যধিক সতর্কতা সত্ত্বেও জাএদার বিষমিশ্রিত পানি পান করে মারা যান হাসান। স্বামীকে হত্যা করে মোটেই অনুতপ্ত না হয়ে জাএদা 'অদৃষ্টফলকের লিখিত লিপির প্রতি' নির্ভর করে সমস্ত চিন্তা দূর করে দামেস্কে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

হাসানের মতো হোসেনও নিয়তিতে বিশ্বাসী। তাঁর জীবনেও নিয়তি প্রভাব বিস্তার করেছে। হাসানের মৃত্যুর পর হোসেন নিরাপত্তার কথা ভেবে পবিত্র রওজা শরীফে বাস করতেন। সেখানে প্রবেশ করে হোসেনের প্রাণবধ সম্ভব নয়,তাই মারওয়ান ও ওতবে অলীদ ছদ্মবেশে তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী সেজে কৌশলে রওজা শরীফে এজিদের সৈন্যদের আক্রমণের কথা বলেন। এ সময় হোসেন তাঁদেরকে বলেন :

> আমার মরণের জন্য তোমরা ব্যাকুল হইও না,কোন চিন্তা করিও না। আমি মাতামহের নিকট শুনিয়াছি,দামেস্ক কিংবা মদিনায় কখনই কাহারও হস্তে আমার মৃত্যু হইবে না। আমার মৃত্যুর নির্দিষ্ট স্থান, 'দাস্ত কারবালা' নামক মহাপ্রান্তর। যতদিন পর্যন্ত সর্বপ্রলয়কর্তা সর্বেশ্বর আমাকে কারবালা-প্রান্তরে না লইয়া যাইবেন,ততদিন পর্যন্ত কিছুতেই কোন প্রকারে আমার মরণ নাই।[২২]

কুফাধিপতি আব্দুল্লাহ জেয়াদ এজিদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে হোসেনের ক্ষতি সাধনের চেষ্টায় লিপ্ত হন। কুফার রাজ্য, ধন, সৈন্যসামন্ত সমস্ত কিছু হোসানের নামে উৎসর্গ করে তাঁকে রাজসিংহাসনে বসার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি প্রেরণ করেন আব্দুল্লাহ জেয়াদ। জেয়াদের পত্র পাঠ করে হোসেন মদিনাবাসীকে বলেন, 'ভাই সকল ! আপনারা কেন কষ্ট পাইতেছেন ? যদি কুফার অন্নজল ঈশ্বর আমার অদৃষ্টে লিখিয়া থাকেন,তবে আপনারা আমার কৃতদোষ মার্জনা করিবেন।'[২৩] গুরুজন ও মদিনাবাসীর নিষেধ সত্ত্বেও হোসেন কুফা যেতে বদ্ধপরিকর। তিনি বলেন, 'এজিদের হস্তে কিংবা তাহার সৈন্যের হস্তে বিধি যদি আমার জীবন-নাশের বিধি করিয়া থাকেন,তবে তাহা নিশ্চয়ই ঘটিবে। যেখানেই কেন যাই না,আমার প্রাণহন্তা সেখানেই উপস্থিত হইবে। কারণ জগদীশ্বরের কার্য অনিবার্য।'[২৪] বিবি সালেমা হোসেনকে কুফায় গমনে নিষেধ করে বলেন:

> আব্দুল্লাহ জেয়াদ যাহাই লিখুক, আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতেছি,তুমি কখনই কুফায় গমন করিও না-হযরতের রওজা ছাড়িয়া কোন স্থানে যাইও না। হযরত আমাকে বলিয়া গিয়াছেন যে,হোসেন আমার রওজা পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিলে অনেক প্রকার বিপদের আশঙ্কা। আমি পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতেছি, তুমি কখনই রওজা হইতে বাহির হইও না। এখানে কাহারও ভয় নাই,

---

[২১] তদেব, পৃ. ৫৫।

[২২] মহরম পর্ব, ২০শ প্রবাহ, পৃ. ৭১।

[২৩] মহরম পর্ব, ২২শ প্রবাহ, পৃ. ৭৫।

[২৪] তদেব, পৃ. ৭৭।

> কোন প্রকারের শত্রুতা সাধন করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই,তুমি স্বচ্ছন্দে নিশ্চিন্ত ভাবে রওজায় বসিয়া থাক।[২৫]

কুফায় গিয়ে হোসেনের পিতার যে অবর্ণনীয় কষ্ট ও যন্ত্রণা পেতে হয়েছিল, সে কথা স্মরণ করিয়ে ওম্মে কুলসুম বিরক্ত হয়ে হোসেনকে বলেন, 'ঈশ্বর অদৃষ্টফলকে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা রদ করিবার কাহারও সাধ্য নাই। তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর।'[২৬] হোসেন সপরিবারে ছয় হাজার সৈন্য নিয়ে কুফার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে পথ ভুলে নিয়তি-নির্ধারিত কারবালা প্রান্তরে উপস্থিত হয়ে সঙ্গীগণকে বলেন, 'মাতামহের বাক্য অলংঘনীয়; পথ ভুলিয়া আমরা কারবালায় আসিয়াছি।... অদৃষ্টে যাহা লেখা আছে, তাহাই ঘটিবে, এক্ষণে চিন্তা বিফল।'[২৭]

অন্যদিকে আব্দুল্লাহ জেয়াদ এজিদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে আগে থেকেই কারবালা প্রান্তরের ফোরাত নদী সৈন্য দিয়ে ঘিরে রাখার ব্যবস্থা করেন, এবং ঘোষণা দেন, হোসেনের মস্তক যে ব্যক্তি দামেস্কে আনবে তাকে লক্ষমুদ্রা পুরস্কার দেওয়া হবে। পুরস্কার প্রাপ্তির আশায় 'সীমার অতি দর্পে বলিতে লাগিল–আর কেহই পারিবে না, আমিই হোসেনের মাথা কাটিব, কাটিব–নিশ্চয় কাটিব; পুরস্কার আমিই লইব, আর কেহই পারিবে না। হোসেন মাথা না লইয়া সীমার এ নগরে আর আসিবে না। এই সীমারের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।'[২৮] কারবালা প্রান্তরে এজিদের পরামর্শে হোসেন ও তাঁর সঙ্গীদের খাদ্য ও পানীয় থেকে বঞ্চিত করে আব্দুল্লাহ জেয়াদ। পানি না পেয়ে হোসেনের আত্মীয় ও সঙ্গীদের অনেকেরই মৃত্যু হয়। এ অবস্থায় পানির জন্য হোসেন যুদ্ধে গমনের সময় সকলকে বলেন :

> ইহাতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, ঈশ্বরের কোন আজ্ঞা আমার দ্বারা সাধিত হইবে, মাতামহের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইবে। আমি ঈশ্বরের দাস, ঈশ্বরের নিয়োজিত কার্যে আমি বাধ্য। সেই কার্য সাধনে আমি সন্তোষের সহিত সম্মত। মানুষ জন্মিলেই মরণ আছে,তবে সেই দয়াময় কি অবস্থায় কখন কাহাকে কালের করালগ্রাসে প্রেরণ করেন, তাহা তিনি জানেন।[২৯]

ইমাম হোসেন অশ্বে আরোহণ করে ফোরাত নদীর দিকে অগ্রসর হয়ে শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করেন। তাঁর অস্ত্রের সামনে এজিদের কোনো সৈন্য দাঁড়াতে পারে না; অনেকে নিহত হয়, অনেকে পালিয়ে যায়। এ অবস্থায় অস্ত্রশস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করে ফোরাত-স্রোতের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে জলে নেমে তিনি পানি হাতে নিয়েও পান করেন না, পানির জন্য যাদের জীবন বিসর্জন দিতে হয়েছে তাদের কথা ভেবে। অস্ত্রহীন হোসেনকে আব্দুল্লাহ জেয়াদ, ওমর, অলীদ, সীমারসহ অনেক সৈন্য 'বিষাক্ত লৌহশর' নিক্ষেপ করেন। কিন্তু কোনো শরই হোসেনের গায়ে লাগে না। শেষ পর্যন্ত সীমারের তীরে হোসেন আহত হন, এবং সীমারের হাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। দীর্ঘ সময় ধরে আহত হোসেনের শির বিচ্ছিন্ন করতে ব্যর্থ হলে সীমারকে তিনি বলেন:

> সীমার ! আমি এখনই মরিব।... মাতামহ বলিয়া গিয়াছেন, 'রক্তে-মাংসে গঠিত হইলেও যে বক্ষ লোমশূন্য, যে বক্ষ পাষাণময়, সেই লোমশূন্য বক্ষই তোমার

---

[২৫] তদেব, পৃ. ৭৬।
[২৬] তদেব।
[২৭] মহরম পর্ব, ২৪শ প্রবাহ, পৃ. ৯৭।
[২৮] মহরম পর্ব, ২৩শ প্রবাহ, পৃ. ৮১।
[২৯] মহরম পর্ব, ২৫শ প্রবাহ, পৃ. ১১৩।

> কাতল; যাহার বক্ষ লোমশূন্য তাহার হস্তেই তোমার নিশ্চয়ই মৃত্যু'; মাতামহের বাক্য অলংঘনীয়। সীমার, তোমার বক্ষের বস্ত্র খুলিয়া ফেল।... সীমার গাত্রের বসন উন্মোচন করিয়া হোসেনকে দেখাইল। নিজেও দেখিল। হোসেন সীমারের বক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দুই হস্তে দুই চক্ষু আবরণ করিলেন।... তীরবিদ্ধ স্থানে অস্ত্র বসাইয়া আমার মস্তক কাটিয়া লও।[৩০]

হোসেনের কথামত সীমার হোসেনের দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করতে সমর্থ হন। আগেই বলা হয়েছে, সীমারের হাতেই হোসেনের মৃত্যু পূর্বনির্ধারিত ছিল, সময়ের ব্যবধানে তাই হলো। এখানে নিয়তি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, নিয়তির হাত থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব। হাসান যে দুর্বল ছিলেন, তা নয়। মদিনা থেকে এজিদের সেনাবাহিনীকে তিনি একবার বিতাড়িত করেছিলেন, যুদ্ধ করেই। আবার কারবালার প্রান্তরেও অসীম সাহসের সঙ্গে তিনি যুদ্ধ করেছেন; যদিও সর্বক্ষণ দৈবকেই বিশ্বাস করতেন। প্রতিপক্ষকে প্রায় বিতাড়িত করেও বিনা প্রতিবাদে মৃত্যুকে বরণ করেন, কারণ বিধাতার তাই অভিপ্রায়।[৩১] যুদ্ধে যাওয়ার আগে হোসেন জয়নালকে কোলে নিয়ে বলেছিলেন, 'আমি বিদায় হইলাম, আমার জন্য কাঁদিও না। কেয়ামতে আমার সঙ্গে অবশ্যই দেখা হইবে। তুমি তোমার মায়ের নিকট থাকিও; কখনই শিবিরের বাহির হইও না, এজিদ তোমাদের কিছুই করিতে পারিবে না।'[৩২] পরবর্তীকালে এজিদ জয়নালকে বন্দী করেও তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারেননি। এজিদের বন্দীগৃহ থেকে জয়নাল পালিয়ে যান নির্বিঘ্নে। তাঁর সন্ধানের জন্য অলীদ ও মারওয়ান গভীর রাতে ছদ্মবেশে হানিফার শিবিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁরাও নিয়তি-নির্ভর হয়ে পড়েন। তাঁদের সম্পর্কে মশাররফ লিখেছেন

> অলীদের চক্ষেও আজ নিদ্রা নাই। মহাবীর-হৃদয় আজ মহাচিন্তায় অস্থির। এ যুদ্ধের পরিণাম ফল কি ? সময়ের যে প্রকার গতি দেখিতেছি, শেষ ঘটনায় নিয়তিদেবী যে কোন দৃশ্য দেখাইয়া এ অভিনয়ের যবনিকা পাতন করিবেন, তাহা তিনিই জানেন।[৩৩]

হাসান-হোসেনের একান্ত অনুগত বীরযোদ্ধা মসলেমের মৃত্যুর পরে তাঁর দু'পুত্রের করুণ মৃত্যু হয়েছিল। মসলেমের পুত্রদ্বয়কে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলেন কুফা নগরের বিচারপতি কাজী সাহেব। কিন্তু তাঁদের নিয়তিতে মৃত্যু অবধারিত ছিল,তাই কুফা থেকে নির্বিঘ্নে বেরিয়ে গিয়েও 'অদৃষ্ট ফেরে পথ ভুলে' তাঁরা পুনরায় কুফায় ফিরে আসেন, 'দুই ভাই এ দৈব ঘটনার কিছুই বুঝতে পারেন' না । আব্দুল্লাহ জেয়াদ মসলেমের পুত্রদের 'শিরচ্ছেদে'র জন্য সহস্র মুদ্রা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। তাঁদের রূপলাবণ্য দেখে মায়ার বশবতী হয়ে জেয়াদ বন্দী বালকদ্বয়কে হত্যা না করে কারাগারে আটক রাখার ব্যবস্থা করেন। কারাধ্যক্ষ মাস্কুর গভীর রাতে তাঁদেরকে কারমুক্ত করে বলেন, 'তোমরা আমার সঙ্গে সঙ্গে আইস, কোন চিন্তা নাই। আমি তোমাদিগকে রক্ষা করিব। ইহাতে আমার অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে।'[৩৪] কিন্তু 'অদৃষ্টলিপি খণ্ডাতে' পারে না

---

[৩০] মহরম পর্ব, ২৬শ প্রবাহ, পৃ.১১৯।
[৩১] সেলিম জাহাঙ্গীর, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৮।
[৩২] মহরম পর্ব, ২৫শ প্রবাহ, পৃ. ১১৪।
[৩৩] উদ্ধার পর্ব, ২৭শ প্রবাহ, পৃ. ১৯৫।
[৩৪] মহরম পর্ব, ২৩শ প্রবাহ, পৃ .৮৫।

কেউ। বালকদ্বয় আবারও পথ ভুলে হারেসের হাতে ধরা পড়েন। হারেসের স্ত্রী ও পুত্রগণ জীবন বিসর্জন দিয়েও তাঁদের বাঁচাতে পারেন না।

হাসানের পুত্র কাসেমের সঙ্গে হোসেনের কন্যা সখিনার বিবাহটা ছিল পূর্ব-নির্ধারিত। হাসান মৃত্যুর আগে এ বিবাহের প্রস্তাব করেছিলেন, হোসেনের নির্দেশে কাসেম এমন সময় বিবাহ করেন, যখন যুদ্ধে যেতে হয় তাঁকে। কাজেই বিবাহোত্তর জীবন-যাপনের সুযোগ থেকে তাঁরা ছিলেন বঞ্চিত। হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর বংশধরদের চরম বিপদের সময় আলী-হানিফার পুত্র মোহাম্মদ হানিফা তাঁদের ত্রাণকর্তা হিসেবে অবতীর্ণ হন। এ বিষয়ে হযরত মুহম্মদ (সঃ) ফাতেমাকে বলেছিলেন:

> যে সময়ে প্রিয় পুত্র হোসেন কারবালার মহাপ্রান্তরে এজিদের আজ্ঞায় সীমার-হস্তে শহীদ হইবে, তৎকালে তোমার বংশে এক জয়নাল আবেদীন ভিন্ন পুরুষপক্ষে আর কেহ থাকিবে না; তোমার আত্মীয়-স্বজন, ভগিনী, পুত্রবধূরা এজিদের সৈন্যহস্তে কারবালা হইতে দামেস্কে বন্দীভাবে আসিবে, তাহাদের কষ্টের সীমা থাকিবে না। সেই কঠিন সময়ে এই মোহাম্মদ হানিফা যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিবে, জয়নাল আবেদীনকে মদিনার সিংহাসনে বসাইবে।[৩৫]

মোহাম্মদ হানিফা অত্যন্ত শক্তিশালী হয়েও তিনি ছিলেন নিয়তিতে বিশ্বাসী। এজিদকে পরাজিত করে বন্দীদের মুক্তির ব্যাপারে তিনি ছিলেন আশাবাদী। তবুও তাঁর মনে হয়েছে, 'যাহা অদৃষ্টে আছে, ঘটিবে।'[৩৬] তাঁর প্রধান সৈন্যধ্যক্ষ ও যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ গাজী রহমান মুখে যা বলেন, তা সত্যে পরিণত হয়। এজিদের প্রেরিত দূত তাঁকে জানিয়েছেন যে, এজিদের অনুমতি না নিয়ে তিনি,কোথাও যেতে বা হোসেনের পরিবারবর্গকে কোনোরকম সহযোগিতাও করতে পারবেন না এবং তাঁকে বন্দী অবস্থায় দামেস্কে যেতে হবে। এর জবাবে তিনি এজিদপক্ষীয় দূতকে বলেন:

> দূতবর ! তোমাদের রাজ-প্রতিনিধি বীরবর অলীদ মহোদয়কে গিয়া বল, আপনার রাজ্যে প্রবেশ করিতে কাহারও অনুমতির অপেক্ষা করে না; হোসেনের পরিজনকে কারাগার হইতে উদ্ধার করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য এবং হাসান-হোসেনের প্রতি যিনি যে প্রকার ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার সমুচিত প্রতিবিধান করিতে আমরা কখনই ভুলিব না।...বন্দীভাবে আমিদিগকে দামেস্কে পাঠাইতে হইবে না—এই সজ্জিত বেশে, এই বীরবেশে বিজয়-নিশান উড়াইয়া রণভেরী বাজাইতে বাজাইতে শৃগাল-কুকুরের ন্যায় শত্রুবধ করিতে করিতে আমরা দামেস্ক নগরে প্রবেশ করিব।[৩৭]

শেষপর্যন্ত গাজী রহমানের সৈন্যদের কাছে এজিদের সৈন্য দাঁড়াতেই পারে না। এ থেকে মনে হয় যে, 'বিষাদ-সিন্ধু'র সমস্ত ঘটনার সঙ্গে নিয়তির প্রসঙ্গ জড়িত। এর সব কিছুই যেন পূর্ব-নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত। চরিত্রগুলো শুধু যার যার মতো অবস্থানে থেকে দায়িত্ব পালন করেছে। যে সীমার হোসেনকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছিলেন নিয়তির সহযোগিতায়, সেই সীমার ইরাকের অধিপতি মসহাব কাক্কার হাতে বন্দী হয়ে আত্মরক্ষার জন্য তোগান ও তুরস্কের ভূপতিদ্বয়কে ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁর মনে হয়েছে, 'বাঁচিলে তো পদোন্নতি ? আজ এই কালান্তক কালের হস্ত হইতে রক্ষা পাইলে তো অন্য আশা! অদৃষ্টে যাহা থাকুক, ঘটনাস্রোত যে দিকে

---

[৩৫] উদ্ধার পর্ব, ৫ম প্রবাহ, পৃ. ১৩৭।
[৩৬] উদ্ধার পর্ব, ৮ম প্রবাহ, পৃ. ১৪৩।
[৩৭] উদ্ধার পর্ব, ৯ম প্রবাহ, পৃ. ১৪৪-৪৫।

যায়,সেই দিকেই অঙ্গ ভাসাইব; এক্ষণে ভূপতিদ্বয়কে ছাড়িয়া দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত।'[৩৮] কিন্তু কোনো কৌশলেই সীমার বাঁচতে পারেন না। কাপুরুষ সেনাপতি সীমারের মতো তাঁর সৈন্যগণও নিয়তির ওপর নির্ভরশীল হয়ে বিনাযুদ্ধে মৃত্যুর চেয়ে বলেছেন, 'চল, ঐ মহাবীর মসহাব কাক্কার পদানত হই, অদৃষ্টে যাহা থাকে, হইবে।'[৩৯]

দামেস্কের মন্ত্রী হামানও নিয়তিতে বিশ্বাসী। সীমারের পরাজয় ও মৃত্যু, অলীদের পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে এজিদ নিজেই মোহাম্মদ হানিফার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি বিপক্ষ সৈন্যদের পরাজিত করে মদিনার সিংহাসনে বসার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলে তাঁর বৃদ্ধমন্ত্রী হামান তাঁকে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানিয়ে বলেন:

> শত্রু পরিবারের শত্রুতা কি? তাঁহার সন্তান-সন্ততি পরিজনে হিংসা কি ? মহারাজ ! হোসেনের শির দামেস্কে আসিল কেন ? হোসেন পরিবার দামেস্ক-কারাগারে বন্দী কেন ? ইহার কি কোন উত্তর আছে ? বিধির ঘটনা, অদৃষ্টের লেখা খণ্ডাইতে কাহারও সাধ্য নাই। মহারাজ ! এখনও উপায় আছে—রক্ষার পন্থা আছে। আপনি ক্ষান্ত হউন।... সীমার হত, অলীদ পরাস্ত, মারওয়ান ভয়ে কম্পিত, এ অবস্থায় মদিনা আক্রমণ করা দূরে থাকুক—মদিনার প্রান্তসীমাতেও প্রবেশ করিতে পারিবেন না।[৪০]

এজিদকে উপর্যুক্ত পরামর্শ দেওয়ার কারণে হামানকে কারাভোগ করতে হয়। পরবর্তীকালে এজিদের অবর্তমানে তিনি দামেস্কের প্রধানমন্ত্রী পদলাভ করেন। মোহাম্মদ হানিফার বৈমাত্রেয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ওমর আলী এজিদের সঙ্গে যুদ্ধে অগ্রসর হন, কিন্তু হানিফা তাঁকে এজিদের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ না করার পরামর্শ দেন। ফলে মারওয়ান ও আব্দুল্লাহ জেয়াদ তাঁকে বন্দী করে এজিদের পরামর্শে শূলে চড়িয়ে হত্যার চেষ্টা করেন। এ সংবাদ পেয়ে ভবিষ্যতে আরো বিপদের চিন্তায় শাহরে বানু বলেন, 'এত বিপদ মানুষের অদৃষ্টে ঘটে ! সকলই তো ঈশ্বরের কার্য। আমরা কি অপরাধে অপরাধী ? কি পাপ করিয়াছি যে, তাহারই এই প্রতিফল ?'[৪১] সালেমা বিবি এ কথা শুনে বলেন ঈশ্বর মহান, তাঁহার শক্তি মহান।... তিনি কি না করিতে পারেন ? আজ ওমর আলীর প্রাণবধ হইবে, কাল এজিদের প্রাণ যাইতে পারে। ঈশ্বরে যাহা ঘটাইবেন, তাহা নিবারণে কাহারও ক্ষমতা নাই।'[৪২]

মশাররফ হোসেন 'বিসাদ-সিন্ধু'তে নিয়তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এজিদবধ পর্বের প্রথম প্রবাহে তিনি দামেস্কে এজিদ-নিয়ন্ত্রিত বন্দীগৃহের বিস্তারিত বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে বন্দী হোসেন-পরিবার ও তাঁর আত্মীয়-স্বজন,দামেস্কের মন্ত্রী মাবিয়ার অসহায় অবস্থা, পরাধীনতা ও দুঃখ-কষ্টের কথা বলতে গিয়ে নিয়তি-তাড়িত হয়ে পড়েছেন। তিনি বলেছেন:

> দামেস্ক নগরে এজিদের বন্দীগৃহ নরক হইতেও ভয়ানক। শাস্তির মাত্রাও সেই প্রকার। ক্রমে দেখিতে পাইবেন, বিধির বিধানে এজিদ-আজ্ঞায়, মারওয়ানের মন্ত্রণায়, প্রভু হোসেন-পরিবার, জয়নাল আবেদীন প্রভৃতি সকলেই ঐ বন্দীখানায় বন্দী। ... হযরত মাবিয়ার প্রধানমন্ত্রী, এজিদের পুণ্যাত্মা পিতার প্রিয় সচিব

---

[৩৮] উদ্ধার পর্ব, ১৩শ প্রবাহ, পৃ. ১৫৪।
[৩৯] তদেব।
[৪০] উদ্ধার পর্ব, ২০শ প্রবাহ, পৃ. ১৭৩।
[৪১] উদ্ধার পর্ব, ২৪শ প্রবাহ, পৃ. ১৮২।
[৪২] তদেব, পৃ. ১৮৩।

> মহাজ্ঞানী বৃদ্ধ হামান,এজিদ-আজ্ঞায় বন্দী–লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ !বৃদ্ধ বয়সে এই যন্ত্রণা।...আশা ছিল–মন্ত্রীপ্রবরের মনে আশা ছিল,এজিদ মাবিয়ার সন্তান, পিতৃ-অনুগৃহীত বলিয়া অবশ্যই দয়া করিবে,বৃদ্ধ বয়সে নবীন রাজপ্রাসাদে সুখী হইয়া নিশ্চিন্তভাবে ঈশ্বর-আরাধনায় জীবনের অবশিষ্ট অংশ কাটিয়া যাইবে। নিয়তির বিধানে তাহা ঘটিল না। অথচ এজিদের স্বেচ্ছাচার-বিচারে বৃদ্ধ বয়সে লৌহনিগড়ে আবদ্ধ হইতে হইল।[৪৩]

মোহাম্মদ হানিফা ও তাঁর সৈন্যদের আক্রমণে এজিদ ও তাঁর সৈন্যগণ একেবারেই টিকতে পারে না, ফলে জয়নাবসহ হোসেন পরিবারের সকলেই কারামুক্ত হন। হানিফার মনে আশা ছিল যে, এজিদকে না মেরে জীবন্ত ধরবেন,কিন্তু তাঁর এ আশা পূরণ হয় না। 'এজিদ ও মারোয়ান তাঁর নামে শঙ্কিত হয়ে পড়েন কিন্তু তিনিও দৈবের হাতে ক্রীড়নক। দৈব কারণেই,হাতের কাছে পেয়েও এজিদকে তিনি নিধন করতে পারেননি। তবে নিয়তির বিধানকে অলংঘ্য জেনে,যেখানে অধিকাংশ চরিত্রই সংগ্রাম-বিমুখ,সেখানে হানিফা চরিত্রে কিছু ব্যতিক্রম লক্ষণীয়।[৪৪] নিয়তির ওপর তাঁর কোনো হাত নেই,নিয়তিকে তাঁকে মানতেই হয়। প্রাণপণ লড়াই করে এজিদ পরাজিত হয়েও হানিফার হাতে ধরা না দিয়ে তাঁকে বলেছেন:

> 'হানিফা ক্ষান্ত হও। আর কেন ? তোমার আশা, তোমার প্রতিজ্ঞা, তোমার মুখেই রহিল,এজিদ চলিল।' এই কথা বলিয়াই এজিদ গুপ্তপুরী প্রবেশ-দ্বার কূপমধ্যে প্রবেশ করিলেন।
>
> মোহাম্মদ হানিফা রোষে অধীর হইয়া 'যাবি কোথা নরাধম ! এই কথা বলিয়া বীর-বিক্রমে হুঙ্কার ছাড়িয়া অসি হস্তে কূপমধ্যে লম্ফ দিবার উপক্রমেই বজ্রনাদে শব্দ হইল, 'হানিফা ! এজিদ তোমার বধ্য নহে। মোহাম্মদ হানিফা থতমত খাইয়া উর্দ্ধদিকে চাহিতেই প্রভু হোসেনের তেজোময় কায়া দেখিয়া চমকিয়া পিছে হটিলেন, এবং ভয়ে চক্ষু বন্ধ করিলেন।
>
> পুনরায় গভীর নিনাদে শব্দ হইল, 'হানিফা ক্ষান্ত হও, এজিদ তোমার কধ্য নহে।'
>
> আবার দৈববাণী- 'হানিফা দুঃখ করিও না। এজিদ কাহারও বধ্য নহে। রোজ-কেয়ামত(শেষদিন) পর্যন্ত এজিদএই কূপে এই জ্বলন্ত হুতাশনে জ্বলিতে থাকিবে–পুরিতে থাকিবে, অথচ প্রাণ বিয়োগ হইবে না।'[৪৫]

মুনীর চৌধুরীর মতে, বিষাদ-সিন্ধুর 'সর্বাপক্ষো স্পষ্ট এবং প্রদীপ্ত চরিত্র এজিদের।... শিল্পীর অদৃশ্য মহাশক্তিই যেন নিয়তির রূপ ধারণ করে, হানিফার প্রতিহিংসা চরিতার্থতা লাভ করার প্রাকমুহূর্তে, নিজের বরপুত্র এজিদকে অন্তরীক্ষে টেনে নিয়ে গিয়ে চরম লাঞ্ছনার হাত থেকে রক্ষা করল। মাইকেল বঙ্কিমের জীবনোপলব্ধির উত্তরাধিকারী মীরের হাতে এমনি করেই পুরাতন নীতিধর্মের পরাভব ও শিল্পের বৈজয়ন্তী লাভ ঘটে।'[৪৬]

এজিদকে বধ করতে না পেরে হানিফা নির্বিচারে মানুষ হত্যা করেন, এ অপরাধে নিয়তির বিধানে তাঁকেও শাস্তিভোগ করতে হয়। কোনো মানুষ তাঁকে প্রতিরোধে সক্ষম না হলেও নিয়তি এক্ষেত্রে এগিয়ে আসে। তাঁর সম্পর্কে দৈববাণী হয়:

---

৪৩. এজিদবধ পর্ব, ১ম প্রবাহ, পৃ. ২১৪-১৫।

৪৪. সেলিম জাহাঙ্গীর, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৮।

৪৫. এজিদবধ পর্ব, ৪র্থ প্রবাহ, পৃ. ২৩৫।

৪৬. মুনীর চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২-৫৪।

> হানিফা একটা জীবন সৃষ্টি করিতে কত কৌশল, তাহা তুমি জান? সৃষ্ট জীব বিনাশ করিতে তোমাকে সৃষ্টি করা হয় নাই। বিনা কারণে জীবের জীবনলীলা শেষ করিতে তোমার হস্তে তরবারি দেয় হয় নাই। তোমার হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য মনুষ্যকুলে জন্ম হয় নাই। বিনাশ করা অতি সহজ, রক্ষা করা বড়ই কঠিন। সৃজন করা আরও কঠিন। এত প্রাণী বধ করিয়াও তোমার বধেচ্ছা নিবৃত্ত হইল না। জয়ের পর বধ অপেক্ষা পাপের কার্য আর কি আছে? নিরপরাধের প্রাণ বিনাশ করা অপেক্ষা পাপের কার্য আর জগতে কি আছে? তুমি মহাপাপী ! তোমার প্রতি ঈশ্বরের এই আজ্ঞা যে, দুলদুল সহিত রণবেশে রোজ-কেয়ামত পর্যন্ত প্রস্তরময় প্রাচীরে বেষ্টিত হইয়া আবদ্ধ থাক। বাণী শেষ হইতেই নিকটস্থ পর্বতমালা হইতে অতুচ্চ প্রস্তরময় প্রাচীর আকাশ-পাতাল কাঁপাইয়া বিকট শব্দে মোহাম্মদ হানিফাকে ঘিরিয়া ফেলিল। মোহাম্মদ হানিফা বন্দী হইলেন। রোজ-কেয়ামত পর্যন্ত ঐ অবস্থায় থাকিবেন।[৪৭]

বিধির বিধানে মোহাম্মদ হানিফাকেও বন্ধীত্ব বরণ করতে হয়। তাঁকে না পেয়ে তাঁর সঙ্গীগণ বেশ কষ্ট পান। দৈববাণীতে হানিফার বন্দী অবস্থার কথা শুনে গাজী রহমান সঙ্গীদের বলেন, 'দৈববাণী অলঙ্ঘনীয়। যাহা অদৃষ্টে ছিল হইল। যাহা দয়াময়ের ইচ্ছা ছিল, সম্পূর্ণ হইল। আর বৃথা এ প্রান্তরে থাকিয়া লাভ কি?'[৪৮] এরপর তাঁরা নগরে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। জয়নাল আবেদীন পৈতৃকরাজ্য এবং পরিবার-পরিজন উদ্ধার করে সিংহাসনে বসেন। তিনি এবং মদিনার সকলেই আরো সুখী হতেন যদি 'মোহাম্মদ হানিফা দৈবনিবন্ধে প্রস্তর-প্রাচীরে চির আবদ্ধ না হতেন'। 'বিষাদ-সিন্ধু'র উপসংহারেও রয়েছে নিয়তির কথা। উপসংহারে ঔপন্যাসিক লিখেছেন:

> ঈশ্বরের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল। নিয়তির বিধানফল, পাপের প্রায়শ্চিত্ত ইহজগতে মানব-চক্ষে যাহা দেখিবার সাধ্যায়ত্ত, তাহা সকলেই দেখিল। যাহা বুঝিবার তাহা বুঝিল। নানা চিন্তায় এজিদের পরিণাম,মোহাম্মদ হানিফার জীবনের শেষফল, ভাবিতে ভাবিতে দামেস্ক-রাজ প্রাসাদে নব ভূপতি ও মন্ত্রিদলের নিশাবসান হইল।'[৪৯]

উপসংহার

'বিষাদ-সিন্ধু' উপন্যাসের প্রায় সমস্ত ঘটনার পেছনেই নিয়তি কোনো না কোনোভাবে প্রভাব বিস্তার করে আছে। আলোচ্য উপন্যাসে সৃষ্ট চরিত্রগুলোর কার্যাবলীও অনেকটা নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত। নিয়তিকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়নি কোনো চরিত্রই, বরং নিয়তির বিধানকেই মেনে নিয়েছে কোনোরকম দ্বিধাদ্বন্দ্ব না করে। এ-উপন্যাসে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে তা যেনো পূর্বনির্ধারিত। কোনো কাহিনী বর্ণনার আগেই ঔপন্যাসিক পরবর্তী ঘটনার বিবৃত করেছেন এবং চরিত্রকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তার পরিণতির কথা। 'বিষাদ-সিন্ধু'র সম্পূর্ণ জীবনই নিয়তি নিয়ন্ত্রিত। কাজেই একথা বলা সঙ্গত যে 'বিষাদ-সিন্ধু' নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত উপন্যাস।

---

[৪৭] এজিদবধ পর্ব, ৫ম প্রবাহ, পৃ. ২৩৬-২৩৭।

[৪৮] তদেব, পৃ. ২৩৭।

[৪৯] উপসংহার, পৃ. ২৩৮।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, সপ্তদশ সংখ্যা ১৪১৬

শামসুর রাহমানের গল্প এবং উপন্যাসে শব্দের ব্যবহার

ইয়াসমিন আরা সাথী*

Abstract : Shamsur Rahman is a modern civic poet. Though he is not so familiar as the author of prose, nevertheless he is completely successful in prose fiction. He has intended to demarcate the adverse period and society by this. As a non-communal poet, promoter of unfettered mind and thinking in his personal life he has given a message of antipathetic period by the fiction. The picnic personality bruised in complex dispute of inner and outer of middle class Bangali has been expressed in his stories and novels. This individual and progressive poet is very conscious to the use of the words and novel. He has applied urbane words in his all kinds of prose as like that of poems. His fiction is perceivable, artistic and logical.

ভূমিকা

শামসুর রাহমান বাংলা সাহিত্যের গৌরবদীপ্ত অহংকারের নাম, অসাম্প্রদায়িক এই মানুষটি ছিলেন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী ও প্রগতিশীল কবি। ব্যক্তিগত জীবনাচরণে, কর্মে ও সৃষ্টিশীলতায় তিনি ছিলেন মানবতাবাদী, ধর্মীয় পরিচয়ে তিনি মানুষকে বিচার করতেন না। তাই গোঁড়া-ধর্মান্ধদের বিরুদ্ধে তিনি নির্ভয়ে কলম চালিয়েছেন। তাঁর এই অসাম্প্রদায়িক চেতনার মূল অংশ জুড়ে আছে, 'সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' এই মর্মবাণী। গল্প রচনায়, গল্পের পরিবেশ সৃষ্টিতে, চরিত্র চিত্রণে, ইঙ্গিতদানে, প্রতীকায়নে শামসুর রাহমান তাঁর নিজস্ব ভাষা-শৈলীকে প্রাধান্য দিয়েছেন। চরিত্রানুযায়ী ভাষাভঙ্গিকে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন এবং তা করতে গিয়ে শব্দ ব্যবহারে তিনি এমন অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছেন, যা অতুলনীয়।

বস্তুত শান্তির ও স্বস্তির সমাজ চেয়েছিলেন বলেই অতিসংবেদনশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে তিনি শব্দের খেলা দিয়ে ধরতে চেয়েছিলেন।

শামসুর রাহমানের সমগ্র গদ্য রচনাকে কয়েকটি বিষয়ভিত্তিক শ্রেণীতে বিন্যাস করা যায়। যেমন উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, পত্রাবলি। প্রবন্ধের আলোচনা শামসুর রাহমানের কথাসাহিত্যকেন্দ্রিক হবে, তবে প্রয়োজনে অন্যান্য রচনাও স্থান পাবে।

---

* সহকারী প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, শহীদ পুলিশ স্মৃতি কলেজ, মিরপুর, ঢাকা।

শামসুর রাহমান বাংলাদেশের প্রধান কবি। ব্রিটিশ আমলে জন্মগ্রহণ করে দেখেছেন রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা, সাম্প্রদায়িকতার বীভৎসতা, মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দেশ-বিভাগ ও গণহত্যা, পঁচাত্তরের হত্যাকাণ্ড, সামরিক শাসন, স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন, এসব ঘটনার উত্থান-পতনের সঙ্গে তাঁর লেখনী বেড়ে উঠেছে।

শামসুর রাহমানের উপন্যাস যা তাঁর কবিসত্তার সম্প্রসারণ মাত্র। গুণগতমান যদি বিচার করা যায় সমসাময়িকদের তিনি ছাড়িয়ে গিয়েছেন। ভাব ও রসগত বিচারে সূক্ষ্মতা বেশি। আর ভাষার ক্ষেত্রে আটপৌরতা লক্ষণীয়। ভাষাচিন্তা ও তার যথার্থ প্রয়োগ বস্তুত এক কঠিন সমস্যা। শামসুর রাহমানের ভাষায় সেই চিন্তা ও প্রয়োগের সমতা যা পাঠককে স্বতন্ত্র আস্বাদনের সুযোগ এনে দিয়েছে।

শামসুর রাহমানের উলেখযোগ্য ছোটগল্প: 'সে, একটি বেড এবং সুরভি, সাযযাদ আমিনের কথা, গাঙচিল, প্রৌঢ়ের প্রবজ্যা, বর্ষারাতে নূপুর ধ্বনি, না রোদ না জ্যোৎস্না। উপন্যাসের মধ্যে উলেখযোগ্য হচ্ছে: অক্টোপাস, অদ্ভুত আঁধার এক, নিয়ত মন্তাজ।

শামসুর রাহমানের কথাসাহিত্যে শব্দ ব্যবহার আলোচনার ক্ষেত্রে প্রথমে ভাষার শব্দ, শব্দক্রম, শব্দগুচ্ছ, শব্দসাযুজ্য, বাক্য, প্রভৃতির বিশেষণ করা হবে।

ভাষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শব্দ। আধুনিক রীতিবিজ্ঞানের বিখ্যাত সমালোচক Sir Herbert Read বলেন :

> Words are the units of the composition and the art of prose...in prose the primary. function of the round of the isolated word is its expressiveness; it must mean the thing it stand for.[৩]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিমত:

> কোঠাবাড়ির প্রধান মসলা ইট, তারপরে চুন-সুরকির নানা বাঁধন।
> ধ্বনি দিয়ে এই কথাগুলোকে গেঁথে গেঁথে হয় ভাষা।[৪]

শামসুর রাহমানের উপন্যাস ও ছোট গল্প বিষয়ক স্বতন্ত্র আস্বাদনের কয়েকটি রচনাংশ উলেখ করা হলো:

ক. দু'শলা ফাইভ ফিটটি সিগারেট নিয়ে আসুন চট করে। নাম মনে থাকবে তো ? ফাইভ ফিফটি ফাইভ, ইশতিয়াক পার্স থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বের করে মহব্বদ মিয়াকে দেয়।[৫]

---

[৩] Read Herbert, *English Prose Style* (London: OUP, 1963), পৃ. ৩১।

[৪] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বাংলা ভাষা পরিচয়', *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ১৪শ খণ্ড (কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯৬১), পৃ. ৪৪৩।

[৫] সালেহ চৌধুরী (সম্পা:), *সেরা শামসুর রাহমান* (ঢাকা : সময় প্রকাশনী, ২০০৪), পৃ. ২৩০।

খ. আমি জীবনকে একটা গণিকার মতো ব্যবহার করে চলেছি। কিন্তু প্রেমহীন তাপে সত্তাকে কতটুকু উষ্ণ রাখা চলে ? বেশিক্ষণ চলে না হয়তো, আর চলে না বলেই এক সময় সমস্ত বুক জুড়ে একটা বিষণ্নতা জেগে ওঠে।[৬]

দেখা যাচ্ছে, উদ্বৃত অনুচ্ছেদ তিনটিতে:

অনুচ্ছেদ	তৎসম, তদ্ভব	বিদেশি	দেশি
ক	৪৮.১৪৮	৪৮.১৪৮	৩.৭০৪
খ	৮৭.৫	৬.২৫	৬.২৫
ক,খ }একত্রে গড়	৬৭.৮২৪	২৭.১৯৯	৪.৯৭২

এই অনুচ্ছেদ দেখে বোঝা যাচ্ছে শামসুর রাহামানের রচনায় তৎসম, তদ্ভব এবং বিদেশি শব্দের ব্যবহার বেশি। 'যে ভাষা যত বেশি মুখের ভাষার নিকটস্থ সে ভাষায় তত বেশি দেশি বিদেশি এবং তদ্ভব শব্দ প্রয়োগের সম্ভাবনা থাকে'।[৭] শামসুর রাহামানের শব্দ প্রয়োগের হিসেব দেখে সহজেই অনুমেয় তিনি প্রতিদিনের নিত্য প্রয়োজনীয় ভাষা ব্যবহার করেছেন।

শারমিন কখনো আমতা আমতা করে কখনো-বা স্পষ্ট ভাষায় যা বলল তার মোদ্দা কথা হলো যে, সে আমার বন্ধু সাযযাদ আমিনকে ভালবাসে। তিনমাস আগে ওদের পরিচয় হয়েছে। কিন্ত এই তিন মাসেই শারমিন প্রবলভাবে,গভীরভাবে সাযযাদকে ভালবেসে ফেলেছে। কিন্তু সাযযাদের কাছ থেকে তেমন কোন সাড়া পাচ্ছে না সে। সাযযাদ যেন তুষারিত। 'তুষারিত' শব্দটি তরুণীর ঠোঁট থেকেই ঝরেছে। কোনো কোনো শব্দ শারমিন এমন ফ্রাঙ্কলি বলল যে, অবাক হতে হয়। ওর কথা বলার ধরনে একটা সহজে-সুন্দর স্পষ্টতা আছে। প্যাচপেচে, ন্যাতা-ন্যাতা কিছু নেই। শরতে রোদ্দুরের মতো অনেকটা মাই ওল্ড বয় সাযযাদ, তুমি ভাষায় বেশ খেল দেখালে। যা হোক, স্রেফ মাদারি কা খেল। কতদিন কত কিস্সা-কাহিনী শোনালে, আর এই জ্বলজ্যান্ত শারমিন-পর্বটি গল্প মেরে বসে আছ। সাধে কি তোমাকে আমি আজব চিড়িয়া বলি। দোস্ত ! এই যে শারমিনের কথা তুই চেপে গেলি তা কিসের জন্য ?[১]

উদ্বৃত অনুচ্ছেদটিতে প্যাচপেচে, ন্যাতা-ন্যাতা, মাই ওল্ড বয়, স্রেফ মাদারি কা খেল, ফ্রাঙ্কলি, তুষারিত প্রভৃতি শব্দ একসঙ্গে ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় মনোভাবটি স্পষ্ট করেছেন। শামসুর রাহমানের কাছে ভাষার প্রায়োগিক দিকটি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি তাঁর গল্প এবং উপন্যাসে ভাষার প্রায়োগিক দিকটি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

আরবি ফারসি ইংরেজিসহ নানাবিধ প্রচলিত শব্দ ব্যবহারের পাশাপাশি শামসুর রাহমান বাঙ্গালি ও বাংলাদেশের প্রকৃতি প্রতিবেশের চমৎকার বর্ণনা করেছন।

---

[৬] সালেহ চৌধুরী (সম্পা:), *সেরা শামসুর রাহমান*, (ঢাকা, সময় প্রকাশনী, ২০০৪) পৃ. ২৩৪।

[৭] নবেন্দু সেন, *বাংলা গদ্য স্টাইল* (২৪ পরগনা (দ:): মহাদিগন্ত , ১৯৮৮), পৃ. ১১২।

[১] সালেহ চৌধুরী (সম্পা:), 'সেরা শামসুর রাহমান', (ঢাকা: সময় প্রকাশনী, ২০০৪), পৃ. ৩৩০।

আরবি-ফারসি উর্দু শব্দ

মুসাবিদা, নেকাব, কবুল, মালেকুল মৌত, গোরস্থান, আখেরী খায়েশ, পেরেশানি, মেহেরবানি, রোকসৎ , নামাজ।

ইংরেজি শব্দ

সার্জারি, নাইট, থ্রিপিস, স্যুট, ট্রাউজার, হাফপ্যান্ট, শার্ট, মিক্চার, স্ট্রং পয়েন্ট, বক্সঅফিস, শেভিং ক্রিম, ফ্রাঙ্কলি, রিজাইন, ম্যাজেন্টা, ব্লাডপ্রেসার, ইলেকট্রিসিটি, রিচ্যুয়াল, ক্রাকডাউন, পারফেক্ট, অটোমেটিক, ইডিয়ট, প্র্যাগামেটিক, লিবার‍্যালিজম, পেরামবুলেটার, হ্যান্ডকাফ, ডেডফুলস্টপ, ইনট্রোভার্ট, স্যালিউট, স্কুটার, ল্যাঙ্গুয়েজ ইত্যাদি।

জোড়া শব্দরাজি

ভাগ্যফাগ্য, বটপাকুড়, হাসিখুশি, চায়েল টায়ের, বুদ্ধিশুদ্ধি, আমোদ-ফুর্তি, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি।

অপ্রচলিত শব্দ

ভককিবাজি, মাজাকি, দরজদিল, বোহেমিয়ান, ঘ্যাঙরায়, মনোজ, মুসবিদা, মোকাসিনপরা, নিকার বোকার ইত্যাদি।

লৌকিক আমেজ মিশ্রিত শব্দ

শরীর শিরশির, প্যাচপ্যাচে, ন্যাতান্যাতা, নিঝুমকুঠির, দামাল হাওয়া বেলাগামটান, বিড়বিড়, নেয়াপাতিভুড়ি, ঢ্যাঙালগি, ঢ্যাঙা মাঝি ইত্যাদি।

প্রবাদ

স্বর্ণের নাম সুন্দরী
মাইনের নাম কার্তিক

মহাপুরুষের বাণী

বলায়-চলায় এক হও। উপদেশ না
হয়ে উদাহরণ হয়ে ওঠো। ভাল
বিসর্জন দিয়ে প্রাণে প্রমাণ দাও।
মুখ সর্বস্ব না হয়ে কথা সর্বস্ব হও।

শামসুর রাহমান বেড়ে উঠেছিলেন বিংশ শতাব্দীর আত্মজিজ্ঞাসা ও সত্তাজিজ্ঞাসার এক জটিল সন্ধিক্ষণে, বিদ্যাসাগরীয় কিংবা বঙ্কিমী পারিপার্শ্বিকতা তাঁর ছিল না, ফলে তার শব্দ ব্যবহারে তৎসম শব্দের চেয়ে বিদেশি শব্দের প্রয়োগ বেশি।

ভাষারীতি কথাসাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। "ভাষারীতি উপন্যাসের সমগ্ররীতি বা বিষয়বস্তু থেকে পৃথক কোনো ব্যাপার নয়। এবং এটা একটা প্রাথমিক সত্য কথা যে, ব্যক্তি সমাজ চেতনার সমগ্র মহিমাকে লেখক তার ভাষারীতির আঁধারে ধরে রাখেন।[৯] শামসুর রাহমানের কথাসাহিত্যে ভাষার প্রয়োজন কখনো কখনো উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার করেছেন।

আঞ্চলিক শব্দের উদাহরণ:

ক. ডাহার খবর কী বাই। একজন প্রশ্ন করেন। পূর্বের হাটিকে যেন। নাম ভুলে গেছে নাদিম। কী খবর দেবে সে ? ওর গলা থেকে কোনো আওয়াজ বেরোতে চায় না। সে কোনোমতে বলল, 'পাকিস্তানী সৈন্যরা জ্বালায়া পোড়াইয়া মানুষ মাইরা এক শা করতাছে'।[১০]

নগরকেন্দ্রিক শব্দ ব্যবহার:

আধুনিক নগরমনস্ক কবি শামসুর রাহমান তাঁর অধিকাংশ গল্প এবং উপন্যাস নগরকেন্দ্রিক শব্দ ব্যবহার করেছেন। বোদলেয়ারকে দিয়ে যেমন প্যারী শহরকে এলিয়টকে দিয়ে যেমন লন্ডন শহরকে ঠিক তেমনি শামসুর রাহমানকে দিয়ে ঢাকা শহর চেনা যায়। শহর ঢাকা যেন তাঁর দয়িতা। নগর নিয়ে শামসুর রাহমানের অসংখ্য কবিতা আছে। নগরের সৌন্দর্যে কবি মুগ্ধ হয়ে লিখেছেন:

'আমি তো ছিলাম প্রথম আবিষ্কারক তোমার সৌন্দর্যের তোমার সৌন্দর্য়ের শপথ, আমার আগে অন্য কেউই এমন মজেনি তোমার সৌন্দর্যে।

(হে শহর হে আমার অন্তরঙ্গ/ইকারুসের আকাশ)

আবার তাঁর নগর ঢাকা কখনো কখনো যেন এক পার্থিব নরক। ভিখিরির চিৎকার, মাতালের প্রলাপ, পানের দোকানের অশীল রঙিন জটলা, অন্ধগলির বিমর্ষতা শাহরিক এই কোলাহল তাঁর স্বপ্ন সৌন্দর্যকে গ্রাস করতে চায়।

আমার মাথাটা যেন বহ্নিমান একটি শহর
যেখানে মানুষ, যান, বিজ্ঞাপন, রেডিয়োর গান
ভিখিরির চ্যাচামেচি, বেশ্যার বেহায়া অনুরাগ
কানাঘুষো, নামহীন মৃতশিশু আবর্তিত শুধূ

(স্বাগত ভাষণ / রৌদ্র করোটিতে)

শামসুর রাহমান কবিতায় যেমন নগরচেতনাকে এনেছেন ঠিক নগর চেতনাকে উপন্যাস এবং গল্পের আবিশ্যিক উপাদান করেছেন। নগরকেন্দ্রিক শব্দচয়ন তাকে সমসাময়িকদের থেকে স্বতন্ত্র করেছে।

---

[১০] সালেহ চৌধুরী (সম্পা:), *সেরা শামসুর রাহমান, পৃ. ২৬৪।*

শিভাসরিগাল, ডিম্পল আর ক্লাক লেবেলের ছড়াছড়ি। মহিলারা এবং দু'চারজন পুরুষ ছাড়া সবার হাতেই হুইস্কির গেলাশ। কেউ কেউ টানছেন বিয়ার। সফট সেক্সের জন্য সফট ড্রিঙ্ক স্ট্রং ডিঙ্ক যেসব পুরুষের দু'চোখের বিষ, তাদের জন্য কোকাকোলা কিংবা ফান্টা। ইশতিয়াক হোসেন দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছে। এ পার্টিতে শারমিন না থাকলে হয়তো এত থেতো না। হুইস্কি নয়, যেন সে শারমিনের যৌবন পান করছে। [১১]

সমসাময়িকদের সাথে শামসুর রাহমানের ভাষার স্বকীয়তা অনুসন্ধান করলে সহজেই চোখে পড়বে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, হাসান আজিজুল হক যেখানে ভাষায় যথেষ্ট পরিমাণে শ্লেষ, ব্যঙ্গের নিপুন ব্যবহার করেছেন সেখানে শামসুর রাহমান অনেক বেশি ঋজু। বাক্য গঠন সরল রীতির অনুসারী। বাক্যকে অযথা জটিলরূপ প্রদানে তিনি অনাগ্রহী। তবে মনস্তাত্ত্বিক চেতনা নির্ভর গল্পে চরিত্রে জটিলতা প্রকাশে অনেক সময় জটিলতাপূর্ণ দীর্ঘ বাক্য রচনা করেছেন। অদ্ভুত আঁধার এক উপন্যাসে এ ধরনের বাক্য ব্যবহার লক্ষণীয়। মনস্তাত্ত্বিক চেতনানির্ভর গল্প বর্ণনায় তিনি স্বপ্ন বাস্তবতার যুগ্ম সম্মিলনে বাক্য নির্মাণ করেছেন।

উপসংহার

শামসুর রাহমানের ভাষা যুক্তিনির্ভর চিন্তাশ্রয়ী। ব্যক্তি চরিত্রের অন্তর্নিহিত জগৎ এবং সেই জগতের সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশেষণই শামসুর রাহমানের উদ্দিষ্ট। সিনট্যাক্সকে নিয়ে ইচ্ছেমতো খেলা করেছেন। শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে বাক্য নির্মাণ করে চরিত্রের অবয়ব ফুটিয়েছেন। তাঁর ভাষা মানবাংলা। ভাষার সঠিক প্রয়োগের কারণেই তাঁর গল্প-উপন্যাস শিল্প-সফল এবং সার্থক।

---

[১১] সালেহ চৌধুরী (সম্পাঃ), *সেরা শামসুর রাহমান*, পৃ. ২৪৫।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, সপ্তদশ সংখ্যা ১৪১৬

বিভূতিভূষণের দুর্গা : সীমাবদ্ধতার প্রতিকৃতি

মোছাম্মৎ ফাতেমা জোহরা বেগম*

Abstracrt : Bibhutibhushan Bondyopadhyay (1894-1950) captured a lot of place in the realm of Bengali fiction by dint of his own genius during last thirties. He wrote stories and novels but achieves much more reputation as a novelist. In the character Durga in 'Pather Panchali' Bibhutibhushan bears the stamp of excellent dextrally to flourish real picture keeping the taste of art intact in the limited field through the absolute truth of life.

সূচনা

বিগত শতকের তিরিশের দশকের বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে অনেকখানি জায়গা দখল করে নেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) আপন প্রতিভা বলে। তিনি গল্প আর উপন্যাস রচনা করলেও ঔপন্যাসিক হিসেবেই সমধিক খ্যাতি অর্জন করেন ও প্রশংসিত হন। তাঁর উপন্যাসের বিষয়বৈচিত্র্য ও প্রেক্ষাপট সবার চিরচেনা পৃথিবী থেকে অবলুপ্ত গ্রামীণ মানুষ, পরাক্রান্ত নিসর্গ, হতশ্রী ধ্বংসোন্মুখ সীমাবদ্ধ লৌকিক জীবন-প্রবাহ—শিল্পের সীমানায় ধরা পড়ে শৈল্পিক রূপকল্পে। 'পথের পাঁচালী' আত্মপ্রকাশ করে তার নিজস্ব 'সত্য' সত্তাগুণে, এতে শিল্পের পাশাপাশি নিম্নবিত্ত জীবনের দ্বন্দ্ব-হতাশা-প্রত্যাশা-প্রাপ্তি-সংগ্রাম ও সীমাবদ্ধতার চিত্র প্রতিফলিত। জীবনের চরম সত্য কথার মধ্য দিয়ে, সীমিতাঙ্গনের মাঝে শিল্পের স্বাদ অক্ষুণ্ন রেখে বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তুলতে আশ্চর্য দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'পথের পাঁচালী' উপেক্ষিত, অনাস্বাদিত এবং লৌকিক সীমাবদ্ধ জীবন সীমানার পরিচিতি বহন করেও যেন বিশেষ হয়েও সার্বিক প্রেক্ষাপটের ধারক বাহক, বিশেষ করে দুর্গা চরিত্রটি। বর্তমান প্রবন্ধে দুর্গার জীবনচিত্রই মূল প্রতিপাদ্য।

বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকের ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর ছাপান্ন বছরের জীবনে মাত্র আটাশ বছর সাহিত্য রচনার সময়সীমা। এই সীমিত সময়ের মধ্যে ছয়টি উপন্যাস, কিছু প্রবন্ধ তিনটি বয়স্ক পাঠ্য উপন্যাসের কিশোর সংস্করণ এবং দুই শতাধিক ছোটগল্প রচনা করেন।

'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের হাত ধরেই বাংলা সাহিত্যজগতে প্রবেশ করেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে ছোটগল্পের মাধ্যমে পূর্বেই লেখক-সম্পাদক মহলে ছিল তাঁর কিছুটা পরিচিতি। মাসিক প্রবাসীর ১৯২৮ সনের মাঘ সংখ্যায় 'উপেক্ষিতা' নামক ছোটগল্প প্রথম প্রকাশিত হয় আর এটিই তাঁর প্রথম প্রকাশিত সাহিত্যকর্ম। জীবনের পথ পরিক্রমায় হোঁচট খেয়েছেন বটে কিন্তু তাই বলে তাঁর সাহিত্যিক সত্তা ও গল্পকার সত্তা পরাজিত হয়ে নিঃশেষিত

---

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, আলাউদ্দিন সিদ্দিকী মহাবিদ্যালয়, কালিহাতী, টাঙ্গাইল।

হয়নি। তিনি শহুরে জীবনে যান্ত্রিক কোলাহলের মধ্যে থেকেও নিজেকে আড়াল করতে চেয়েছেন বারংবার, পেরেছেনও। আর সেই পারার চিত্রপট স্পষ্ট হয়ে ওঠে 'পথের পাঁচালী'র দৃশ্যপটে। কল্পনায় আঁকা আল্পনায় 'পথের পাঁচালী'র দৃশ্যকল্পে শিশু মনের দুর্জ্ঞেয় রহস্য উদ্‌ঘাটিত হলেও ইন্দির ঠাকরুন-এর অসহায়ত্ব, সর্বজয়ার অতিসামান্য চাওয়া-পাওয়া, হরিহর রায়ের ভাঙা ঠেলাগাড়ি দৃশ্যত সাংসারিক টানাপোড়েন এড়াতে পারেননি কিছুতেই। আর তিনি হয়ে ওঠেন পূর্ণমাত্রার গ্রামীণ খাঁটি সমাজ বাস্তবতার সফল রূপকার। বলতে গেলে: 'সমাজের নানা আবর্তে উত্থিত অমৃত পান করে শিল্পী যেমন ভাস্বর হয়ে ওঠেন, তেমনি গরল পানে তাঁকে হতে হয় নীলকণ্ঠ।'[১]

তিরিশের দশকের শক্তিধর লেখকদের মাঝে অনায়াসে এবং স্বাচ্ছন্দ্যেই নিজের আসন পাকাপোক্ত করে নেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজস্ব রচনা কৌশলের জোরে। রবীন্দ্রনাথের উক্তিটিই যথাযথ বলে মনে হয়: 'বইখানা দাঁড়িয়ে আছে আপন সত্যের জোরে।'[২] 'পথের পাঁচালী' প্রসঙ্গে উক্তিটি করলেও এ 'সত্য' এবং 'জোর' শুধু 'পথের পাঁচালী'তে নয় বরং যাবতীয় রচনার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

দুর্গা চরিত্রের লৌকিক জীবনচিত্র

গ্রামীণ প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্যময় চিত্র সবটুকুন অসাধারণ সৌন্দর্য নিয়ে বিকশিত হয়েছে বিভূতিভূষণের বুনন-নৈপুণ্য গুণে, তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে না। অপরদিকে সেই গ্রামীণ সাদামাটা জীবনের সীমাবদ্ধতাও প্রবল প্রতাপ নিয়ে জানান দেয় অনাস্বাদিত জীবনের কথকতায়। 'সর্বজয়া' নামটিতেই সবকিছুকে 'জয়' করার অর্থ নিহিত থাকলেও জীবনের পথ পরিক্রমায় শুধু পরাজয়কেই যেন 'জয়' করতে পেরেছেন। সর্বজয়ার পরাজয়, ইন্দির ঠাকরুনের অপূর্ণতা, হরিহরের ব্যর্থতা, অপুর জীবনের দ্বন্দ্ব সেই সাথে 'পথের পাঁচালী'র সীমাবদ্ধ সময়ের মূল আকর্ষণ 'দুর্গা' তার উপেক্ষিত-অনাস্বাদিত এবং সীমাবদ্ধ জীবন পরিসর যেন পাঠক-সমালোচক মহলকে জানান দেয় উপন্যাসটির চরিত্রগুলোর জীবন বোধ সম্পর্কে। বিভূতিভূষণ নিজেই বলেছেন:

> পথের পাঁচালী' যখন প্রথমে লিখি তাতে দুর্গা ছিল না, শুধু অপু ছিল। একদিন হঠ্যাৎ ভাগলপুরের রঘুনন্দন হল—এ একটি মেয়েকে দেখি। চুলগুলো হাওয়ায় উড়ছে। সে আমার দৃষ্টি এবং মন আকর্ষণ করল—তার ছাপ মনের মধ্যে আঁকা হয়ে গেল, মনে হল উপন্যাসে এই মেয়েকে না আনলে চলবে না। 'পথের পাঁচালী' আবার নতুন করে লিখতে হল এবং রিকাষ্ট করায় একটি বছর লাগল।[৩]

'পথের পাঁচালী'তে দুর্গার আগমণ যেমন হঠাৎ ঠিক প্রস্থানও হঠাৎ। তারপরও দুর্গাই যেন অকপটে বলে দেয় উপেক্ষিত জীবনের কথন। যতটুকুন সময় দুর্গার উপস্থিতি থাকে উপন্যাসে ততক্ষণেই যেন 'পথের পাঁচালী'র সাবলীল গতিময়তা থাকে অক্ষুণ্ন। দুর্গা যেন সীমাবদ্ধ যুগ এবং

---

[১] বিনতা রায় চৌধুরী, *পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা সাহিত্য* (কলকাতা: সাহিত্যলোক, ১৯৯৭), পৃ. ২১।

[২] বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস* [সম্পাদনা: হায়াৎ মামুদ ও তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়] (ঢাকা: প্রতীক প্রকাশনা, ১৯৯৬), ভূমিকা, পৃ. ১।

[৩] বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, পরিশিষ্ট, পৃ. ৮৮১।

জীবনের প্রতীক। জীবনের তীব্র ইচ্ছা শক্তি যেন তাকে তাড়িত করে। তাই রোগ শয্যায় শুয়েও অচরিতার্থ বাসনার চায় চরিতার্থতা। নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের ভাঙা পলেস্তরা খসা প্রাচীন বাড়িতে শুয়ে প্রকৃতি কন্যা দুর্গা নতুন যুগের ধারক অপুকে বলে: 'অপু, সেরে উঠলে আমায় একদিন রেলগাড়ী দেখাবি?'[৪]

জীবনের প্রয়োজনে সোনা ডাঙ্গার মাঠ আর নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের পাট চুকিয়ে যাবার ক্ষণে ভীষণ মনে পড়ে ক্ষণজন্মা দিদির কথা। যে প্রকৃতিকে ভালবাসতো অন্য রকম ভাললাগায়-ভালবাসায় স্বাদ গ্রহণ করতো জ্বিহবা দ্বারা আর সীমাবদ্ধ জীবন জগৎকে চিনে নিত : 'দুর্গা জিভের স্বাদ দিয়ে জগৎকে জেনেছে...।'[৫] লুচি-সন্দেশ, মোহনভোগ দুর্গার জীবনের অজানা বস্তু মাত্র, তার স্বাদ আরো বেশি অজ্ঞাত। সমস্ত পৃথিবীতে দুর্গার নিকট উপাদেয় এবং সুস্বাদু খাদ্য বস্তু মানেই 'গুড়'। তাই উপন্যাসখানিতে বার কয়েক দুর্গার কণ্ঠে ধ্বনিত হয় 'মিষ্টি যেন গুড়'। হতদরিদ্র, অনাস্বাদিত ও সীমাবদ্ধ জীবন পরিসরের সীমাবদ্ধতার প্রতীক প্রকৃতি-কন্যা তার পরিপূরক প্রকৃতি প্রেমিক অপুর প্রতি ছুড়ে দেয় কথকতা:

> লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর। পরে মুখ ভ্যাঙাইয়া কহিল আম খেয়ে দাঁত টকে গিয়েছে—আবার কোন দিন আম দেবো খেও—ছাই দেবো—এই ওবেলাই পটুলিদের কাঁকুড় তলির আম কুড়িয়ে এনে জারাবো, এত বড় বড় গুটি হয়েছে, মিষ্টি যেন গুড়—দেবো তোমায়?[৬]

বিশ্ববিধাতার জগৎ সংসারে দুর্গা নামের কন্যাটির জন্য কোনো উপাদেয় খাদ্য বস্তু নির্ধারিত হয়নি আর তাই বন-দেবী তার বক্ষদেশ অবারিত করে দেন এ কন্যাটির জন্য। তার বক্ষদেশে ধারণ করেন কুল, বেল, জাম, নোনা, আম-বৈচি, কামরাঙ্গা, আমড়া আর পানিফল কিংবা শেওড়া ফল। যা দ্বারা হতদরিদ্র দুর্গা মেটায় অনাস্বাদিত স্বাদের অতৃপ্ত বাসনা। পৃথিবীর সকল প্রকার মুখরোচক স্বাদযুক্ত খাদ্যের স্বাদ থেকে থাকে চির বঞ্চিত আর আয়ুস্কালও থাকে সীমাবদ্ধ। লেখক নিজেও যেন অনেকখানি এই দরিদ্র প্রকৃতি-কন্যার ব্যথায় কাতর, আর তাই তাঁর লেখনিতে মেলে ব্যথা কাতরতার প্রচ্ছন্নতার ইঙ্গিত:

> জন্মিয়া পর্যন্ত ইহারা কখনো কোন ভাল জিনিস খাইতে পায় নাই। অথচ পৃথিবীতে ইহারা নূতন আসিয়াছে, জিহ্বা ইহাদের নূতন—তাহা পৃথিবীর নানা রস, বিশেষত মিষ্টি রস আস্বাদ করিবার জন্য লালায়িত। সন্দেশ মিঠাই কিনিয়া সে পরিতৃপ্তি লাভ করিবার সুযোগ ইহাদের ঘটে না—বিশ্বের অনন্ত সম্পদের মধ্যে তুচ্ছ বনগাছ হইতে মিষ্টরস আহরণ এই সব লুব্ধ দরিদ্র ঘরের বালক বালিকাদের জন্য তাই করুণাময়ী বনদেবীরা বনের তুচ্ছ ফুলফল মিষ্টি মধুতে ভরাইয়া রাখেন।[৭]

বিভূতিভূষণ সভ্যতা ও প্রগতির পাশাপাশি আশ্চর্য দক্ষতার সাথে 'পথের পাঁচালী'তে তুলে এনেছেন পল্লীর জীবনবোধের সুখ-দুঃখের ইতিকথা। সর্বজয়ার পক্ষে সম্ভব হয় না কোনো সুখময় কিছুকে জয় করা। হরিহর পুরুতঠাকুর হয়েও তার যাপিত জীবন হয় হীনতম। পারে না সংসার

---

[৪] এম.এল. হোসাইন; সম্পাদক, *বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী* (ঢাকা: কল্লোল প্রকাশনী, ২০০৯), পৃ. ১৭৭।

[৫] অশ্রুকুমার সিকদার, *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস* (কলকাতা: অরুণা প্রকাশনী, ১৯৮৮), পৃ. ৮৩।

[৬] এম.এল. হোসাইন, সম্পাদক, *বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী*, পৃ. ৬৭।

[৭] এম.এল. হোসাইন, সম্পাদক, *বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী* , পৃ. ৮২।

সমুদ্রের ভাঙা-ভাসমান নৌযানখানিকে কোনো কল্পিত সুন্দরতম দ্বীপে ভেড়াতে। হরিহরের সমস্ত জীবন যেন জীবন থেকে পালিয়ে বেড়ায় নিজেকে বাঁচাবার জন্য। সীমাবদ্ধ গণ্ডি থেকে পালিয়ে কল্পনা প্রসূত হৃদয়মাঝে খোঁজে রোমান্স—'জীবন আসলে বিরাট একটা রোমান্স। বেঁচে থেকে একে ভোগ করাই সব।'[৮]

বিভূতিভূষণ জীবন যুদ্ধে একজন পরাজিত পোড়খাওয়া মানুষ; দুঃখ আর প্রিয়জন হারানোর যন্ত্রণা তার জীবনের নিত্য সাথী। তার জীবন যেন অনেকখানি উপেক্ষিত ও বিড়ম্বিত। নিজের 'জীবন পাঁচালী' যেন 'পথের পাঁচালী'; আপন জীবনের সীমাবদ্ধতা যেন 'পথের পাঁচালী'র সীমাবদ্ধতা। এরপরও স্বপ্ন জাগে, সাধ জাগে জীবনকে সুন্দর করে সাজাবার। আর তাই জীবনের পলিমাটি কর্ষণ করে রূঢ় বাস্তবতার সাথে প্রতিনিয়ত চলে বেঁচে থাকার চিরন্তন সংগ্রামী শপথ। পাঁচালীকার নিজের জীবনের দায়বদ্ধতা স্বীকার করেন জন্ম ও শৈশব খণ্ডে:

> ২৮শে ভাদ্র ১৩০১ সাল (১২ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৪) বুধবার বেলা সাড়ে দশটায় মাতুলালয় মুরাতিপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা মৃণালিনী দেবী। বাবা মা'র প্রথম সন্তান। পরের ভাই বোন যথাক্রমে ইন্দুভূষণ (১৩০৪-০৯), জাহ্নবী (১৩০৫-৪৪) ওরফে জাফরী, সরস্বতী (১৩০৮-২৫) ওরফে মনি বিভূতিভূষণ ডাকতেন 'দুর্গা' বলে, এবং নুটু বিহারী (১৩১২-৫৭)। জাহ্নবী-ছেলে মেয়ে নিয়ে বিধবা হলে দাদা বিভূতিভূষণ তাদের ভার গ্রহণ করেন, ইছামতীতে স্নান করতে গিয়ে এই বোন হারিয়ে যায়—সম্ভবত কুমির টেনে নিয়ে যায়। সরস্বতী মারা যান প্রথম সন্তান হওয়ার সময়, আর নুটু বিহারীর রহস্যজনক ভাবে আত্মহত্যা। বড়ভাইয়ের মৃত্যুর সপ্তাহখানেক পরে অনেকেরই ধারণা অপঘাতে মৃত্যু।[৯]

শিল্পীর অনুভববেদ্য সত্তা তাঁর রুচি-অনুভূতি আর পারিপার্শ্বিক অবস্থানকে কখনই পারেন না আড়াল কিংবা অস্বীকার করতে। যদি কোনো লেখক তা করেন, তবে তাঁর রচনা হবে নিষ্প্রাণ 'ফসিল' মাত্র। তাই ব্যক্তি-মনের শাশ্বত আবেগ-অনুভূতি-উচ্ছ্বাস-বাস্তবতা কল্পনার রঙ আর তুলি নিয়ে শিল্পের ক্যানভাসে চিত্রায়িত করেন শিল্পী। জীবনের অখণ্ড চিত্রের রূপায়ণ উপন্যাস। তাতে জাতশিল্পীর নাড়ির অচ্ছেদ্য সম্পর্ক থাকে বিদ্যমান। যে জীবনকে তিনি দেখেছেন প্রতি ক্ষণে, সেই জীবনবোধের ব্যাপ্তি-বিস্তারকেই জারিত করেছেন দক্ষতার সাথে সাহিত্যকর্মে। শৈল্পিক উপায়ে যখন জারিত জীবন বাস্তবতাকে ঢালেন শিল্পের ছাঁচে তখন তা বিশেষ হয়েও যেন হয় নির্বিশেষ। শিল্পীর কাজ অতি চেনা পরিচিত জগৎ থেকে কল্পলোকে আশ্রয় খোঁজা নয়। বাস্তবতার কাদামাটির পৃথিবীর চেনা জীবন জগতে আবাসন রচনা করে বসতি স্থাপন করা। সেই পথ এবং পদ্ধতির ভেতর দিয়েই 'পথের পাঁচালী'র রচয়িতা রচনা করেন নিজের জীবন পাঁচালী। দুর্গা চরিত্র পাঁচালীকারের নিজের জীবন-পাথরে খোদাই করা সত্য বাস্তব চিত্র, এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে না। হঠাৎ দেখা রঘুনন্দন হলের সেই মেয়েটিই তাঁর হারিয়া যাওয়া (মৃত্যুর গহবরে) ছোট বোন মনি যাকে শুধু মাত্র বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় একাই দুর্গা নামে ডাকতেন, যার জীবনকাল ছিল অতি সীমিত। প্রকারান্তরে অপুর দিদি দুর্গাকেও তিনি পারেননি জীবন জগতে বেঁচে থাকার জন্য অনেকখানি সময় দিতে। আর এক বিধবা বোন যাকে কুমিরে ধরে নিয়ে যায়

---

[৮] সুশীল কুমার চট্টোপাধ্যায়, *বিভূতিভূষণ দেশে বিদেশে* (কলকাতা: প্যাপিরাস, ১৯৮১), পৃ. ১৪।

[৯] বিভূতিভূষণ, *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, পৃ. ৮৮৬।

বলে ধারণা করা হয়, সেই বা ইন্দির ঠাক্‌রুণের অবস্থান থেকে ভিন্নতর কেমন করে ? ইন্দির ঠাক্‌রুণকে বিধবা হয়ে ফিরে আসতে হয় হরিহরের সংসারেই। সকল দিক দিয়ে যেন 'পথের পাঁচালী' পাঁচালীকারের নিজের জীবন সীমাবদ্ধতার কথাই অকপটে প্রচার করে। পাঁচালীকারের 'পথের পাঁচালী' যে তাঁর জীবন পাঁচালী সে কথাটি সুস্পষ্ট করতে গেলে প্রয়োজন গোপিকা নাথ রায়চৌধুরীর বক্তব্যও অনুধাবন করা:

> বিশ শতকের তৃতীয় দশকের বাংলা সাহিত্যের এই পটভূমি। এই বিভ্রান্ত বিক্ষুব্ধ প্রাণ-কল্লোল, সাহিত্যের খণ্ড বিশ্বাস আর ক্ষুব্ধ হতাশ্বাস—চেতনার পটভূমিতে এসে দাঁড়ালেন বিভূতিভূষণ। অজস্র খণ্ড দৃষ্টির তরঙ্গ মন্থন করে আবির্ভূত হল এক নতুন সমুদ্র- সম্ভব প্রাণ। সাহিত্যের আকাশ যখন ভরে উঠেছে নতুন সমাজ-চেতনায় বিচিত্র বাস্তব জীবন-সমস্যায়—সেই মুহূর্তে বিভূতিভূষণ নিয়ে এলেন এক শান্ত নির্লিপ্ত লিরিক সুরের নির্জন অবকাশ। বিক্ষুব্ধ জনজীবনের কর্মকোলাহল থেকে অনেক দূরে পল্লীর নির্জন পথে, ধু-ধু করা উধাও মাঠে, গহন রাত্রির নিঃসঙ্গ আকাশের তলায় যেখানে সহজ শান্ত জীবনের আবেগ গ্রন্থিত গভীর সুরগুলি স্তম্ভিত হয়ে আছে, বিভূতিভূষণ তাঁর প্রথম উপন্যাসের অতি পরিচিত পটভূমিতে সেই গুলিকে প্রকাশ করলেন নিরলঙ্কার অথচ আশ্চর্য ব্যঞ্জনাময় এক ভাষায়। বাইরের পৃথিবীতে যেখানে অসংখ্য দ্বন্দ্ব সমস্যা, জীবনের মূল্য পরিবর্তন নিয়ে মানুষের মন সংশয়ে জিজ্ঞাসায় উদ্‌ভ্রান্ত সাম্যবাদ ও যৌন সমস্যা যখন বাংলার মনন ও শিল্প প্রেরণাকে আচ্ছন্ন করেছে সেই সময় এক বিচিত্র মানুষটি দেশ-কাল বিস্মৃত আত্মবিহ্বল উদাসীন পথিক—শিল্পীর মতো রূপকথার এক স্বপ্নমুগ্ধ 'অলৌকিক' জগৎ রচনা করলেন। বাংলাদেশের পাঠক ও লেখক সমাজ যুগপৎ বিস্ময়ে হতবাক হল।[১০]

গোপিকানাথ রায় চৌধুরীর পর শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিহারী লাল চক্রবর্ত্তী প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছিলেন সে টুকুই প্রযোজ্য বলে প্রতীয়মান: 'সেই প্রত্যুষে অধিক লোক জাগে নাই এবং সাহিত্য কুঞ্জে বিচিত্র কলগীতি কূজিত হইয়া উঠে নাই। সেই ঊষা লোকে কেবল একটি ভোরের পাখি সুমিষ্ট সুন্দর সুরে গান ধরিয়াছিল। সে সুর তাহার নিজের।'[১১]

'পথের পাঁচালী'র সকল সমস্যা—সর্বোপরি দুর্গার জীবনচিত্র শুধু বিভূতিভূষণের একার, অন্য কারো নয়। সবাই যে যার অবস্থানে অবস্থিত হয়ে স্ব-স্ব চরিত্রে সংলাপ বলেছেন মাত্র।

দুর্গার বয়সী সকল শিশু যখন সুন্দর অসাধারণ বিজ্ঞানসম্মত খেলনাসামগ্রী হাতে নিয়ে ক্রীড়া-কৌতুক হয় মাতোয়ারা তখন দুর্গার খেলার বস্তুগুলো হয় প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত। সেইসব জিনিস যা অর্থ দ্বারা ক্রয় করতে হয় না, যার কোনো আর্থনীতিক মূল্যামান থাকে না। অপর দিকে দুর্গার বয়সী অন্য শিশুদের খেলনার অনেক বেশি মূল্য যা অপুর হত-দরিদ্র দিদির জীবনে অকল্পনীয়, অবাস্তব বলে অপুর শিশু হৃদয় বেদনাভারে ভারাক্রান্ত হয়ে বলে: 'আহা দিদিটার ওসব খেলনা কিছুই নেই—মরে কেবল শুক্‌নো নাটাফল আর রড়ার বিচি কুড়িয়ে...।[১২]

অপরদিকে দুর্গার বয়সী অন্যদের জীবন জগৎ ভিন্নতর। তাদের জীবন-প্রকাশেও রয়েছে রকমফের। অনেকেই 'পথের পাঁচালী'র অপুর তুলনা করেন 'জ্যাঁ-ক্রিস্‌তফ'-এর সাথে। অপু

---

[১০] গোপিকানাথ রায় চৌধুরী, *বিভূতিভূষণ; মন ও মনন শিল্প* (কলকতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪), পৃ. ১১।

[১১] মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* (ঢাকা: খান ব্রাদার্স, ১৯৯৮), পৃ. ৪০৭।

[১২] এম.এল. হোসাইন, সম্পাদক, *বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী*, পৃ. ১১৩।

একদিন নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের সকল সীমাবদ্ধতাকে পদদলিত করে, পাট চুকিয়ে বেরিয়ে পড়ে বিশাল জগৎ সন্ধানে, তারপর লাভ করে অনেকখানি পরিণত জীবন বোধে বিস্তার নানা প্রতিকূল পথ পরিক্রমা পার হয়ে। অপর দিকে শিশু অপুর প্রথম খেলার সাথী দুর্গা, যার মাধ্যমে সে পরিচিত হয় নিসর্গ প্রকৃতি এবং চারপাশের জল হাওয়ার সাথে, যার দৃপ্ত পদচারণায় 'পথের পাঁচালী'র বল্লালী বালাই ও আম-আটির ভেঁপু অংশদ্বয় সমৃদ্ধ প্রাণবন্ত-সজীব এবং মুখর, সেই চরিত্রটিই উপন্যাসে অনেকাংশে অনাদৃত। ঐ মেয়েকে না টানলে উপন্যাসটির সকল মাধুর্য বিনষ্ট হবার সম্ভাবনাই বেশি। যার জীবনের কোনো স্বাদই আস্বাদন করা হয়ে ওঠেনি, সেই দুর্গা। বল্লালী-বাল্লাই ও আম আঁটির ভেঁপু অংশ দুর্গার শিশুকালের এক অনবদ্য চিত্রালেখ্য, যার দাবিদার অনেক পল্লী বাংলার প্রাকযৌবন শিশু কন্যা। সেইসব খঞ্জনা কিংবা নাইটেংগলের জীবন যন্ত্রণার কথকতা কখনও প্রকাশ পায় না, থেকে যায় প্রদীপের নীচের অন্ধকার অংশের মতো আঁধারে। যারা হারিয়ে যায় সময় সীমায় তাদের আকুতি বেদনাবোধ কখনও পরিদৃষ্ট হয় না সমাজে, তারা অনেকখানি আঁধারেই রয়ে যায়। যেন সেই সব অনাদ্রিত শিশু কন্যারা জন্ম গ্রহণ করে অনাদর অবহেলায় হারিয়ে যাবার জন্য। তাদের হারিয়ে যাওয়াতে সমাজ-সংসারের কোনো অংশের কোনো বিচ্যুতি ঘটে না কিংবা দৃশ্যের ছন্দপতন ঘটে না, শুধুমাত্র প্রকৃতি যেন বেদনাভারে নুয়ে পড়ে তা ছিন্ন হবার যন্ত্রণায়। সেইসব শিশু প্রকৃতির অংশবিশেষ। সে কারণে প্রকৃতিই তাদের সকল চাহিদার দায়ভার বহন করে থাকে।

দুর্গার বয়সী অমলার খেলনাসামগ্রী অপুর শিশু মনে দিদির প্রতি করুণা জাগায়, দিদির সীমাবদ্ধতা প্রকাশ করার কিংবা ঘোঁচাবার সাধ্য নেই অপুর, তবুও অসম্ভব রকম টান অনুভব করে কষ্ট পেতে দেখা যায় তাকে। হতভাগ্য দুর্গার জন্য শুধুমাত্র অপুর হৃদয় বেদনায় পরিপূর্ণ হতে দেখা যায়। একমাত্র অপুই অনুধাবন করে দুর্গার সীমাবদ্ধতার আন্তর-যাতনা, কিন্তু ঘোঁচাবার সাধের কোনো কমতি নেই, শুধু আছে সাধ্যহীনতা আর অক্ষমতা। অমলা ছোট অপুকে তার খেলনা সামগ্রী দেখাতে যায়: 'অমলা তাহাদের আলমারি খুলিয়া কাঁচের বড় মেমপুতুল, মোমের পাখী, গাছ আরও কত কি দেখাইল। কালীগঞ্জে স্নানযাত্রার মেলা হইতে সে-সব নাকি কেনা...একটা রবারের বাঁদর, সেটা তুমি যেদিকে যাও, তোমার দিকে চাহিয়া পিট্‌পিট্ করিবে, কিসের একটা পুতুল, সেটার পেট টিপিলে দু'হাতে মৃগী রোগীর মত হঠাৎ হঠাৎ হাত পা ছুড়িয়া খঞ্জনি বাজাইতে থাকে।'[১৩]

অমলা দিদির বয়সী একটি মেয়ে, তার কত রকমারী খেলনাসামগ্রী আছে, অথচ দিদির কিছুই নেই। শুধু 'নেই' নয়, তার দিদি জন্মিয়া অবধি কখনও এসব খেলনা দেখেনি, ভীষণ কষ্ট পায় অপুর শিশু হৃদয়। অপুর যে দিদির জন্য কষ্ট পাওয়া, করুণা বোধ জন্মানো সবই 'পথের পাঁচালী'র আর্থনীতিক জীবন ব্যবস্থার নিম্নস্তরে বাস করা মানুষের জীবনের ইতিবৃত্ত। শুধুমাত্র খেলার সামগ্রীর তফাত নয়, মানুষের মৌলিক অধিকারও অনেকখানি খর্ব হতে দেখা যায়। 'দুর্গার মন আজ খুব খুশি আছে। রাত্রিতে রান্না প্রায়ই হয় না, ও বেলার বাসি ভাত তরকারী থাকে। আজ ভাত চড়িয়াছে, তরকারী রান্না হইবে, ইহাতে তাহার মহা আনন্দ। আজ যেন একটা উৎসবের দিন।'[১৪] ভগবানের সৃষ্ট এই জগৎ সংসার অতি বিচিত্র। ভগবান যেন ছোট্ট অবোধ শিশু,

---

[১৩] এম.এল. হোসাইন, সম্পাদক, *বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী*, পৃ. ১১২।

[১৪] এম.এল. হোসাইন, সম্পাদক, *বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী*, পৃ. ১২৪।

কাউকে প্রদান করে বিশাল ঐশ্বর্য আর কাউকে অনেকখানি বঞ্চিত করে। সেরূপ দৃশ্যকল্পেরই অনেকখানি ছায়াই বটে, অভাবতাড়িত হরিহর রায়ের কন্যা দুর্গার জীবন। তার জীবনে ভাল কিছু প্রত্যাশা করা যেন অপরাধ, বিশ্ববিধাতার অমোঘ নিয়ম যেন ক্ষণজন্মা দুর্গা হবে অভাবের ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবতী। বিভূতিভূষণ যেন ইচ্ছা করেই 'পথের পাঁচালী'র হরিহর রায়ের সংসার জীবনকে অনেকাংশে করেছেন হা-ঘরে, হা-ভাতে শ্রেণীর।

মা সর্বজয়া কখনও হতদরিদ্র সংসারের টানাপোড়েনের জন্য পারেননি পুত্র-কন্যাকে ভাল-মন্দ উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করে খাওয়াতে। অপু যখন অন্য কারো গৃহে মুখরোচক, স্বাদযুক্ত সব উপাদেয় খাদ্য আহার করে তখন তার মায়ের জন্য করুণা হয়, রাগ কিংবা ঘৃণা জন্মে না। করুণার কারণ আর্থনীতিক সীমাবদ্ধতা, হত-দরিদ্রের জীবন ব্যবস্থা বৈ অন্যকিছু নয়, সে প্রসঙ্গে:

> খানিক পরে বধূ মোহনভোগ তৈয়ারী করিয়া খাইতে দিল। একটা বাটিতে অনেক খানি মোহনভোগ—এত ঘি দেওয়া যে আঙ্গুলে ঘিয়ে মাখামাখি হইয়া যায়। অপু একটু খানি মুখে তুলিয়া খাইয়া অবাক হইয়া গেল এমন অপূর্ব জিনিস আর সে কখনো খায় নাই তো—মোহনভোগে কিসমিস দেওয়া কেন ? কেন তাহার মায়ের তৈরী মোহনভোগে তো কিসমিস থাকে না ? বাড়ীতে সে মায়ের কাছে আবদার ধরে মা, আজ আমাকে মোহনভোগ করে দিতে হবে। তাহার মা হাসিমুখে বলে—আচ্ছা ওবেলা তোকে করে দিবো—পরে সে শুধু সুজি জলে সিদ্ধ করিয়া একটু গুড় মিশাইয়া পুলটিসের মত একটা দ্রব্য তৈয়ারী করিয়া কাঁসার সরপুরিয়া থালাতে আদর করিয়া ছেলেকে খাইতে দেয়। অপু তাহাই খুশির সহিত এতদিন খাইয়া আসিয়াছে, মোহনভোগ যে এরূপ হয় তাহা জানিত না। আজ কিন্তু তাহার মনে হইল ও মোহনভোগে মায়ের তৈয়ারী মোহনভোগে আকাশ পাতাল তফাৎ। সঙ্গে সঙ্গে মায়ের উপর করুণায় ও সহানুভূতিতে তাহার মন ভরিয়া উঠিল।[১৫]

যার বয়স মাত্র আট বছর, তারও শিশু হৃদয় অনুধাবন করতে পারে হত-দরিদ্রের জীবন ব্যবস্থা, আর তাই মায়ের মোহনভোগ শুধু মাত্র সুজি এবং গুড় দিয়ে প্রস্তুত হলেও তার জন্য মায়ের প্রতি রাগ জন্মে না, জন্মে করুণা-সহানুভূতির প্রবল, কারণ বুঝতে বাকি থাকে না, মায়ের অক্ষমতা আর সীমাবদ্ধতা। তারা গরিব বলে তাদের ঘরে কখনও ভাল খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা হয় না। বুঝতে পারে দারিদ্র্য সীমার নীচে তাদের বাস।

দূরে অন্যের বাড়িতে যখন সুস্বাদু খাদ্য বস্তু আহার করতে বসে অপু, তখন তার হৃদয় বাতায়ন পথে ভেসে ওঠে দিদি দুর্গার সকরুণ মুখখানি, যার জিহ্বায় অফুরন্ত স্বাদের অতৃপ্তির বাসনা। সে অভাগী দিদির মুখে কখনও উঠবে না এমন সুস্বাদযুক্ত খাদ্যসামগ্রী। দিদির পক্ষে কখনই সম্ভব নয় এমন অমৃতসম স্বাদযুক্ত খাদ্যগ্রহণ। অপু ভাবতে থাকে:

> লুচি ! লুচি ! তাহাও তাহার দিদির স্বপ্ন কামনা পারের এক রূপকথার দেশের নীল-বেলা আবছায়া দেখা যায়...কত রাতে, দিনে ওলের ডাঁটাচ্চচড়ি ও লাউ-ছেঁচকি দিয়া ভাত খাইতে খাইতে, কত জল-খাবার—খাওয়া-শূন্য সকালে বিকালে, অন্যমনস্ক মন হঠাৎ লুব্ধ উদাস গতিতে ছুটিয়া চলে সেখানে যেখানে গরম রোদে দুপুরবেলা তাহাদের পাড়ার পাকা রাঁধুনী বীরুরায় গামছা কাঁধে ঘুরিয়া বেড়ায়, সদ্য, তৈয়ারী, বড় উনুনের উপর লোহার কড়াই-এ ঘি চাপানো থাকে, লুচি-ভাজার অপূর্ব সুধা-রুচি ঘ্রাণ আসে, কত

---

[১৫] এম.এল. হোসাইন, সম্পাদক, *বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী* , পৃ. ১১১।

> ছেলে-মেয়ে ভাল জামা-কাপড় পড়িয়া যাতায়াত করে, গাঙ্গুলি বাড়ীর বড় নাটমন্দির ও জলপাই তলায় বিছাইয়া গ্রীষ্মের দিনে সতরঞ্চ পাতা হয়, একদিন মাত্র বছরে সে দেশের ঠিকানা খুঁজিয়া মেলে—সেই চৈত্র বৈশাখ মাসে রামনবমী দোলের দিনটা তাহাদের সেদিন নিমন্ত্রণ থাকে ওপাড়ার গাঙ্গুলি বাড়ী। কিন্তু আজ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে সে সুদিনের উদয় হইল কি করিয়া। খাইতে বসিয়া বার বার তাহার মনে হইতেছিল, তাহার দিদি এরকম খাইতে পায় নাই কখনো।[১৬]

দিদি দুর্গার অনাস্বাদিত জীবন এবং সীমাবদ্ধতার কথা ভেবে, অপুর হৃদয় ভারাক্রান্ত। কিন্তু শিশু অপুর সীমাবদ্ধতার গণ্ডিকে অতিক্রম করার কোনো পথ জানা নেই। তাই কষ্ট পায় অবিরত। হত-দরিদ্র পরিবারের সন্তান অপুর মধ্যে আছে সহজাত আভিজাত্য, কারণ তারা ব্রাহ্মণ, জীবনের প্রতি পরতে পরতে পলেস্তরা খসা প্রাচীন বাড়ির ঐতিহ্য থাকে চিরায়ত প্রথাবদ্ধ সংস্কাররূপে। তার বেষ্টনী ভেদ করা দুঃসাধ্য।

হরিহর রায় যখন পৌরোহিত্যের কাজে যেতেন, তখন অপুকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। অপরদিকে বিভূতিভূষণের পিতা যখন পৌরোহিত্য বা কথকতা করতে যেতেন, তখন পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। সৌরেন বিশ্বাসের মতে:

> বাবার সঙ্গে বিভূতিভূষণ নানা জায়গায় বেড়িয়েছেন। মহানন্দ যখন পৌরোহিত্য বা কথকতা করতে যেতেন তখন পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। এর ফলে শিশুকাল থেকেই বিভূতিভূষণের দেশভ্রমণের প্রতি আকর্ষণ জাগ্রত হয় এবং পরিণত বয়স পর্যন্ত তা স্থায়ী হয়। বাবার কথকতা শুনে শিশু বয়সেই গল্প বলার অভ্যাস গড়ে তোলেন বিভূতিভূষণ। প্রথম প্রথম শ্রোতা অবশ্য গ্রামের গাছপালা, ঝোপঝাড় এবং নদীতীর, পরবর্তী কালে সমবয়সী খেলার সঙ্গী-সাথীরা।[১৭]

শিশু অপুও কথকতা শুনে এবং বাবার বাক্সে সংরক্ষিত বই পড়ে গল্প বলা শেখে। অপু পিতার চিন্তা চেতনায় অনেকাংশে আবিষ্ট হয়ে যায়। হরিহর রায়ের হৃদয়ের ছাপ পড়ে অপুর মধ্যে। পারিপার্শ্বিকতার চিত্র হতে শেখে আর্থ-সামাজিক বৈষম্যনীতি ও সীমাবদ্ধতার গণ্ডিকে।

বিভূতিভূষণ তাঁর সাহিত্য সাধনায় আর্থ-সামাজিক রীতি, সামাজিক-সাংস্কৃতিক গ্রামীণ জীবনালেখ্যকে প্রধান উপজীব্য করে উপন্যাস রচনার প্রয়াস চালান। নগর জীবনে অবস্থান করলেও যেন অনেকখানি নগর-বিমুখ ছিলেন। নগর জীবনে অবস্থান করেও হৃদয়ের গভীর থেকে উৎপাটিত করতে পারেননি গ্রামীণ জীবন অনুসঙ্গের মর্মব্যথা। ব্যক্তি জীবনের অপ্রকাশিত কথনের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন কখনও শিশু অপু আবার কখনও সংসারের যাঁতাকলে পিষ্ট হরিহর রায়ের মাধ্যমে। গ্রামীণ জীবনের ক্লান্তিকর আর্থনীতিক পরিমণ্ডল থেকে মুক্তির লক্ষ্যে পালিয়ে বেড়ানোর তাৎক্ষণিক প্রয়াস ধরা পড়ে তাঁর লেখনিতে:

> বিভূতিভূষণকে অনেকে পলাতক শিল্পী বলে ভাবতে পারেন। তাঁদের সপক্ষে যুক্তি আছে। তাঁরা বলবেন, বিভূতিভূষণ মনোধর্মের কবি। তিনি যদি তাঁর নিভৃতে স্বপ্নলোকের নির্জন উপলব্ধিগুলি কাব্যের আধারে রূপ দিতেন, তাহলে বোধ হয় তাঁকে নিয়ে এত কথা উঠত না। কারণ, সেক্ষেত্রে তাঁকে এক পরম ভাববাদী রোমান্টিক

---

[১৬] এম.এল. হোসাইন, সম্পাদক, *বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী*, পৃ. ১১৪।

[১৭] সৌরেন বিশ্বাস, *বিভূতিভূষণের উপন্যাসে শতবর্ষের বাংলাদেশ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯০), পৃ. ১০।

কবি বলে চিহ্নিত করতে আপত্তি হতো না। কারণ নিবিড় প্রকৃতি প্রেম ও অতীন্দ্রিয় চেতনা সমৃদ্ধ কবিকে পৃথিবীর মানুষ কখনও শ্রদ্ধা জানতে দ্বিধাবোধ করেনি।[১৮]

বিভূতিভূষণের সৃষ্ট অপু-হরিহর দুজনার মধ্যে প্রকৃতি প্রেম এবং রোমান্টিকতা বিদ্যমান। দুজনই গ্রামীণ জীবন থেকে দূরে গিয়ে অনেক খানি হাফ ছেড়েছে। অবচেতন মনে যেন হরিহরের কিশোর সংস্করণ অপু এবং অপুর বয়স্ক সংস্করণ হরিহর। অপর দিকে অপু-হরিহর মিলে যেন পরিপূর্ণ বিভূতিভূষণ। সর্বজয়া-দুর্গা যেন লেখকের পারিবারিক জীবনের প্রিয়জন। যাদের জীবন সীমাবদ্ধতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত তার প্রমাণ মেলে গোপিকা নাথ রায় চৌধুরীর ভাবনায়:

> অন্যদিকে সর্বজয়া, ইন্দির ঠাকরুন, এমনকি, বালিকা দুর্গার জীবন চর্যা পুরোপুরি বাস্তবমুখী। আগেই বলেছি, এর মধ্যে জড়িয়ে আছে আর্থিক দুর্গতি, অভাব-অনটন, দুশ্চিন্তা ও প্রতিদিনের নানান সমস্যা। উপন্যাসে এদের বাস্তব জীবন চিত্র বিশদভাবে আঁকা হয়েছে, কিন্তু তবু বলব, উপন্যাসটির মূল আবেদন ক্রমশ সংহত হয়েছে সর্বজয়া, ইন্দির ঠাক্‌রুণ, এমনকি দুর্গার জীবনবাস্তবতাকে অতিক্রম করে অপুর অন্তমুর্খ দৃষ্টির দর্পনে প্রতিফলিত এক গভীরতর জগতের দিকে।[১৯]

বিভূতিভূষণ আপন জীবন বাস্তব পরিবেশ নানামুখী ভাব-ভাবনার অনুষঙ্গে নির্মাণ করেন 'পথের পাঁচালী'র দুর্গা চরিত্র। তাঁর হৃদয়ের অস্থিরতাজনিত সমস্যা নিরসনকল্পেই দুর্গাকে সরিয়ে দেন কাহিনী থেকে, দুর্গা যেন আর্থিক স্বস্তির অবস্থানে না পৌঁছাতে পারে এবং ব্যঞ্জনাময় পৃথিবীর ঐশ্বর্য আকণ্ঠ পান না করতে পারে। সুখের উদিত সূর্যের আভাস সেখানে নেই, আছে না পাওয়ার তীব্র ভ্রুকুটি। অপরদিকে দুর্গার জিহ্বায় দিয়েছেন অপরিমেয় স্বাদ, যা পূরণের ব্যর্থ প্রয়াস লক্ষ করার মতো:

> অপু বনের মধ্যে কঞ্চি খুজিতে খুজিতে দেখিতে পাইয়া বলিল—ও-দিদি, ওফল খাসনি। দূর আশ্ শ্যাওড়ার ফলকি খায়রে। ওতো পাখিতে খায়—দুর্গা পাকা ফল টিপিয়া বীজ বাহির করিতে করিতে বলিল—আয় দিকি—দ্যাখ দিকি খেয়ে, মিষ্টি যেন গুড়, কে বলেছে খায় না ? আমিতো কত খেয়েছি।... থাকগে-কাল পালিতদের বাগানে বিকেল বেলা যাব বুঝলি? কামরাঙ্গা যা পেকেছে ! এই এত বড়, কাউকে যেন বলিসনে। তুই আর আমি চুপি চুপি যাবো—আমি আজ দুপুরে দু'টো পেড়ে খেয়েছি—মিষ্টি যেন গুড়...।[২০]

সমস্ত পৃথিবীর উপেক্ষিত অনাস্বাদিত এবং সীমাবদ্ধতার কথা 'মিষ্টি যেন গুড়' বাক্যটির মধ্যে লুকিয়ে আছে। তারপরও তা থাকে অপুরিত বাসনারূপে। কোর্মা নয়, পোলাও নয়, পিঠা নয়, সন্দেশ নয় এমনকি মোহনভোগও নয় সামান্য কচু সেদ্ধ ভাত, যা সর্বজয়ার পক্ষে জোটানোও সম্ভব নয়। সর্বজয়ার হৃদয় কন্যা-পুত্রের মঙ্গল চিন্তায় ব্যাকুল। দুর্গার ম্যালেরিয়া জ্বর, তার নেই ওষুধ-পথ্য এমনকি দুটাকার বিস্কুট কিনে দেবার সাধ্যও তার নেই। যে ঘরে বাস করে তাও যেন বাসপোযোগী নয়।

দুর্গা সকলের অজান্তে ধীরে ধীরে চলে যেতে থাকে অনাদরে অবহেলায় অন্য জগতে। সর্বজয়া যাকে মাতৃহৃদয় দিয়ে বন্য স্বভাবের জন্য শুধু শাসন করেছে, সে হৃদয় আজ আর থাকতে

---

[১৮] গোপিকানাথ রায় চৌধুরী, *বিভূতিভূষণ; মন ও মনন শিল্প*, পৃ. ১২।

[১৯] এম.এল. হোসাইন, সম্পাদক, *বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী*, পৃ. ৭৪।

[২০] এম.এল. হোসাইন, সম্পাদক, *বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী*, পৃ. ৮১-৮২।

চায় না দুর্গাহীন গ্রামখানিতে। দুর্গার মৃত্যুর সাথে সাথে 'পথের পাঁচালী'র বলালী-বালাই ও আম আঁটির ভেঁপু অংশদুটি যেন শেষ হয়ে যায়। লেখক শেষ হওয়া কাহিনী থেকেই জন্ম দেন বাকি লেখার। দুর্গার মৃত্যুর পর সর্বজয়া সিদ্ধান্ত নেন এদেশ ত্যাগের। জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে হরিহর রায় সপরিবারে নিশ্চিন্দিপুরের বাস উঠিয়ে কাশিতে চলে যান। কাশিতে যাবার পথে অপুর মনে পড়ে হতভাগী অনাথ দিদির মুখচ্ছবি:

> হঠাৎ অপুর মন এক বিচিত্র অনুভূতিতে ভরিয়া গেল। তাহা, দুঃখ নয়, শোক নয়, বিরহ নয়, তাহা কি সে জানে না। কত কি মনে আসিল অল্প এক মুহূর্তের মধ্যে... আতুরী ডাইনী... নদীর ঘাট... তাহাদের কোঠাবাড়ীটা... চালতে তলার পথ... রানুদি... কত বৈকাল..., কত দুপুর... কত দিনের কত হাসি খেলা... পটু... দিরি মুখ... দিদির কত না মেটা সাধ...। দিদি এখনও এক দৃষ্টে চাহিয়া আছে—। পরক্ষণেই তাহার মনের মধ্যের অবাক ভাষা চোখের জলে আত্মপ্রকাশ করিয়া যেন এই কথা বারবার বলিতে চাহিল—আমি চাইনি দিদি, আমি তোকে ভুলিনি, ইচ্ছে করে ফেলেও আসিনি- ওরা আমায় নিয়ে যাচ্ছে—সত্যই সে ভুলে নাই।[২১]

বলা বাহুল্য 'পথ'-এর মাঝেই বালক অপু চিত্ত-চঞ্চল হয় স্মৃতি মন্থনে, 'পথ' যেন তাকে বলে আজ থেকে সীমাবদ্ধতার গণ্ডি টুটে গেল, জীবন পাবে অন্য জগতের স্বাদ। আর কোনো শ্যামল গাঁয়ের বনের ছায়ায়-মায়ার কল্পনা নয় এখন সব বাস্তব। সেখানে নেই দুর্গা নেই ইন্দির ঠাকরুন, নেই আশ-শ্যাওড়া-বৈচি কিংবা ঢোলকলমী বন। সব পেছনে, অনেক দূরে... বহু দূরে... সুদুরে অতীতে...সামনে প্রসস্ত চলমান জীবন, নেই কোনো ক্ষয়িষ্ণু অভাবতাড়িত হতদরিদ্র জীবন। পথ অপুকে ডাক দেয়, এসো বালক দিদিকে ডেকো না, এদিকে এসো, দিদি থাক তার অপুরিত জীবনের কথকতা নিয়ে নিশ্চিন্দিপুরের ছাতিম তলায়। আলো-আঁধারীতে ঐ গ্রাম হোক দুর্গার অপুরিত অনাস্বাদিত এবং সীমাবদ্ধ জীবনের চারণ ক্ষেত্র। তোমরা চল, চলে এসো, এগিয়ে চলো নবীন জীবন-জগৎ সন্ধানে।

উপসংহার

বিচিত্র মানুষের জীবনানুভব, সমাজ বাস্তবতায় সাধারণ শ্রেণীর মানুষ সব সময় বাস করে এসেছে দারিদ্র্য সীমার নীচে। তাদের যাপিত জীবনপদ্ধতি যেন অনেকাংশে উপেক্ষিত। জল-জঙ্গলাকীর্ণ নিশ্চিন্দিপুর গ্রাম হরিহর-সর্বজয়ার সুস্থ-সবল সুখ-সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণতা প্রদান করতে পারেনি। সময় বাস্তবতার বাতাবরণে প্রগতির ধারাবাহিকতায় আর্থিক দৈন্য মানবতাকে করেছে পদদলিত, বিপন্ন, বিধ্বস্ত, বিকলাঙ্গ আর তাই হরিহর রায় সপরিবারে আজন্ম পরিচিত পরিবেশ থেকে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেয় এবং তা শেষ পর্যন্ত যায়ও। 'পথের পাঁচালী'র সীমাবদ্ধতা শেষ হয় অনেকাংশে নিশ্চিন্দিপুর থেকে চলে যাবার পর। এ উপন্যাসের সীমাবদ্ধতা থেকে যায় লেখকের ব্যক্তিজীবনের সীমাবদ্ধতা রূপেই। প্রতিপন্ন হয় দুর্গা নামক কিশোরীর রূপক চরিত্রের মাধ্যমে।

---

[২১] এম.এল. হোসাইন, সম্পাদক, *বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী*, পৃ. ২১০।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, সপ্তদশ সংখ্যা ১৪১৬

পাগলা কানাইয়ের গান : কবির আত্মপরিচয়ের দলিল

তপন কুমার গাঙ্গুলী*

ABSTRACT : Pagla Kanai (1809-1889), a famous folk poet appeared in 19th century. He was the contemporary of Lalan Shah (1772-1890). At the same time he was a poet, a philosopher, a votary and a humanitarian. He traveled many places in Bangladesh and sang his folk songs that was different from contemporary folk poets. For his inner talent he was remarkable even in the time of Lalan Shah. In the writings of folk poets contemporary society and individual life are reflected. The songs of Pagla Kanai are not different from that personal identity is seen in many of his songs.

ভূমিকা

উনিশ শতকের সূচনায় লোককবি পাগলা কানাইয়ের (১৮১০-১৮৮৯) আবির্ভাব। তিনি একই সঙ্গে অসংখ্য গানের রচয়িতা, সুরকার ও গায়ক। দরাজ কণ্ঠ, হৃদয়গ্রাহী গায়কি, রচিত পদের বিষয় অনুষঙ্গ, প্রকাশভঙ্গির সারল্য ও সমকালীন প্রসঙ্গের সংযুক্তি তাঁকে পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠা এনে দেয়।[১] বাউল সম্রাট লালন সাঁইয়ের (১৭৭৪-১৮৯০) জীবনকালে আবির্ভূত হয়েও তিনি সঙ্গীতকারের সুখ্যাতি লাভ করেন। সঙ্গীত প্রতিভার গুণে লক্ষ লক্ষ সঙ্গীতপিপাসু মানুষের মনে স্থায়ী আসন করে নেন। এ তাঁর অসাধারণ কৃতিত্ব। বাংলার লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে নিরক্ষর এই কবির অবদান তাই চিরস্মরণীয়। পাগলা কানাই স্মৃতি সংরক্ষণ সংসদ, ঝিনাইদহ প্রকাশিত 'পাগলা কানাই স্মৃতি স্মরণিকা-১৯৯৮'-এর সম্পাদক মহোদয় পত্রিকাটির উপক্রমণিকাভাগে কবি পাগলা কানাই প্রসঙ্গে যথার্থই বলেন: 'পাগলা কানাই। তিনি কবি, দার্শনিক, সাধক এবং মরমী। একের ভিতর অনেক। লোক সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর স্থান অনেক উপরে। প্রায় তিন হাজার ধুয়াজারী সংগীত রচনা করেছেন, সুর সংযোজন করেছেন এবং তারপর কণ্ঠ দিয়েছেন। তাঁর রচিত সমস্ত সংগীত সংরক্ষিত হয় নি। ... এ পর্যন্ত প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত প্রায় হাজার খানেক ধুয়া গান সংরক্ষিত হয়েছে বলে আমার ধারণা হচ্ছে। বাকী প্রায় দু'হাজার ধুয়াজারী গানের সিংহভাগ হারিয়ে গেছে চিরদিনের জন্য এবং সামান্য অংশ এখনও উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গে লোকমুখে 'জীবিত' রয়েছে তবে যে সব ভক্ত অনুরাগী ব্যক্তিগণ গানগুলি ধারণ করে আছেন তাদের এখন বয়স পঞ্চাশ থেকে সত্তরের মধ্যে। মনে হয় পরবর্তী এক যুগের ব্যবধানে

---

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, ডা: আব্দুর রাজ্জাক মিউনিসিপ্যাল কলেজ, যশোর।

[১] আবুল আহসান চৌধুরী, *পাগলা কানাই লোকায়ত জীবনের ভাষ্যকার* (ঢাকা: মনন প্রকাশ, ২০০৭), পৃ. ৪৮।

অবশিষ্ট গানগুলো থেকে আমরা বঞ্চিত হব"।[২] আশঙ্কাটি অমূলক নয়। তাই এ সাধক কবির গান সংগ্রহ ও সংরক্ষণে শীঘ্রই যথাযথ পদক্ষেপ প্রয়োজন। এ যাবৎ অল্প কিছু গ্রন্থ ও পত্রিকায় পাগলা কানাইয়ের মাত্র কয়েক শত গান প্রকাশিত হয়েছে। এসব গানে বিবিধ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। শিল্পগুণের দিক থেকেও গানগুলো মোটেই উপক্ষেণীয় নয়। তাই গান রচনায় তাঁর কৃতিত্বকে সমসাময়িক অন্যান্য বাউল কবির তুলনায় কোনো অংশে ছোট করে দেখা যায় না। বিশেষ করে তাঁর দেহতত্ত্বের গানগুলোতে যথার্থ শিল্পকুশলতার পরিচয় বিদ্যমান।

ব্যক্তি মানুষ সমাজের অংশ। তাই সাহিত্যে সমাজ রূপায়ণের সঙ্গে সঙ্গে সমকালীন ঘটনা প্রসঙ্গ ও ব্যক্তি মানুষের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে রূপায়িত হয়। কখনও লেখক নিজেই হন নিজের লেখার চরিত্র। তখন স্ব-সাহিত্যে আত্মপ্রতিকৃতি ফুটে ওঠে। পাগলা কানাইয়ের গানে তাঁর আত্মপরিচয় বিধৃত হয়েছে নিজস্ব ভঙ্গিতে। স্বভাবতই গানগুলো থেকে আমরা তাঁর নাম-পরিচয় ও চেহারার বর্ণনা, শিক্ষা, জীবিকা, সুর-সাধনা, অসাম্প্রদায়িকতা, ইসলামি বিধানে আনুগত্য, ভ্রমণ-পিপাসা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, স্বতন্ত্র গায়কি, প্রতিপক্ষ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারি। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ বিবৃত গানগুলো হতে কবির আত্মপরিচয়ের স্বরূপ অন্বেষণই এ অধ্যায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য।

নাম-পরিচয় ও চেহারার বর্ণনা

পাগলা কানাইয়ের পিতার নাম কুড়ন শেখ, মাতার নাম মোমেনা বিবি। তাঁর পিতামহ ও প্রপিতামহের নাম যথাক্রমে মেছের শেখ ও ছলিম শেখ। কবির বড় বোনের নাম সরনারী ও ছোট ভাইয়ের নাম উজল।[৩] পাগলা কানাই দরিদ্র কৃষক পরিবারের সন্তান। তাঁর পরিচয় প্রসঙ্গ বিবৃত হয়েছে নিচের এই গানে:

> ছ্যাড়া চলে ফেরে তাড়ুম তুড়ুম
> তারে মারে সবাই গাড়ুম গুড়ুম,
> বাপ এক গরীব চাষা,
> ছাওয়াল তার সর্বনাশা।[৪]

এখানে প্রথম চরণটি কবির 'পাগলা' স্বভাব নির্দেশক। এ স্বভাব-বৈশিষ্ট্যই কবির নামের পূর্বে যুক্ত। তিনি দরিদ্র ঘরের ছেলে—এ পরিচয়ও গানটিতে বিদ্যমান। ড. মযহারুল ইসলাম উদ্ধৃত গানের মর্ম অনুধাবন করে বলেন:

> কবি শৈশবে অত্যন্ত দুরন্ত প্রকৃতির বালক ছিলেন এবং তার স্বভাবটিও ছিল পাগলাটে। সেই জন্যেই বোধ করি শৈশব থেকেই লোকেরা তাকে পাগলা আখ্যা দিয়ে থাকবেন। ... শৈশবে যা ছিল খেয়ালীপনা এবং দুরন্তপনা, পরবর্তী জীবনে তাই তাকে এক গভীর ভাব গভীরতার মধ্যে তন্ময় করে দিয়েছিল এবং তা সাধারণ মানুষের চোখে আর এক জাতীয় পাগলামি বলে প্রতিভাত হয়েছিল। ... তাঁর

---

[২] মীর সাখাওয়াৎ হোসেন, "উপক্রমণিকাভাগ", *পাগলা কানাই স্মৃতি স্মরণিক -১৯৯৮* (ঝিনাইদহ: কানাই স্মৃতি সংরক্ষণ সংসদ, ১৯৯৮), পৃ. ৮।

[৩] আবুল আহসান চৌধুরী, পৃ. ১২।

[৪] মযহারুল ইসলাম, *কবি পাগলা কানাই* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭), পৃ. ১১।

> কবিকীর্তির সাথে এই পাগলা নামটি অভিন্ন সূত্রে গ্রথিত হয়েছে—সারাজীবনের জন্যে তা হয়ে রয়েছে তাঁর অঙ্গভূষণ, তাঁর চরিত্রের অলঙ্কার।[৫]

কবির 'পাগলা' উপাধি প্রাপ্তি সম্পর্কে মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্যের মন্তব্য:

> সাধারণে কানাইকে পাগলা কানাই বলে। এই বিশেষণ পদটী দ্বারা দুগ্ধে মধু সংযোগবৎ এক অতি অপূর্ব ভাবের মিলন হইয়াছে। কানাই বাল্যে দুরন্ত ও যৌবনে বড় উচ্ছৃঙ্খল ছিল—তাই তাহার ভাবুক পিতা কুড়ন শেখ তাহাকে পাগলা মিয়া নাম দিয়াছিল। যখন কানাইর উদয়োন্মুখী প্রতিভা তাহার উচ্ছৃঙ্খলতাকে কবিত্বের ভাবরাজ্যে লইয়া অমরত্বের পথে চলিল, তখন তাহার পাগলা উপাধি সার্থক হইল।[৬]

পাগলা কানাইয়ের গানে তাঁর জন্মস্থান, সন ও তারিখ পাওয়া যায়নি।

পাগলা কানাইয়ের কতগুলো গানে স্বীয় দৈহিক গঠনের বিবরণ পাওয়া যায়। তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে সে বিবরণে রঙ্গরসিকতার পরিচয়ও স্পষ্ট। কানাই-এর উঁচু দাঁতের কথা আছে একটি গানে। যেমন:

> কানাইয়ের দাঁত উঁচো
> উজলের মাজা কুঁজো।[৭]

কবির শারীরিক গঠন বা চেহারা বর্ণনা প্রসঙ্গে তাঁর পৌত্র শেখ এমদাদুল হক অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি 'নিরক্ষর কবি পাগলা কানাই'-এ বলেন, "তাহার রূপ চেহারা ভাল ছিল না। শরীর চিকন, খ্যাটখেটে, দাদো গা এর ন্যায় খশখশে। ছামনের দাঁত দুইখান উঁচু ছিল।"[৮] পাগলা কানাই সুদর্শন ছিলেন না। মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্যের লেখায় এ বক্তব্যের প্রমাণ মেলে। তিনি বলেন, তাঁর "অঙ্গের গঠন যেমন কদর্য্য, বেশভূষাও তদনুরূপ আড়ম্বরশূন্য।"[৯] তবে ধুয়া-জারি গানের বয়াতি হিসেবে যৌবনে কানাইয়ের বেশভূষায় এক বিশেষ শ্রী দেখা যায়। তাঁর মাথায় ছিল লম্বা চুল। চুল ঝাঁকিয়ে সুন্দর অঙ্গভঙ্গিতে নেচে নেচে গান করায় তিনি এতোটাই দক্ষ ছিলেন যে, সে যুগে তার জুড়ি মেলা ভার ছিল। ফলে বিভিন্ন স্থানে তাঁর নাচের গল্প হতো। এ সংক্রান্ত তথ্য রয়েছে নিচের গানটিতে:

> আগে তো ছিল ছিরি, ঘুরিফিরি,
> নাচি রাজার রাজ সভায়,
> আমার চুল ছিল হাত পাঁচ ছয়,
> দেশ বিদেশে আমার নাচার গল্প হয়।[১০]

শেষ বয়সে কবির স্বাস্থ্যহানি ঘটে এবং পূর্বের সৌন্দর্য নষ্ট হয়। যেমন:

> এখন পড়েছি ভাটি, ধরেছি লাঠি,
> দন্তগুলো নড়েছে,
> আমার চুল দাড়ি পেকেছে,[১১]

---

[৫] মযহারুল ইসলাম, পৃ. ১১-১২।

[৬] মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য, "নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্য কবিতা" *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, দ্বাদশ ভাগ, ২য় সংখ্যা, ১৯১৫, পৃ. ৮৪।

[৭] মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য, পৃ. ৪৮।

[৮] শেখ এমদাদুল হক, "নিরক্ষর কবি পাগলা কানাই" (অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি, পৃ. ৫০)।

[৯] মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য, পৃ. ৩৪৫।

[১০] মযহারুল ইসলাম, পৃ. ৩৪৭, গান ৩৬১।

অন্য একটি গানে কবির বৃদ্ধ বয়সের রূপ-চেহারার ছবি পরিস্ফুট:

পাগলা কানাইর দিন গিয়েছে
হইছে নড়বড়ে
সবে বলে, রঙের ধূয়ো
গাও ভাল ক'রে।
দাঁতগুলো ভাই সব গেছে পড়ে,
ধূয়ো রচব কেমন করে,
কথায় আমার আইট বসে না
ফস করে কথা যায় স'রে ॥
জোয়ানকী বাহারের কালে,
কতই রং দেখায়,
এখন বলে স'রে বস,
ছ্যাপ পড়ে মোর গায়,
আফসোসেতে ছাতি ফেটে যায়,
মাটি নাইরে গাছের গোড়ায়
হেঁটে যেতে হুটরে পড়ি
হোঁচট লাগে গায় ॥
ঘরের বেড়া নাইরে আমার,
লাল পড়ে মোর বুকি,
রাত দিন আমার ঘুম আসে না,
ভনভনায় মাছি,
বড় বেহালেতে আছি,
আবার রাতদিন আমার হাত আজোড় নাই,
শুধু চোখের কেতর মুছি ॥[১২]

বৃদ্ধকালে কবির দাঁত পড়ে যায়, চুলও পাকে। কথা বলতে মুখ থেকে থুথু বের হয়, হাঁটতে গিয়ে হোঁচট খান, চোখেও সমস্যা দেখা দেয়। অর্থাৎ বয়সের সাথে সাথে কবির স্বাভাবিক শ্রী নষ্ট হয়। দন্তহীন কবির শ্রীহীনতার রসময় বর্ণনা আছে অনেক গানে। যেমন:

হইছি বুড়ো হেলন চূড়ো,
সবে বলে বাঞ্ছা কুড়ো,
নাচে যেমন তাড়াকতুড়ো,
আর দন্ত গালে নাই।[১৩]

পাগলা কানাইয়ের চেহারা খুব ভালো ছিল বলা যায় না। নিচের গান দুটি লক্ষণীয়:

পূর্ব দেশে এসে পাগল কানাই বেড়াচ্ছে ঘুরে,
ও তার রূপ দেখে সব লোকে হাসে।
... ...
পাগল কানাই সাঁকের ঘোড়া সর্বলোকে কয়,
মাজা মরা শুকনা যারা খাপরার মত মুখ

---

[১১] মযহারুল ইসলাম, পৃ. ৩৪৭, গান ২৬১।
[১২] মযহারুল ইসলাম, পৃ. ৩৫০, গান ২৬৫।
[১৩] মযহারুল ইসলাম, পৃ. ৩৪৮, গান ২৬৩।

ওরে দেখা যায় সেই টংরু ভেংরু,
কেউ বলে এক কর্মেতে লাগে
হয় লাংগলের মুড়ো,[১৪]

এবং

পাগলা কানাই সাচে গড়া
মানুষতো ছন্নছাড়া লম্বা মন্দ নয়,
আটচালা ঘরে লাগালে মধ্যের খামটি হয়,
তেমনি ভাব দেখা যায়,
যেমন দাড়ি তেমনি বাবরী
তেমনি চাদ্দর গায়,
কি আরে ও ভাই সকল,
চুল দাড়ি তার বাড়িয়া গেছে
নাক মুখ বুঁজে দেখা নাহি যায়।[১৫]

উপর্যুক্ত গানগুলোতে কবির রসবোধের পরিচয়ও বিদ্যমান। কবির এই অন্তর্গত রসবোধের কারণে স্বীয় চেহারার একটু বেশি বিকৃত উপস্থাপন হয়েছে মনে হতে পারে। ব্যঙ্গ প্রবণতা গায়ক পাগলা কানাই চরিত্রের বিশেষ দিক। প্রতিপক্ষ বয়াতির উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গ করতেন তিনি। ব্যঙ্গের তীব্রতায় বয়াতি পর্যুদস্ত হতো। প্রতিপক্ষের উদ্দেশ্যে একটি গানে তিনি বলেন:

গোল কর না ভাই সকলরা
পাগলা কানাই বলে,
অনেক দিনের পরে বয়াতী
পড়েছে আজ কলে
মনের সাধা সেধে দিব রে–
তুই ধুবি গঙ্গা জলে।।
... ...
গল্প গুজব করে বেড়াও,
ও ভাই সোনামদ্দি,
জানি না সে পাগলা কানাইর
কাঁচড়া পাড়ার বুদ্ধি
রোগ চিনে, ওষুধ কিনে,
চালাব হলকামের মধ্যি।[১৬]

ভিন্ন একটি গানে গায়ক ইদু বিশ্বাসকে ব্যঙ্গ করেন এভাবে:

ওর একটুখানি বেজুত আছে,
খসখসে আর দাদো গা,
তাই বইতো আর কিছুই না,
তাইতে হেসে বাঁচি না,[১৭]

---

[১৪] আবুল আহসান চৌধুরী, পৃ. ৩০৩, গান ৩১৬।
[১৫] মযহারুল ইসলাম, পৃ. ৩২২, গান ২৩৪।
[১৬] মযহারুল ইসলাম, পৃ. ৩৬৬, গান ২৮৫।
[১৭] মযহারুল ইসলাম, পৃ. ৩৪০, গান ২৫৩।

রঙ্গ-রসিকতা ও ব্যঙ্গ-প্রবণতা আসরের কবি কানাইকে জনপ্রিয় করে।

শিক্ষা

পাগলা কানাই বালক বয়সে দরিদ্র কৃষক পিতার আগ্রহে গ্রামের মক্তবে পড়তে যান। কিন্তু পাগলা স্বভাবের কারণে তাঁর লেখাপড়া হয় নি। তিনি একটি গানে প্রসঙ্গটি বিধৃত করেছেন :

লেখাপড়া শিখব বলে,
পড়তে গেলাম মক্তবে
পাগলা ছ্যাড়ার হবে না কিছু
ঠাট্টা করে কয় সবে
... ...
সে আবার পড়তে আসে কেতাব কোরান ফেকা
পাগলা কানাই কয় ভাইরে লেখাপড়া হোল না শেখা।।[১৮]

লেখাপড়া শিখতে গ্রামের মক্তবে কেতাব-কোরান আগ্রহের সঙ্গে হাতে ওঠালেও শেষ পর্যন্ত তাঁর লেখাপড়া হয়নি। নিরক্ষর থেকে যান কবি, অথচ অসাধারণ তাঁর গান রচনার ক্ষমতা। জীবনের পাঠশালায় তিনি শিক্ষা লাভ করেন আমৃত্যু। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে প্রগাঢ় উপলব্ধিতে পৌঁছান। অন্তর-সাধনায় পান আধ্যাত্মিক জগতের সন্ধান। তাঁর সঙ্গীত রচনা সম্পর্কে অনেক কিংবদন্তি প্রচলিত, আবার সঙ্গীত শিক্ষা বিষয়ে বাস্তবধর্মী তথ্যও পাই। কবির সঙ্গীত-গুরুর নাম নয়ান ফকির। এ প্রসঙ্গে মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য লিখেছেন :

> যশোহর জেলার দক্ষিণাংশে কেশবপুরের নিকটবর্তী রছুলপুর গ্রামের 'নয়ান ফকির' নামে একটি নিরক্ষর মুসলমান কবি এই জারী গীতের দল প্রস্তুত করিয়া নিরক্ষর কবির শিরোভূষণ পাগলা কানাইকে এই জারীগীত শিক্ষা দেয়। আবার কেহ কেহ এরূপও বলিয়া থাকেন যে, আতসবানু ও ইছুন নামক আর তিনজন নিরক্ষর কবি কানাইর শিক্ষক। কিন্তু আমরা তাহার বংশীয় একটি কৃষকের নিকট শুনিয়াছি যে, নয়ান ফকিরই কানাইর গুরু।... যাহা হউক কানাই যাহার নিকট শিক্ষা করুক না কেন, গুরু হইতে তাহার ক্ষমতা অধিক।[১৯]

পাগলা কানাই-এর শিক্ষাগুরু প্রসঙ্গে মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্যের বক্তব্যের সত্যতা মেলে যখন কবি নিজেই গুরুর পরিচয় দিয়ে বলেন:

উস্তাদ আমার নয়ান ফকির
সভায় দিলাম পরিচয়।[২০]

পাগলা কানাই এবং তাঁর সঙ্গীত প্রতিভার পরিচয় প্রসঙ্গে ভিন্ন একটি তথ্য পাওয়া যায় সরোজনাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখায়। তাঁর ভাষায় :

> পাগলা কানাই। ইনি এক সন্ন্যাসীর শিষ্য। কানাই প্রথমত গুরু উপদেশানুসারে কঠোর সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া উন্মত্তবৎ হইয়াছিলেন। এই জন্যই ইহার নাম রটিল—পাগলা কানাই। পথভ্রষ্ট না হওয়ায় কানাই ক্রমশ প্রকৃতিস্থ হইলে,

---

[১৮] মযহারুল ইসলাম, পৃ. ১১।
[১৯] মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য, পৃ. ৮৩-৮৪।
[২০] আবুল আহসান চৌধুরী, পৃ. ২০।

সাধনাফলে আত্মশক্তির বিকাশহেতু অবশেষে ইহার অপূর্ব্ব প্রতিভা বিকাশ পাইল; কিন্তু কানাই নিরক্ষর। এই হেতু বাগ্‌দেবীও যেন কানাইয়ের প্রতি একটু বিশিষ্টরূপ সদয় হইলেন; কানাইর এরূপ শক্তি জন্মিল যে, আসরে শোতৃবর্গের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তিনি একসঙ্গে গান রচনা ও গাওনা করিতে সমর্থ হইতেন; পাগলা কানাইর কবিত্ব সাধনাভিজ্ঞতা ও শিক্ষাভাব এ তিনেরই পরিচয় স্বরূপ আমরা তাহার রচিত একটি গান নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। ...

মরার আগেতে মর;
শমনকে জব্দ কর;
যদি তাই করতে পার, ভবপারে যাবা, রে মন রসনা।
এই মোরদা দেহ জেন্দা বেশ থাকতে কেন মর না? ...[২১]

পাগলা কানাইয়ের শিক্ষা লাভে গুরু বা ওস্তাদের প্রভাব লক্ষণীয়, পাশাপাশি তাঁর সঙ্গীত-প্রতিভা বিকাশে অলৌকিক শক্তির প্রভাবও দুর্লক্ষ্য নয়।

জীবিকা

কৈশোর উত্তীর্ণ পাগলা কানাই কিছুদিন নীলকুঠির খালাসির চাকরি করেন। কানাইয়ের কর্ম প্রসঙ্গে মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য বলেন, "যশোহর জেলার মাগুরা মহকুমার নিকটস্থ বাঁশকোটার চক্রবর্তীদিগের বেড়বাড়ী গ্রামের নীলকুঠিতে কানাই নাকি দুই টাকা বেতনে খালাসির কার্য্য করিত। এ সময় কানাই নবীন যুবক।"[২২] প্রত্যেক দিন নীল রক্ষার কাজে নিযুক্ত থেকে নীলের জমির মধ্যেই তাঁর সঙ্গীত জীবনের সূচনা হয়। জারি-গীত গাইতে তিনি ধুয়া রচনা আরম্ভ করেন। খালাসির চাকরিতে কবি চার বছর নিয়োজিত ছিলেন।[২৩] গান ও সুর পেয়ে বসলে কানাইয়ের বয়াতি পরিচিতি সারা বাংলায় ব্যাপ্ত হয়। তখন বায়নায় গান গেয়ে তিনি জীবিকার্জন করেন। কানাইয়ের গানের মাধ্যমে পাবনা জেলায় নতুন হাট উদ্বোধনের কথা আছে। এ বিষয়ে প্রামাণ্য গান নিম্নরূপ:

জ্যৈষ্ঠ মাসের পাঁচই রে ভাই
তারিখ বুধবার,
আমি পাবনা জেলার গ্রামে গেলাম
নতুন হাট উঠাইবার[২৪]

অন্য একটি গানেও পাবনার এক বারোয়ারি মেলায় কবির গান গাইতে যাওয়ার কথা আছে। এ বিষয়ে প্রামাণ্য গান নিম্নরূপ:

সন ১২৮৪ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে,
পাবনায় হচ্ছে বারোয়ারি শোন ভাই বলি।
কতই লোকে দিচ্ছে বাহার এসে...[২৫]

---

[২১] সরোজনাথ মুখোপাধ্যায়, *শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ* (কলকাতা: ১৯১৭), পৃ. ১৫৯-১৬০।

[২২] মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য, "নিরক্ষর কবি- পাগলা কানাই", *ভারতবর্ষ*, মার্চ ১৯১৮, পৃ. ৩৪৬।

[২৩] মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য, পৃ. ৩৪৬।

[২৪] মযহারুল ইসলাম, পৃ. ৩১৬।

[২৫] মযহারুল ইসলাম, পৃ. ৩১৭।

কানাইয়ের জীবিকা প্রসঙ্গে ড: মযহারুল ইসলাম বলেন, "কবি সঙ্গীত সাধনাকেই জীবিকার একমাত্র অবলম্বন বলে গ্রহণ করেছিলেন। এতেই তাঁর যে অর্থাগম হতো তা দিয়ে কায়ক্লেশে তাঁর সংসারের ব্যয় নির্বাহ হতো। তথাপি কবিকে যে মাঝে মাঝে অর্থ রোজগারের অন্য উপায়ও দেখতে হয়েছে, এমন প্রমাণ তাঁর গানে আছে।"[২৬] কবি যশোর থেকে সুপারি বোঝাই নৌকায় মাঝি হয়ে পাবনায় উল্লাহপাড়ার নলকা অঞ্চলে ব্যবসার উদ্দেশ্যে যান:

উল্লাহপাড়ার ঘাটেতে ব্যাতের লা'র মাঝি হয়ে
গিয়াছিলাম সুপারী বেচতে[২৭]
অথবা,
ছিলাম ব্যাতের নৌকাতে,
নলকার বন্দরেতে
মগাই সুপারী বোঝাই তাতে[২৮]

অতএব, শুধু গানই কবির জীবিকা-মাধ্যম ছিল না, জীবিকার জন্য তাঁকে ব্যবসাও করতে হয়।

সুর সাধনা

আজীবন সুরের সাধনায় মগ্ন সঙ্গীত সাধক পাগলা কানাই। গানই তাঁর ধ্যান। গানের সুরে তিনি সারা বাংলাদেশ মাতিয়ে রাখেন। এ সুর-সাধক সম্পর্কে ও তাঁর গানের ব্যাপ্তি প্রসঙ্গে জলধর সেন বলেন, "একসময়ে পাগলা কানাইয়ের গানে যশোহর, ফরিদপুর, পাবনা ও নদীয়া জেলার অংশ বিশেষ ভাসিয়া গিয়াছিল। পাগলা কানাইয়ের গান শুনিবার জন্য এক সময় চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার নিম্নশ্রেণীর হিন্দু-মুসলমান এক স্থানে সমবেত হইত। একদিনের পথ হাঁটিয়া লোকে পাগলা কানাইয়ের গান শুনিতে আসিত।"[২৯] এর প্রমাণ এখনও ঝিনাইদহের বেড়বাড়ি গ্রাম ধরে রেখেছে। প্রতি বছর কবির জন্মদিন পঁচিশে ফাল্গুনে বেড়বাড়িতে অবস্থিত কবির মাজার প্রাঙ্গণে বিভিন্ন শিল্পী-কণ্ঠে কানাইয়ের গান শুনতে হাজার হাজার লোকের সমাগম ঘটে। শ্রী দুর্গাদাস লাহিড়ী 'পাগলা কানাইয়ে সুর'[৩০] বলে এক অভিনব সুরের কথা উল্লেখ করে বলেন, "পল্লী সঙ্গীতের জগতে এ সুরের আবেদন যে কত গভীর, মর্মস্পর্শী ও জনপ্রিয়, তার প্রমাণ আজো পাক-বাংলার বিরাট অঞ্চলে রয়ে গেছে।"[৩১] এ প্রসঙ্গে জলধর সেনের উক্তি: "তোরা তো কানাইয়ের গান শুনিস নাই, তাহার গান শুনিলে লোকে পাগল হইয়া যায়।"[৩২] এরূপ সুর-পাগল কানাইয়ের সাধনা, ধ্যান এবং কর্ম 'সুর' হওয়ায় স্বাভাবিক। তিনি এতো নিষ্ঠাবান সুর-সাধক ছিলেন যে, গানের জন্যই ফকির হয়ে ঘর ত্যাগ করেন। প্রসঙ্গটি নিচের গানে বিবৃত হয়েছে:

পাগলা কানাই বলে,
হায় নতুন সুর হায়,
তুই বিনা মোর ব্রহ্মাণ্ডের পর,

---

[২৬] মযহারুল ইসলাম, পৃ. ৫০।
[২৭] মযহারুল ইসলাম, পৃ. ৩২০, গান-২৩৩।
[২৮] মযহারুল ইসলাম, পৃ. ৩২১, গান-২৩৪।
[২৯] জলধর সেন, *কাঙাল হরিনাথ*, ১ম খণ্ড (কলিকাতা, ১৯১৩), পৃ. ৪২।
[৩০] জলধর সেন, পৃ. ৪২।
[৩১] মযহারুল ইসলাম, পৃ. ৭৬৪।
[৩২] জলধর সেন, পৃ. ৪২।

আর তো কেহই নাই,
তোর তালাশে জনম ভরে
ডাংগায় না পাই ঠাঁই
অজ্ঞানে রাত্রিদিন,
ডাংগায় হয় হাঁটুপানি,
তুই মোরে যা করিস তা হয় ॥
মনে বলে, এ ঘর বাড়ী ছাড়ান দেব,
ফকির হব জংগলেতে রব,
সুরের আটন, সুরের ছাটন,
সুরে পাড় বাঁধিব,
আড়া বায়না খুটি খাম
ধূয়ো দিয়ে ঘর ছাব,
ঐ মটকার উপর খুঞ্জরী থোব ॥...[৩৩]

গানটিতে একজন আত্মভোলা সুর-সাধকের পরিচয় বিধৃত। সুরের সাধনা পাগলা কানাইয়ের মনে আনন্দের সঞ্চার করতো। যেমন:

শোনরে শোন ও ছ্যামড়ারা
নাচিস তোরা হাসিস কেন মনে মনে,
একখানা নূপুর দেনা কেনে,
মনের সুখে নেচে যাব এইখানে,
কত ভাব উদয় কানাইর মনে,[৩৪]

গানের মাধ্যমেই তাঁর মৃত্যু প্রসঙ্গ বিবৃত হয়েছে। মৃত্যুর পর ভাই বন্ধুদের অবস্থা সম্পর্কেও বলেছেন। শুধু তাই নয়, গানের মাধ্যমে আনন্দ আর আত্মবিশ্বাসে জগতে অমর হবার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন :

যেদিন যাব কবরের কাছে,
ভাই বন্ধু কাঁদবেরে বসে
থাকবে পড়ে মুল্লুক জুড়ে,
কানাইয়ের নাম দেশে দেশে।[৩৫]

আত্মভোলা সুর-সাধক পাগলা কানাইয়ের আত্মবিশ্বাস সত্য হয়েছে। সুরের সাধনায় প্রসিদ্ধি লাভ করে তিনি দেশ-দেশান্তরে পরিচিতি পেয়েছেন।

অসাম্প্রদায়িকতা

অসাম্প্রদায়িকতা লোককবি পাগলা কানাই চরিত্রের বিশেষ দিক। ধর্মমতে মুসলমান হলেও হিন্দু জাতির ওপর তাঁর শ্রদ্ধার কমতি ছিল না। এর প্রমাণ মেলে নিচের গানে:

নামটি আমার পাগলা কানাই জাতে মুসলমান,
হিন্দু লোকের বাড়ি আমরা করিতাম গাহান,
ব্রাহ্মণ পেলে আমরা করি কোটি কোটি প্রণাম,

---

[৩৩] মযহারুল ইসলাম, পৃ. ৩৪৬, গান ৬০।
[৩৪] মযহারুল ইসলাম, পৃ. ৩৪৭, গান ২৬১।
[৩৫] মযহারুল ইসলাম, পৃ. ৩৪৭, গান ২৬১।

সে নাম নারায়ণের সমান।[৩৬]

বাউল সম্রাট লালন সাঁইও অসাম্প্রদায়িক ছিলেন। পাগলা কানাই-এর অসাম্প্রদায়িক চেতনার পরিচয় বিধৃত হয়েছে কয়েকটি গানে। যেমন:

এক বাপের দুই বেটা, তাজা মরা কেহ নয়।
সকলেরি এক রক্ত, একই ঘরে আশ্রয়—
... ...
কেউ বলে দুর্গা হরি,
কেউ বলে বিসমিল্লাহ আখেরী,
তবু পানি খেতে যায় এক দরিয়ায় ॥
মালা পৈতা একজন ধরে,
কেউ বা সুন্নত করে,[৩৭]

কিংবা,

আছে হিন্দু কিংবা মুসলমান,
এক মায়ের দুটি সন্তান,
মউতকালে তৌবা পড়ে যত মুসলমান,
হিন্দু পার হয় বৈতরণী,
সকলের এক প্রাণ তো জানি,
কাজের বেলায় সকল এক সমান।
আছে এই ভবে সবার মরণ,
মুসলমানের গোর কাফন,
হিন্দু মলি শ্মশান দাহন,
হবে, এ দেহ চার চিজে মিলন।[৩৮]

পাগলা কানাইয়ের গানে হিন্দু-মুসলমান উভয় ঐতিহ্য সমানভাবে গৃহীত। ড. মযহারুল ইসলাম কানাইয়ের গানে উভয় ঐতিহ্যের ব্যবহার প্রসঙ্গে যথার্থই বলেন, "একদিকে মুসলমানদের পরওয়ারদিগার আল্লাহ্ পীর পয়গম্বর মুর্শিদ তাঁর সঙ্গীতে সশ্রদ্ধ আসন লাভ করেছেন, অন্যদিকে আবার বৌদ্ধ ধর্মের নিরঞ্জন, হিন্দুধর্মের বিষ্ণু, রাম, রাবণ, বলাই, গোরা প্রভৃতির প্রশস্তি তাঁর অনেক গানে স্থান লাভ করেছে।"[৩৯] যেমন, হিন্দু পুরাণ আশ্রিত একটি গান:

রাম লক্ষ্মণ সীতা যখন হইল বনবাস,
সে ছাইড়া দেশ, নিজবাস
বন বনে সীতা করছে গৃহবাস।
বনফল আরো গঙ্গার জল,
দুঃখে দুঃখে সীতার গেল চিরকাল।[৪০]

---

[৩৬] মযহারুল ইসলাম, পৃ. ৩২৩, গান ২৩৬।
[৩৭] আবুল আহসান চৌধুরী, *পাগলা কানাই* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫), পৃ. ৬৪।
[৩৮] মযহারুল ইসলাম, পৃ. ১৬৬, গান ৬৫।
[৩৯] মযহারুল ইসলাম, পৃ. ৫১।
[৪০] আবুল আহসান চৌধুরী, পৃ. ৬৫।

অন্য একটি গান:

প্রথমে আসরে এসে,
ডাকতেছি মা তোমারে,
কৃপা ক'রে সরস্বতী মা-জননী,
আমায় রেখ চরণে,
কণ্ঠে এসে কর স্থিতি,
ছায়া দাও মা আসরে,
আসরে আইছি আমি,
শুন মা ভব-তারিণী
বিরাণে ডাকি তোমায় মাগো,
তুমি শোন না কানে ॥
... ...
যেমন দয়া করেছিলে
চণ্ডী-কালিদাসেরে
ঐ মত কর দয়া,
মোরে দাও পদ ছায়া,
তোমার বিষমতারা নামটি শুনি
মাগো- আমি শুনি পুরাণে।...[৪১]

গানটি প্রসঙ্গে একজন গবেষকের অভিমত :

> এ গানে কবি সরস্বতীর বন্দনা করেছেন। একান্ত ভক্ত হয়ে তিনি দেবীর সাহায্য চেয়েছেন। এখানেই কানাইয়ের বৈশিষ্ট্য। তিনি আল্লাহ রসুলের বন্দনা যেমন করেছেন, আবার সরস্বতী, কালী, চণ্ডী, মহেশ্বর প্রভৃতি দেব-দেবীর বন্দনাতেও তাঁর কোন সংকোচ ছিল না। এতে কবির অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় সুস্পষ্ট হয়েছে।[৪২]

পাগলা কানাই মুসলমান এবং হিন্দুকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেননি। তাঁর সুগভীর উপলব্ধি:

শতরঙ্গের দেখিরে গাভী এক রঙ্গের দুধ গো দেখি
তবে কেন ত্রিজগতে মানবিচ করত্যাছি।[৪৩]

গাভী ভিন্ন রঙের হলেও দুধ একই রঙের হয়। এ পৃথিবীতে মানুষ ভিন্ন বর্ণের ও ধর্মের হলেও একই মায়ের সন্তান। হিন্দু বা মুসলমান নয়, মানুষ হিসেবে উভয় সম্প্রদায়ের লোকের প্রতি পাগলা কানাই ছিলেন সমান শ্রদ্ধাশীল এবং তাদের মধ্যে সদ্ভাব প্রত্যাশা ছিল তাঁর চিরকালীন নীতি। এরকম মানবদরদি, অসাম্প্রদায়িক কবি পাগলা কানাইয়ের গান শুনতে সেকালে হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান উপস্থিত হতো।[৪৪] এ ঘটনা প্রমাণ করে কবি ছিলেন হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তিত্ব।

---

[৪১] মযহারুল ইসলাম, পৃ. ১১৯, গান ১৪।

[৪২] মযহারুল ইসলাম, পৃ. ১১৯।

[৪৩] আবুল আহসান চৌধুরী, পৃ. ৬৫।

[৪৪] জলধর সেন, পৃ. ৪২।

ইসলামি বিধানে আনুগত্য

অসাম্প্রদায়িক কবি পাগলা কানাইয়ের ইসলামি বিধানে গভীর আনুগত্য ছিল। আল্লাহর রসুলের আদর্শকে তিনি মনেপ্রাণে ভক্তি-শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করেছিলেন। একজন সমালোচক পাগলা কানাইকে ইসলামি বিধান অনুসারী মেনে 'পাগলা কানাই স্মৃতি স্মরণিকা-১৯৯৮'-এ তাঁর কিছু গান উদ্ধৃত করেন। যেমন:

দীনে দীনে মোহাম্মদের দীন, আর কি আমার হবে।
লা-ইলাহা।। কলমা পড়, ইল্লালাহ দম ফের ছাড়–
মোমিন সকলে।[৪৫]

এবং

শুন মোমিন মুসলমান,
পড় রাব্বিল আলামিন;
দিন গেল কি পাবি ওরে দীন।
সেই দীনের মধ্যে প্রধান হলো—মোহাম্মদের দীন।
সেই দীনের দীন করে একিন—মুখে রচি চিরদিন।[৪৬]

মোদ্দাকথা, কবি পাগলা কানাই ছিলেন একজন একনিষ্ঠ ধর্মপ্রাণ মুসলমান। বস্তুত তাঁর কর্মজীবন ও কবি জীবনের ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায় ইসলামি বিধানই ছিল তাঁর জীবনের পথ প্রদর্শক। পাগলা কানাই জানতেন, আল্লাহ নামই মৃত্যুকালে সাথে যাবে। ঐ নামের ভক্তরাই বেহেস্তবাসী হবে। আল্লাহ ভক্তবান্দা তিনি, বিপদে আল্লাহকেই স্মরণ করেন। তিনি গানের সুরে বলেন:

যতসব মুসল্লিগণ জোট করে এক জায়গা,
ওক্তী নামাজ কাজা ক'রে ভাই,
শুক্রবার জুমায় যায়।
শিরণী ছালাৎ পাইলে পরে গো,
তারা জোট করে সব খায় ॥
বাদুরের দিনে রোজা
রাতে করে ভজনা,
সারাদিন সে উবদো হয়ে ঝোলে,
শেষ কালেতে মুসল্লিদের
ঝুলতে হবে এ প্যা'লে।
পাগলা কানাই হতবুদ্ধি গো,
আল্লা তরাও অকালে ॥[৪৭]

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম নামাজ প্রসঙ্গ এ গানে ব্যক্ত হয়েছে। প্রতিটি মুসলমানের জন্য নামাজ ফরজ। অথচ অনেকেই "ওক্তী নামাজ' কাজা করে শুক্রবারে 'জুমায় যায়'। এরকম 'মুসল্লিদের' প্রতি ব্যঙ্গ করে তিনি বলেন তাদের অবস্থা হবে 'বাদুরের' মতো।

---

[৪৫] মোঃ মুতাছিম বিলাহ মিন্টু, "বাউল সমাজ ও পাগলা কানাই", *পাগলা কানাই স্মৃতি স্মরণিকা-১৯৯৮*, পৃ. ৫৬।

[৪৬] মোঃ মুতাছিম বিলাহ মিন্টু, পৃ. ৫৬।

[৪৭] মযহারুল ইসলাম, পৃ. ১০৯, গান ৩।

পাগলা কানাইয়ের অনেক গানেই নামাজ-রোজার মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। কবি নামাজ পড়তে তাগিদ দিয়ে গান রচনা করেছেন। যেমন:

নামাজ পড়, পড়, নামাজকে ভুল না,
নামাজ ভুললে আখের হবে না।
বেনামাজী দাগাবাজী শয়তান হয়ে থেকো না,
বেনামাজী হলে পরে গো, তার জানাজা হবে না।...[৪৮]

পাগলা কানাই মুসলিমদেরকে নামাজে উদ্বুদ্ধ করেছেন। কারণ তিনি নিজে ইসলামি বিধান অনুসারী, আল্লাহ-ভক্ত প্রকৃত নামাজি ছিলেন। অথচ তৎকালীন ইসলাম-প্রচারক মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহর 'মেহেরুল এসলাম' গ্রন্থ থেকে জানা যায় মরমি সাধক পাগলা কানাইয়ের মৃত্যুর পর বেড়বাড়ীর পার্শ্ববর্তী গ্রাম ফকিরাবাদে উপস্থিত খামার আইলের মৌলভী হাফেজ মোহাম্মদ রায়হান উদ্দীন সাহেব তাঁর জানাজা পড়াতে অস্বীকৃতি জানান।[৪৯] এর কারণ সমকালীন কতিপয় শিক্ষিত মুসলমান ও মৌলবী সমাজের বাউল-ফকির, সাধক-কবি বা গ্রাম্য গায়কদের প্রতি উদাসীনতা ও তাদের সম্পর্কে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা বিচার-বিশ্লেষণ না করেই গ্রহণ করা।

ভ্রমণ পিপাসা

কবি পাগলা কানাই ভ্রমণ-বিলাসী ছিলেন। গান গাইবার উদ্দেশ্যে তিনি বহু স্থানে যেতেন। ধুয়া-জারি গানের রচয়িতা ও গায়ক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছড়ালে সঙ্গীত প্রিয় মানুষের আহ্বানে তাঁকে দেশান্তরে যেতে হতো। তাই ভ্রমণের ব্যাপারটি তাঁকে নেশার মতো পেয়ে বসে। উল্লেখ্য লালন সাঁইয়ের মতো তিনি এক স্থানে বসে সঙ্গীত সাধনা করেন নি। নিচের গানটি লক্ষণীয়:

আমি পাগলামো করে গাই জারী
কিসের আমার ঘরবাড়ী,
আমি হই দেশান্তরী,
পাগল কানাইয়ের কথা কিছু
শোন বাপু সকলে,[৫০]

এ গানে কবির দেশে দেশে গান করে বেড়ানোর কথা আছে। তাঁর গান শোনার জন্য মানুষ উন্মত্ত-অধীর হয়ে থাকতো। অন্য একটি গানে বলেন:

যাব যাব যমুনারই পার
মনের বাসনা ছিল আমার,
... ...
লাংগল মুড়োর পড়ান ব্যাপারী
তার নৌকায় চড়ে হলাম পার।[৫১]

এ গানেও কবির বিদেশ যাত্রার বিবরণ আছে। অপর একটি গান থেকে জানা যায়:

ভাদ্র মাসে অবশেষে
পাগলা কানাই দল বেঁধেছে

---

[৪৮] মযহারুল ইসলাম, পৃ. ১৩৬, গান ৩৩।

[৪৯] মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ, *মেহেরুল এসলাম* (যশোহর, ১৩৩২), পৃ. ৬১-৬২ (পাদটীকা)।

[৫০] মযহারুল ইসলাম,পৃ. ৩৫৬, গান ২৭৩।

[৫১] মযহারুল ইসলাম,পৃ. ৩৩৪, গান ২৪৭।

দল বেঁধে চলে যায় সে উত্তর দেশে,[৫২]

কবি জীবনকালের কোনো এক ভাদ্র মাসে গানের দল নিয়ে উত্তরবঙ্গে গান করতে যান। আর একটি গানে পাই:

আমি গিয়েছিলাম পূর্বদেশে,
পেয়েছিলাম তসর গরদ
আরো কত শা'ল,[৫৩]

এ গানেও কবির দেশ ভ্রমণের প্রসঙ্গ আছে। অতএব, কবির ভ্রমণপ্রিয়তা তর্কাতীত।

প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব গুণ, স্বতন্ত্র গায়কি ও প্রতিপক্ষ

তাৎক্ষণিক গান রচনায় ও স্বতন্ত্র গায়কিতে পাগলা কানাই সমকালীন লোককবিদের থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। গানের প্রতিযোগিতায় প্রতিপক্ষকে খুব সহজেই সূক্ষ্ম ও জটিল প্রশ্নবাণে জর্জরিত করতেন। পাগলা কানাই প্রতিপক্ষ হলে গানের প্রতিযোগিতা জমত। সমকালীন অন্য একজন লোককবি ইদু বিশ্বাস পাগলা কানাইয়ের প্রধান প্রতিপক্ষ ছিলেন। যেমন:

বার শ' ছিয়ানব্বই সাল
আটই আষাঢ় বৃহস্পতিবার,
গান হোল ভাই কাল বিকাল,
আমারে নয়, করে ছয়
এনেছি পাগলের দল
কি আর হবে বল,
ধর্মরাজ গান শুনিবে
ইদুর সঙ্গে পাল্লা হবে,
পাগলা কানাই চল।[৫৪]

কয়েকটি গানে ইদু বিশ্বাসকে কানাইয়ের প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখা যায়। নিচের গানটি লক্ষণীয়:

এই কি সে ইদু বিশ্বাস
শুনে থাকি নাম,
শুনে লোকে দেখতে এল,
এসে কলো বাঁধাইল–
ভোড়ো বাংগাল কন্‌তে এল,
সে বা কোন দেশে ছিল,
ওর মাথায় ফেটা
হুতুম বেটা
... ...
ইদু বিশ্বাসকে পেয়েছি আজ কোটে,
খাটিয়ে নেব আচ্ছা মত মোটে।[৫৫]

---

[৫২] মযহারুল ইসলাম,পৃ. ৩৩২-৩৩৩, গান ২৪৭।
[৫৩] মযহারুল ইসলাম,পৃ. ৩৪০, গান ২৫৩।
[৫৪] মযহারুল ইসলাম,পৃ. ৩৩২-৩৩৩, গান ২৪৫।
[৫৫] মযহারুল ইসলাম,পৃ. ৩৩৯-৩৪০, গান ২৫২।

ইদু বিশ্বাসের জন্ম বর্তমান ঝিনাইদহ জেলার ঘোড়ামারা গ্রামে। তিনিও একজন শক্তিশালী বয়াতি ছিলেন। শুধু ইদু বিশ্বাস নয়, আরো অনেকেই গানে কবির প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছেন। কিন্তু অপ্রতিদ্বন্দ্বী কানাই ছিলেন দক্ষ, যোগ্য ও শক্ত প্রতিপক্ষ। তাঁর এই গুণ সম্পর্কে গবেষক আবুল আহসান চৌধুরী বলেন, "প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব গুণ কানাইকে মেধাবী পদকর্তা ও গায়েনে পরিণত করেছিল। গানের আসরে প্রতিপক্ষের মোকাবেলায় চট-জলদি জবাব তৈরি, মুখে মুখে গান রচনা, কঠিন প্রহেলিকাপূর্ণ প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে প্রতিপক্ষকে পরাভূত করায় তাঁর জুটি ছিলো না। লোকবাংলার সঙ্গীত জগতে সমকালে তিনি হয়ে উঠেছিলেন একক, অনন্য ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী।"[৫৬] নিচের গানটিতে প্রতিপক্ষের কাছে কবি অনেক কূট প্রশ্ন তুলে ধরেন:

সভাই এসে ভাই,
আমি ঠেকলাম ভীষণ দায়,
যখন ছিলে মা'র উদরে
সেজদা দাও কোথায়॥
কোন জাগায় তোর মাথা ছিল
কোন্ জাগায় তোর ধড় ছিল
এই কথাটির মানে বয়াতী
আজ আমারে ভাল করে বল ॥
... ...
পঞ্চ ওক্ত আছে নামাজ,
মুরশিদ ধরে জানতে হয়,
কোন্ সময় কোন্ ওক্ত হয়,
পাগলা কানাই কয়,
পড়তে কখন ছুরা ইয়াছিন,
আল্ হামদো লিল্লা
অন্ধকারে মা'র উদরে
কে শিখায় বিছমিল্লা॥[৫৭]

এ গানে অনেক জটিল প্রশ্ন রয়েছে। গানটি প্রসঙ্গে মযহারুল ইসলাম বলেন:

> এ গানে অনেক কূট প্রশ্ন তুলে ধরা হয়েছে। মাতৃগর্ভে থাকাকালীন শিশু কি অবস্থায় থাকে তার অধ্যাত্ম বিবরণ দাবি করা হয়েছে। এ প্রশ্নগুলো Abstract idea নিয়ে। এর কোন বাস্তবরূপ বুঝানো সম্ভব নয়।[৫৮]

এভাবে জটিল প্রশ্ন ছুড়ে পাগলা কানাই প্রতিপক্ষ বয়াতিকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করতেন।

উপসংহার

জননন্দিত ও কালোত্তীর্ণ কবি পাগলা কানাই বাংলার লোকগানের প্রতিভাবান স্রষ্টা ও শিল্পী। তাঁর সঙ্গীত এবং সুর সমকালে বাংলার ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মনে গভীর রেখাপাত করে । তাঁর গানের সম্মোহনী শক্তি এতো ব্যাপক যে, আজও তাঁর গান শুনতে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মন উন্মাতাল হয়।

---

[৫৬] আবুল আহসান চৌধুরী, পৃ. ২৭।
[৫৭] মযহারুল ইসলাম, পৃ. ৩৬৭, গান ২৮৬।
[৫৮] মযহারুল ইসলাম, পৃ. ৩৬৮।

মরমি সাধক কানাইয়ের গানের বিষয় বিবিধ। যেমন, আসর বন্দনা, গুরুবন্দনা ও মুরশিদি, আল্লাহ ও রসুল প্রশস্তি, দেব-দেবী স্তুতি, নারী প্রসঙ্গ ও মাতৃবন্দনা, রাধাকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ, দেহ সম্পর্কিত প্রশ্নমূলক গান, ধুয়া-জারিগান ইত্যাদি। তাঁর গানে যেমন ইসলাম ধর্ম প্রসঙ্গ এসেছে, তেমন এসেছে হিন্দুধর্ম-শাস্ত্র-পুরাণ প্রসঙ্গ। তাই পাগলা কানাইয়ের গানের সুর ও বিষয়-বৈচিত্র্য নানা শ্রেণী-পেশা ও ধর্মের মানুষকে সমানভাবে আকৃষ্ট করে। সামাজিক চালচিত্র, সমকালীন ঘটনা ও ব্যক্তিগত প্রসঙ্গও কানাইয়ের গানের উপজীব্য। সমকালীন ঘটনা ও ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ বিবৃত গানগুলোতে স্বাভাবিকভাবেই কবির ব্যক্তিজীবনের নানা প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ বিধৃত হয়েছে। সেদিক থেকে পাগলা কানাই রচিত ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ উদ্ধৃত গানগুলো হতে তাঁর নাম-পরিচয় ও চেহারার বর্ণনা, অন্যান্য বৈশিষ্ট্য, শিক্ষা, জীবিকা, সুর-সাধনা, অসাম্প্রদায়িকতা, ইসলামি বিধানে আনুগত্য, ভ্রমণ-বিলাসিতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব গুণ, স্বতন্ত্র গায়কি ও প্রতিপক্ষ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত জানার অবকাশ রয়েছে। সেজন্য ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ বর্ণিত গানগুলোকে কবির আত্মপরিচয়ের প্রামাণিক দলিল বললে অত্যুক্তি হয় না। উল্লেখ্য, কবির অসংগৃহীত গান সংগ্রহ করা গেলে কবি-জীবনের আরো ব্যাপক পরিচয় জানা সম্ভব হবে।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, সপ্তদশ সংখ্যা ১৪১৬

জহির রায়হানের কথাসাহিত্য : রাজনৈতিক অনুষঙ্গ

তপন কুমার রায়*

Abstract : Zahir Raihan is mainly a litterateur of sixteen decade. The contribution of Zahir Raihan after the partition of Bengal is unforgettable. He was deeply involved with political incident of the country. As a result, the society and the political incidents influenced him to be a Literature. In this article the author tried to explore the political perception in the literature of Zahir Raihan.

প্রাক্‌কথন

বিভাগোত্তর বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে জহির রায়হানের (১৯৩৩-১৯৭২) বিশিষ্টতা অনস্বীকার্য বলা চলে। তাঁর সাহিত্য ও শিল্পচর্চায় মননশীলতা, মুক্তবুদ্ধি ও প্রগতিভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি পারিবারিক পতিবেশ থেকে এ মনন-চর্চা, মুক্তচিন্তা ও প্রগতিভাবনার শিক্ষা পেয়েছিলেন। পিতা মাদ্রাসা-শিক্ষক হলেও তাঁর গভীর সাহিত্যানুরাগ জহির রায়হানকে প্রভাবিত করে।[১] অগ্রজ শহীদুল্লা কায়সারের (১৯২৭-১৯৭১) সাহিত্য ও বামপন্থী রাজনীতি-চর্চা এবং চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে অংশগ্রহণকারী বিপ্লবীদের সংসর্গ জহির রায়হানের রাজনৈতিক মনন প্রভাবিত করেছিল।[২] ভাষা আন্দোলন যখন শুরু হয় তখন জহির রায়হান জগন্নাথ কলেজের ছাত্র। জহির রায়হান প্রত্যক্ষ ভাবে এই আন্দোলনে যোগ দেন এবং ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি কারারুদ্ধ হন।[৩] একুশে ফেব্রুয়ারিতে যাঁরা ১৪৪ ধারা ভাঙেন জহির রায়হান ছিলেন তাঁদের প্রথম দশজনের অন্যতম। ১৯৫৩/৫৪ সালের দিকে তিনি কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য হন। এ সময়ে তিনি মণি সিংহের দেয়া রাজনৈতিক নাম 'রায়হান' গ্রহণ করেন। তাঁর পারিবারিক নাম মোঃ জহির উল্লাহ, ডাক নাম জাফর। পরে তিনি জহির রায়হান নামে পরিচিত হন। পরবর্তীতে দীর্ঘদিন কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত না থাকলেও প্রতিটি রাজনৈতিক আন্দোলনেই তিনি যুক্ত ছিলেন। ফলে ষাটের দশকে চার পাঁচ বার তাকে কারাবরণ করতে হয়।[৪] জহির রায়হানের

---

* প্রভাষক. কলেজ অব ডেভলপমেন্ট অল্টারনেটিভ, ধানমণ্ডি, ঢাকা এবং এম.ফিল গবেষক, বাংলা বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

[১] সরোয়ার জাহান, *জহির রায়হান*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮), পৃ. ১।

[২] সরোয়ার জাহান, পৃ. ১।

[৩] কামরুদ্দীন আহম্মদ, *পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি*,(ঢাকা: স্টুডেন্টস্ পাবলিকেশন, ১৯৭৬), পৃ. ২০।

[৪] আফজালুল বাসার, *জহির রায়হান: তাঁর সাহিত্য ও অপ্রকাশিত ডায়েরী*, (ঢাকা: উত্তরাধিকার, ১৩৯৩), পৃ. ৬।

সাহিত্য তাঁর জীবনের সাথে গভীর ভাবে সম্পর্কিত। তাই অধিকাংশ রচনার মধ্যেই তাঁর জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ছাপ সুস্পষ্ট। সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা এবং নানা কর্মকাণ্ডের মধ্যদিয়ে জহির রায়হানের রাজনৈতিক চেতনা প্রকাশ পায়। তাই অবধারিত ভাবেই রাজনৈতিক অনুষঙ্গ তাঁর সাহিত্যের বাহন হয়েছে।

একটি জাতির সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনাবলির সাথে সম্পৃক্ত হয়েই কোনো সৃষ্টিশীল মানসের বিকাশ ও রূপান্তর ঘটে। তৎকালীন সমাজ ও রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ কথাসাহিত্যিক হিসেবে জহির রায়হায়কে অনন্য বৈশিষ্ট্যে উদ্ভাসিত করেছে। ভাষা আন্দোলন, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধ এসবের সাথে সম্পৃক্ততা তাঁর গভীর স্বদেশপ্রেম এবং রাজনীতিমনস্কতার পরিচয় বহন করে। তাঁর রাজনীতিসচেতন রচনাগুলোর মধ্যে ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক উপন্যাস *'আরেক ফাল্গুন'* (১৩৭৫), ছোটগল্প *'সূর্যগ্রহণ'*, *'মহামৃত্যু'*, *'অতিপরিচিত'*, *'কয়েকটি মৃত্যু'* ও *'একুশের গল্প'* উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও আছে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক গল্প *'সময়ের প্রয়োজনে'* এবং বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা সম্পর্কিত গল্প *'ম্যাসাকার'*।

আরেক ফাল্গুন ভাষা আন্দোলনের প্রতিভাস

এদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ভাষা আন্দোলন উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ভাষা আন্দোলনের মতো আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা যা আমাদের জাতির বিবেককে নাড়া দিয়েছিল তার ছায়া ও প্রভাব স্বাভাবিক ভাবেই সমসাময়িক শিল্প-সাহিত্যে পড়েছে। একুশের স্মৃতিকে অম্লান করে রাখার জন্য যে ক'জন সংগ্রামী কথাশিল্পী কলম ধরেছিলেন, জহির রায়হান তাদের মধ্যে অন্যতম। ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি ও দ্রোহ তাঁকে সাহিত্যিক হতে প্রোণদনা যুগিয়েছে। কথাসাহিত্যে তাঁর মূল বিষয় হলো ভাষা আন্দোলন, বাম-রাজনীতি ও নিপীড়িত মানুষ। পাকিস্তানি বৈষম্যমূলক শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালিরা প্রথম সোচ্চার হয় বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। পাকিস্তানের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও সেদিন পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল তার বিরুদ্ধে বাঙলার সচেতন ছাত্র-জনতা দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তোলে। লিখিত হয় ভাষা আন্দোলন নামক নতুন ইতিহাস। ১৯৪৭ সালের বিভাগোত্তর কালে পূর্ববাংলার কথাসাহিত্যকে স্বতন্ত্র ধারায় আনয়নের ক্ষেত্রে ভাষা-আন্দোলনের ভূমিকা অপরিসীম। বায়ান্ন সালের ভাষা আন্দোলন এদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে যতবড় ঘটনা, বিষয় গুরুত্বের দিক থেকে এবং সৃজনশীল সাহিত্যের মর্মনিহিত অনুপ্রেরণার ক্ষেত্রেও ঠিক ততবড় ঘটনা। ভাষা আন্দোলন এদেশের সাহিত্যের মোড়কে ঘুরিয়ে দিতে সক্ষম হয়। একথার সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায় একুশের বিষয় ও ইতিহাস নিয়ে নির্মিত সমৃদ্ধ সাহিত্য ভাণ্ডারের দিকে দৃষ্টি দিলে।

বিষয় ভাবনার সচেতন বৈভবে *'আরেক ফাল্গুন'* (১৯৬৯) জহির রায়হানের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। ১৯৫৫ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি শোক পালনের পটভূমিতে রচিত *'আরেক ফাল্গুন'* উপন্যাস। উপন্যাস হিসেবে এটি ভাষা আন্দোলনের ভাষিক চিত্র। উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সালে। এটি জহির রায়হানের তৃতীয় এবং ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক প্রথম উপন্যাস। ভাষা আন্দোলনের একজন সক্রিয় আন্দোলনকারী হিসেবে উপন্যাসটিতে লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চারিত হয়েছে। উপন্যাসটির প্লট ১৯৫৫ সালের ১৯, ২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারিতে ছাত্রদের শোকপালন। ১৯৫৫ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভাঙে এবং গণগ্রেফতার হয়। উপন্যাসটির প্রধান অবলম্বন ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস। ঐতিহাসিক বাতাবরণে কাহিনি অগ্রসর হয়েছে। চরিত্রগুলো সেই অর্থে ঐতিহাসিক প্রতিনিধিত্বকারী। *আরেক ফাল্গুন* উপন্যাসের সূচনা সিপাহী

বিদ্রোহের ইতিহাসের মধ্যদিয়ে। ১৮৫৭ সালের লালবাগের রক্তরঞ্জিত ইতিহাসের চকিত স্মরণের পর লেখক চলে এসেছেন ১৯৫৫ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি শোক পালনের চিত্র বর্ণনে:

> ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশ দিয়ে ঠিক সেই মেঘের মতো একটি ছেলেকে হেঁটে যেতে দেখা গেল নবাবপুরের দিকে। দক্ষিণ থেকে উত্তরে। পরনে তার একটা সদ্য-ধোয়ানো সাদা সার্ট। সাদা প্যান্ট। পা জোড়া খালি। জুতো নেই।[৫]

১৯৫৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিকে কেন্দ্র করে কতিপয় চরিত্রে সংগ্রামীকর্মপ্রয়াসই উপন্যাসটির কাহিনি কাঠামো। অমর একুশের স্মৃতিচারণ, শাসক গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র, মানব হৃদয়ের টানাপোড়েন কাহিনিকে এগিয়ে নিয়েছে। এখানে কোনো কেন্দ্রীয় চরিত্র বা প্লট নয় বরং পূর্ব বাংলার সংগ্রামী মানুষের শাশ্বত স্বরূপটি ভাস্বর হয়ে উঠেছে।

উপন্যাসটির ঘটনাস্থল ঢাকা শহর। বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারির স্মৃতিকে বুকে ধারণ করে মুনিম, আসাদ, সালমা, রানু, বেনু, নীলা, কবি রসুলসহ আরো অনেকের সংগ্রামী কর্মতৎপরতা এর মূল উপজীব্য। ভীরু নেতাদের স্বার্থপরতা আর কাপুরুষ সুলভ আচরণের প্রমাণ পাওয়া যায় অধ্যাপকের কথায়। 'তোমাদের ঐ নেতারা কি চায়। ... ওদের আশু লক্ষ্য হলো গদি দখল করা। আর পরবর্তী অভিপ্রায় হলো বাকি জীবন যাতে স্বচ্ছন্দে কাটে সে জন্য মোটা অংকের টাকা আত্মসাৎ করা'।[৬] এই বক্তব্যের মধ্যদিয়ে সুবিধাবাদী সরকারি চাকরিজীবীদেরও পরিচয় গোপন থাকেনি। শাসকচক্রের অঙ্গুলীহেলনে তারা পরিচালিত হয়েছে। মাতৃভাষা ও স্বদেশের প্রতি তাদের কোনো মমত্ববোধ লক্ষ্য করা যায় না। বরং নিজেদের স্বার্থকে বড় করে দেখে তারা শাসকচক্রের হুকুম নির্বিচারে পালন করে গেছে।

১৯৫৫ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে বায়ান্নর ভাষা শহীদদের স্মরণে শোক প্রকাশ করতে গেলে মুনিমরা শাসকগোষ্ঠীর কাছ থেকে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। মুনিমের মায়ের জবানিতে 'মিনসেদের হয়েছে কী। কাঁদতেও দেবে না নাকি'?[৭] বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারির শোককে শক্তিতে পরিণত করতে চায় বাংলার ছাত্র-জনতা। তার অবলম্বন ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন। ১৯৫৫ সালের ১৯, ২০, ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মহানগরীর ছাত্র-ছাত্রীরা এই শোক পালন করতে বর্জন করে পায়ের জুতো, পরিধান করে কালো ব্যাচ। ২১ তারিখের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে দলে দলে গ্রেফতার হয়, পুলিশের লাঠি চার্জে আহত হয় অনেকে।

বায়ান্নর একুশের স্মৃতিকে মুছে দিতে শাসকচক্র যখন ছাত্র জনতাকে জেলে পাঠিয়েছে তখন ছাত্ররা পুলিশকে লক্ষ করে হুশিয়ারি উচ্চারণ করে 'আসছে ফাল্গুনে আমরা দ্বিগুণ হবো।' এই আসছে ফাল্গুনই *আরেক ফাল্গুন*। ফাল্গুনের পথ ধরেই অর্জিত হয়েছে বাঙালির স্বাধীনতা। *আরেক ফাল্গুন* ভাষা আন্দোলনের শাশ্বত চিত্রকে ধারণ করে ঐতিহাসিক অভিজ্ঞান হয়ে আছে।

জহির রায়হানের গল্পে একুশের চেতনার প্রতিফলন:

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে *সূর্যগ্রহণ* গল্পটি রচিত। গল্পের নায়ক তসলীম। তসলীম ঢাকায় চাকরি করত। গ্রামে মা-বোন-স্ত্রী-কন্যা তার পাঠানো সামান্য টাকাই কোনো রকমে

---

[৫] জহির রায়হান, *আরেক ফাল্গুন*, (ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী,) পৃ. ০৯

[৬] জহির রায়হান, *আরেক ফাল্গুন*, পৃ. ৩২

[৭] জহির রায়হান, *গল্পসমগ্র*, (ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী) পৃ. ৩০

সংসার চালাত। চাকরির পাশাপাশি তসলীমের শখ ছিল কবিতা লেখা। রুমমেট আনোয়ার সাহেব ছিলেন তার কবিতার প্রথম শ্রোতা। পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করলে রাষ্ট্রভাষা বাঙলার দাবিতে ছাত্র-জনতা মিছিল করে।

ভাষার জন্য মিছিলে গিয়ে তসলীম নিহত হয়। তার লাশ পর্যন্ত ছিনিয়ে নিয়ে যায় শাসক চক্রের লেলিয়ে দেওয়া মিলিটারি। রুমমেট আনোয়ার সাহেব তসলীমের স্ত্রীর পত্র পায়। কিন্তু সে তসলীমের পরিবারকে তার মৃত্যুর বার্তা জানাতে পারে না। তসলীমই ছিল তার পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। জাতীয় জীবনের সূর্যগ্রহণ কাটাতে প্রাণ বিসর্জন দেয় তসলীম। যার ফলে তার পরিবারের উপর নেমে আসে তমসার মেঘ। আনোয়ার সাহেব নীরবে প্রতি মাসে তসলীমের অসহায় পরিবারকে টাকা পাঠিয়েছে। তসলীমের স্ত্রীর পত্র তাকে তসলীমের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। আনোয়ার সাহেব তসলীমের পরিবারকে টাকা পাঠায় ভাষা শহীদের প্রতি তার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জানাতে। আর এর পশ্চাতে রয়েছে মাতৃভাষার জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণের প্রতি এক দেশপ্রেমিকের অকৃত্রিম ভালবাসা। ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক এই মর্মস্পর্শী গল্প বায়ান্নর স্মৃতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এই গল্পের মধ্যে দিয়ে তৎকালীন সময়ের বাস্তব চিত্র মূর্ত হয়ে উঠেছে। শাসকচক্র ছাত্র-জনতাকে প্রতিহত করতে মিছিলে গুলি চালিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, আন্দোলন সংরোধ করতে শহীদের লাশ পর্যন্ত তারা ছিনিয়ে নিয়েছে। এই ঘৃণ্য-বর্বরোচিত আচরণ তাদের পরাজয়কে রুখতে পারেনি। জয় হয়েছে ভাষার জন্য জীবনদানকারী শহীদদের।

ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক অপর গল্প *মহামৃত্যু*। মফস্বলের ছেলে শহীদ মা-বাবা-ভাই-বোনকে ছেড়ে ঢাকায় পড়াশোনা করতো। ভাষার জন্য আন্দোলনরত ছাত্র-জনতার উপর পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালালে শহীদ নিহত হয়। গল্পটিতে ভাষা আন্দোলনের চিত্র উন্মোচিত হয়েছে। ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্বের পুরোভাগে ছিল মূলত ছাত্ররা। ভাষা আন্দোলন এদেশের ছাত্রসমাজকে কতোটা নাড়া দিয়েছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় এই গল্পে। শহীদ সেই ছাত্র সমাজের প্রতিনিধি, যার মৃত্যু ভাষার জন্য জীবনদানকারী শহীদদের কথা মনে করিয়ে দেয়। শহীদ নামটি এখানে দৈনন্দিন জীবনের বিভেদ ভুলে সবার একাত্ম হওয়ারও প্রতীক।

অতিপরিচিত গল্পের মধ্যদিয়ে লেখকের মাতৃভাষার প্রতি গভীর অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। ট্রলির সাথে পরিচয়ের সূত্রধরে ট্রলির বাবার সাথে আলাপ হয় আসলামের। ট্রলির বাবা আমদানী-রপ্তানির ব্যবসায়ী। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ছাত্ররা আন্দোলনে নামে। মিছিলের উপর পুলিশ গুলি বর্ষণ করে। এতে ট্রলির বাবার মন্তব্য শুনে আসলাম হতবাক হয়। উক্তিটি উদ্ধারযোগ্য:

> আসলে কি জানো আসলাম, এদেশের ছেলে-মেয়েগুলো সব গোল্লায় গেছে। উচ্ছন্নে গেছে সব। নইলে ইসলামী ভাষা ছেড়ে দিয়ে ঐ কুফুরি ভাষার জন্য এত মাতামাতি কেন? ইসলামী দেশে ইসলামী ভাষাই রাষ্ট্রভাষা হবে এতে কোনো সন্দেহ নাই।[৮]

আসলাম আরো অবাক হয় যখন জানতে পারে এই লোকটি এডুকেশন বিভাগের বড়কর্তা হতে যাচ্ছে। ট্রলির এক মামা মিনিস্টার আর অন্য মামা ছিলেন এ্যামবাসিডার। ট্রলির বাবা যদিও ব্যবসায়ী কিন্তু পাকিস্তানি শাসকচক্রের পক্ষাবলম্বনের জন্য তার ঐ পদপ্রাপ্তি। তিনি বাড়িতে বড় লাইব্রেরি গড়ে তুলেছেন সেটাও যে নেহায়েত লোক দেখানো তা তার *গীতাঞ্জলি* কাব্য সম্পর্কে মন্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। ট্রলির বাবা ছিল মূলত বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার বিরোধী। সে

---

[৮] জহির রায়হান, *গল্পসমগ্র*, পৃ. ৭০।

নিজের দুই মেয়েকে পর্যন্ত বিদেশে রেখে লেখাপড়া করায়। লেখক স্বল্প পরিসরে বাংলা ভাষা সম্পর্কে তৎকালীন শাসকচক্র ও এদেশীয় কতিপয় স্বার্থন্বেষী চক্রের মনোভাব গভীর নিবিষ্টতায় তুলে ধরেছেন। জাতীয় আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ট্রলির বাবার মতো উচ্চবিত্তদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই গল্পের মূল বিষয়। গল্পটিতে ভাষা আন্দোলন বিরোধী উচ্চবিত্তের পরিচয় উন্মোচিত হয়েছে।

জহির রায়হান অতি স্বল্প পরিসরে আলোচিত সময় ও সমাজকে উপস্থাপিত করেছেন *কয়েকটি সংলাপ* গল্পে। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন এবং ভাষা শহীদদের জীবনের বিনিময়ে বাংলা ভাষা অর্জিত হলেও সময়ের ব্যবধানে একুশে ফেব্রুয়ারি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। *কয়েকটি সংলাপ* গল্পে একুশে ফেব্রুয়ারিকে কেন্দ্র করে চাঁদা তুলে ম্যাগাজিন বের করা, ফাংশন করা, প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা, প্রণয়ের জন্য হোস্টেল ছাত্রীর একুশের রাতকে বেছে নেওয়া, শত্রুতাবশত ইংরেজি নেমপ্লেটের অজুহাতে গাড়ি ভাঙ্গা মতো অসংগতি ফুটে উঠেছে। কোম্পানির গুডউইল বাড়ানোর উদ্দেশ্যে একুশের সংকলন প্রকাশের জন্য বিজ্ঞাপন দিতে রাজি হলেও ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত পিয়নকে সামান্য সাহায্য দিতে নারাজ চেয়ারম্যান। জীবন ঘনিষ্ঠ ও সমাজসচেতন লেখক জহির রায়হান একুশে ফেব্রুয়ারিকে উপলক্ষ করে ঘটে যাওয়া বাস্ত ব ঘটনাকে *কয়েকটি সংলাপ* গল্পে তুলে ধরেছেন। গল্পটিতে একুশকে নিয়ে যেমন ভাবনার পরিচয় পাই, সেই সাথে নতুন উপলব্ধিতে তাকে বিশ্লেষণ করার ইঙ্গিত আছে। সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে একুশের অর্জনকে ম্লান করে দিয়ে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে প্রয়াসী কিছু সুবিধাবাদী মানুষ। জহির রায়হানের সচেতন দৃষ্টিতে তা উঠে এসেছে।

ভাষা আন্দোলনের একটি শিল্পসফল ছোটগল্প জহির রায়হানের *একুশের গল্প*। এখানে অতি নাটকীয়তার সাথে লেখকের বাস্তববোধের সমন্বয় ঘটেছে। *একুশের গল্প* ছোটগল্পে মেডিকেল কলেজের তিন ছাত্র তপু, রাহাত এবং গল্পকথক একই রুমে থাকত। এদের মধ্যে তপু ছিল বয়সে সবার ছোট এবং একমাত্র বিবাহিত। কলেজে ভর্তি হবার বছর খানেক পরে রেনুকে সে বিয়ে করে। তপু ছিল প্রাণবন্ত-উদ্দাম-হৃদয়বান এক যুবক। সে রেনুর বাধা উপেক্ষা করে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে ছাত্র-জনতার মিছিলে যোগ দেয়। মিছিলে মিলিটারি গুলি চালালে কপালের ঠিক মাঝখানে বুলেট বিদ্ধ হয়ে তপু নিহত হয়।

> ব্যাপার কি বুঝবার আগেই চেয়ে দেখি প্লাকার্ডসহ মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে তপু। কপালের ঠিক মাঝ খানটায় গোল একটা গর্ত। আর সেই গর্ত দিয়ে নির্ঝরের মত রক্ত ঝরছে তার।[৯]

মিলিটারিদের হাতে তপুর লাশ চলে যায়। তারপর চার বছর অতিবাহিত হয়, মেডিকেল কলেজের সেই হোস্টেল কক্ষে রাহাত ও গল্পকথকের নতুন রুমমেট একটি কঙ্কাল নিয়ে আসে। সেই কঙ্কালটিকেই তারা তপুর কঙ্কাল হিসেবে সনাক্ত করে। গল্পটিতে ইতিহাস এবং কল্পনার মেলবন্ধন ঘটেছে। যার মধ্যদিয়ে চমৎকার শিল্পসত্য উপস্থাপিত হয়েছে। যা আমাদের ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিকে বাঙময় করে তোলে। ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক যে স্বল্প সংখ্যক গল্প রচিত হয়েছে জহির রায়হানের গল্পগুলো তাদের অন্যতম। তাঁর ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক গল্পগুলো মহান

---

[৯] মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন, *বাংলাদেশের ছোটগল্প জীবন ও সমাজ*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৯৭), পৃ. ১৪৮।

ভাষা আন্দোলনের অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞান। জহির রায়হান সক্রিয়ভাবে ভাষা আন্দোলনে অংশ নিয়ে ছিলেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং রাজনীতিমনস্কতার পাশাপাশি ভাষার প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধ, আবেগ এ পর্যায়ের গল্পগুলোতে লক্ষণীয়।

সময়ের প্রয়োজনে : রাজনৈতিক মননের অভিজ্ঞান

জহির রায়হানের মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক গল্প *সময়ের প্রয়োজনে*। সংবাদ সংগ্রহের জন্য গল্পকথক মুক্তিযোদ্ধাদের একটি ঘাঁটিতে যায়। ক্যাম্প কমান্ডার ব্যস্ত থাকায় লাল মলাটে বাঁধানো একটি খাতা এগিয়ে দিয়ে তাকে বসতে বলে। খাতার মধ্যে একজন মুক্তিযোদ্ধার রোজনামচা গল্পকথকের চোখে পড়ে। যেখানে যুদ্ধকালীন সময়ে ঐ মুক্তিযোদ্ধার মনের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। প্রথম প্রথম কাউকে মরতে দেখলে সে ব্যথা পেত, দুর্বল হয়ে পড়তো। কিন্তু নির্বিচারে মানুষ মরতে দেখে তার সেই অনুভূতিগুলো ভোঁতা হয়ে গেছে। এখন সে সহজেই মরা মানুষ দেখে, মৃতদেহ কবরে নামায়। এসব তার মনকে এখন আর নাড়া দেয় না। গল্পটিতে একজন মুক্তিযোদ্ধার ডায়েরিতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর নিরীহ মানুষের উপর নির্মম হত্যাযজ্ঞের লোমহর্ষক কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। হানাদার বাহিনী প্রথমে শহরে আপতিক আক্রমণ করে পরে তা ক্রমান্বয়ে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। হানাদার বাহিনীর আক্রমণে প্রাণভয়ে মানুষ আপাত নিরাপদ আশ্রয়ে সমবেত হলেও তাদের নির্মম থাবা সেখানেও পৌঁছে যায়। প্রাণ হারায় শত শত মানুষ। অশীতিপর বৃদ্ধ থেকে শিশু কেউ বাদ যায় না। প্রাণ ভয়ে মানুষ কেবলি ছুটছে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। কাঁচকি মাছের মতো চারপাশে ছিটকে যাচ্ছে সবাই। হানাদার বাহিনী গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিচ্ছে। তারা অস্থির আতঙ্কে দিশেহারা মানুষকে পাখির মত গুলি করে মারছে। সমগ্র বাঙলা যেন এক মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে। এমনই এক ভয়ার্ত চিত্র যা মুক্তিযুদ্ধের নির্ভুল চিত্রকে বাঙময় করে তুলেছে। হানাদার বাহিনীর এই নির্যাতন বাঙলার অত্যাচারিত নিগৃহীত মানুষ মুখ বুজে সহ্য করেনি। ছাত্র-মজুর-কৃষক-কেরানি-জেলে-ব্যবসায়ী সবার তখন একই পরিচয় সৈনিক।

যুদ্ধাক্রান্ত জীবনযন্ত্রনাহত মানুষ পরস্পর অপরিচিত হলেও তখন তারা পরম মিত্র। শত্রুর গুলিতে তাদের সংখ্যা কখনো হ্রাস পাচ্ছে আবার নতুন যোদ্ধা এসে সামিল হচ্ছে । নানা বয়স-ধর্ম-মতের মানুষ যুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ। আপনের মতো অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ তারা।

সাতাশ জন মুক্তিযোদ্ধা কিন্তু রাইফেল তাদের মাত্র নয়টা। অস্ত্র গুলির অপ্রতুলতা তাদেরকে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানী বাহিনীর কাছে অসহায় করে তোলে । তবু মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করতে গ্রামের ছেলে-বুড়ো গেরস্ত বাড়ির বউ সবাই এগিয়ে আসে। তাদের হাতে ঝাঁটা-দা-কুড়োল-খুন্তি কিন্তু মনোবল অটুট। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধে নিহত হানাদারদের মৃতদেহের মুখে তারা ঝাঁটা মারছে, কেউ হাত-পা-মাথা-পাঁজর টুকরো টুকরো করছে। এই আচারণ হানাদার বাহিনীর প্রতি তাদের তীব্র ঘৃণারই প্রকাশ ঘটিয়েছে।

হানাদার বাহিনীর বর্বরতার দুঃসহ পরিচয় পাই এক বৃদ্ধের গগন বিদারী আহাজারীতে। বৃদ্ধের ছেলেকে হত্যা করে ছেলের বউ ও যুবতী মেয়েকে ওরা তুলে নিয়ে গেছে। ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। সর্বহারা মানুষ প্রাণ বাঁচাতে নৌকায় আশ্রয় নেয়। হানাদার বাহিনী প্লেন থেকে বোমাবর্ষণ করে সেখানেও। কয়েকজন জনপদবধূ জীবন বাঁচাতে নদীর পারে দাঁড়িয়ে একটি নৌকাকে অনুরোধ করে তাদের তুলে নিতে। কিন্তু নৌকার যাত্রীরা ঘৃণা করে তাদের নৌকায় তুলতে নারাজ। একজন মুক্তিযোদ্ধার দৃঢ় নির্দেশে তাদের নৌকায় স্থান হয়। এই মুক্তিযোদ্ধা

একজন বারনারীর চেহারার আদলে তার মায়ের মুখ খুঁজে পায়। তার মনে পড়ে যায় মা-বাবা-ভাই-বোনদের কথা, তার ভালবাসার মানুষ জয়া'র কথা। কত ছোট ছোট সুখস্মৃতি তাকে নিয়ে যায় ইছামতি-করতোয়া -ময়ূরাক্ষীর তীরে।

মুক্তিযোদ্ধার রোজনামচায় ফুটে উঠেছে তার অব্যক্ত হৃদয়ের অস্ফুট কথা। কেন তারা যুদ্ধো করছে ? দেশের জন্য। দেশ তো ভূগোলের ব্যাপার। হাজার বছরে যার হাজার বার সীমারেখা পাল্টায়। তাহলে কি প্রতিশোধ নিতে, না কি অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে কিংবা অস্তিত্ব রক্ষার জন্য। সবকিছু ছাপিয়ে তার উপলব্ধি এ লড়াই সময়ের প্রয়োজন মেটাবার জন্য।

ম্যাসাকার : মানবিক অস্তিত্বের সংকট

'ষাটের দশকে যখন আমাদের অধিকাংশ ঔপন্যাসিক কখনো ত্রসনের কাছে নতি স্বীকার করে, আবার কখনো বা জাগতিক মোহের বশে ভুলে গেছেন সমাজসত্য ও যুগসংক্ষোভ, তখন সমাজসতর্ক ও রাজনীতিসচেতন জহির রায়হান ঔপনিবেশিক মানসের বিরুদ্ধে লেখনী ধরেছেন, হয়ে উঠেছেন একজন দায়িত্ববান নির্ভীক শিল্পী'।[১০] বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা সম্পর্কিত গল্প *ম্যাসাকার*। এই গল্পে সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচারের প্রসঙ্গ এসেছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র বিশ্লেষিত হয়নি। একজন ডাক্তারের জবানিতে যুদ্ধের ভয়াবহত্ব বর্ণিত হয়েছে।

ষোল বছরের জর্জ বুকের পাঁজরে গুলি খেয়ে মৃত্যুর প্রহর গুনছে। নিজের ইচ্ছায় সে যুদ্ধে আসেনি। যুদ্ধে আসতে তাকে বাধ্য করা হয়েছে। জর্জের উক্তি:

> জানো ডাক্তার! এরা আমার জোর করে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে এসেছে। এরা আমায় জোর করে আমার মায়ের কাছ থেকে ছিনিয়ে এনেছে।[১১]

মৃত্যুর সময় জর্জের করুণ আর্তি 'আশীবাদ করো ডাক্তার। এরপর যেন এমন একটা দেশে জন্মাই, যেখানে ছোট ছেলেমেয়েদের ধরে ধরে এমন করে বলি দেয়া হয় না'।[১২] যুদ্ধ এডোয়ার্ডের দুটো চোখই কেড়ে নিয়েছে। এক সময়ের সুশ্রী এডোয়ার্ডের মুখটা এমন কদাকার হয়ে গিয়েছিল যে, দেখলে ভয় হয়। এডোয়ার্ড ভালোবাসত ছোটবেলার খেলার সাথী ম্যারিয়ানাকে। দুই পরিবারের সম্মতিতে তাদের বিয়ের দিনও স্থির হয়েছিল। কিন্তু বাদ সাধল যুদ্ধ। জর্জের মতো এডোয়ার্ডও নিজের ইচ্ছায় যুদ্ধে আসেনি। সরকার সৈন্যবৃত্তি গ্রহণ করাটাকে বাধ্যতামূলক করে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেয়। বিভৎস রূপ নিয়ে এডোয়ার্ড বেঁচে থাকতে চায়নি। তাই নিজেই মাথায় রিভলবার দিয়ে গুলি করে আত্মহত্যা করেছে। উগ্র সাম্রাজ্যলোলুপতায় যারা লাখো লাখো সহায়-সম্বলহীন মানুষকে হত্যা করে, শত শত নারীকে যারা বৈধব্যের বেশ পরায় তাদের সম্পর্কে যুদ্ধক্ষেত্রে বিমূঢ় ডাক্তারের প্রার্থনা: 'রক্ত পিপাসু সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে নিজের দেশকে মুক্ত করার জন্য যারা লড়াই করে তাদের তুমি শক্তি দাও প্রভু'।[১৩]

---

[১০] অরুণ সান্যাল সম্পাদিত *প্রসঙ্গ বাংলা উপন্যাস*, (কলকাতা: ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৯৯১), পৃ. ৮৮২

[১১] জহির রায়হান, *গল্পসমগ্র*, পৃ. ১০৭।

[১২] জহির রায়হান, *গল্পসমগ্র*, পৃ. ১০৯।

[১৩] জহির রায়হান, *গল্পসমগ্র*, পৃ. ১০৯।

যুদ্ধের বিভৎসতা থেকে নারী-শিশু-বৃদ্ধ কেউই রেহায় পায়নি। সাম্রাজ্যবাদের কালো থাবা তাদের কীটের মতো হত্যা করে পৈশাচিক মত্ততা প্রকাশ করেছে। একজন নারীরূপী প্রেতাত্মার জবানিতে প্রকাশিত হয়েছে যুদ্ধের ভয়ালতা। যে স্বপ্ন দেখেছিল স্বামী-সন্তানসহ একটি ছোট্ট সংসারের। কিন্তু যুদ্ধ তার সব কিছু কেড়ে নিয়েছে। বর্তমান পৃথিবীতে মারাত্মক ব্যাধি যুদ্ধ। যে ব্যাধি ঘন্টায় হাজার হাজার মানুষের জীবন নাশ করে চলেছে। সেই নারী ডাক্তারকে প্রশ্ন করে 'যুদ্ধ নামক যে ব্যাধি হাজার হাজার মানুষের জীবন নাশ করে চলেছে, তার প্রতিরোধের জন্য তোমরা কী করছ? তোমরা রোগের চিকিৎসা করো, একটা মানুষকে বাঁচাবার জন্য তোমাদের কত সাধ্যসাধনা, কত সংগ্রাম। কিন্তু লাখো মানুষের মৃত্যুকে তোমরা নির্লিপ্তের মতো উপেক্ষা করে যাচ্ছ কেন ?'[১৪] এই বিভৎসতা ডাক্তারকে স্মরণ করিয়ে দেয় দুর্ভিক্ষ জর্জরিত সোনার বাংলাকে। যেখানে চারিদিকে কেবল হাহাকার। অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, শুধু আছে দুর্ভিক্ষ আর মহামারী। অন্যদিকে নারী দেহ নিয়ে চলেছে ছিনিমিনি খেলা। এ প্রসঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্বন্তরের কিছু গল্পের সাদৃশ্য মেলে। বিবস্ত্র নারী দেহের অমানবিক সমাবেশ ডাক্তারকে হতবিহ্বল করে। সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক মেজর কনিন্‌সের মুখে চপেটাঘাত করে ডাক্তার সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিষ্পেষিত মানুষের প্রতিবাদকে মূর্ত করে তুলেছে।

উপসংহার

জহির রায়হান বামপন্থী রাজনীতিচেতনাসম্পন্ন সংগ্রামী কথাশিল্পী। সংগ্রাম-আন্দোলন আর শিল্প জহির রায়হানের জীবনের দুই সমান্তরাল দিক। এ কথার সত্যতা তাঁর সাহিত্যকে ছাড়িয়ে চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও সমানভাবে মিলবে। তাঁর 'জীবন থেকে নেয়া', 'Stop Genocide', 'Let there be light' প্রভৃতি ছবি এদেশের সামাজিক আন্দোলন থেকে উদ্ভূত এবং এদেশের সামাজিক মুক্তির উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হয়েছে। শুধু বিষয় গৌরবই নয় ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক গল্প-উপন্যাসের মধ্যদিয়ে আমরা রাজনীতি সচেতন একজন ব্যক্তি মানুষের উপস্থিত অনুভব করি। যিনি ভাষা-সমাজ-মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতাকে স্বীকার করে রাজনৈতিক অনুষঙ্গ দ্বারা সাহিত্য বিনির্মাণ করেছেন। ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে শিল্পিত কল্পনায় স্নাত হয়ে তাঁর গল্পগুলো শিল্পসত্যে উদ্ভাসিত হয়েছে। তাঁর মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক গল্প বা বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা সম্পর্কিত গল্পতেও একজন প্রত্যক্ষ শিল্পীর জবানির স্বাদ পাই। ভাষা আন্দোলন, নিপীড়িত-শোষিত-বঞ্চিত মানুষ তাঁর সাহিত্যের মূল বিষয়। আর তাঁর এই বোধকে ধারণ করতে শিখিয়েছে বাম-রাজনীতি। সর্বপোরি মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসা এবং দেশাত্মবোধ তাঁকে সংগ্রামী শিল্পী হিসেবে খ্যাতিমান করেছে।

---

[১৪] জহির রায়হান, *গল্পসমগ্র*, পৃ. ১১০।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, সপ্তদশ সংখ্যা ১৪১৬

কবি জয়দেব : প্রাচীন বাংলার গৌরব

মোঃ গোলাম সারওয়ার*

Abstract: Jayadeva was one of the greatest Sanskrit poets in ancient Bengal. He was one of the five gems of the court of Laksmanasen. His monumental work is the *Gitagovindam* which is based on the love affair of Radha and Krishna. It was a source of inspiration for vaishnavism, which interpreted it as an allegory of the human soul's love for the divine. The poem has greatly influenced *padavali*. Here is an attempt to throw light on different aspects of Jayadeva's life in general and his literary achievements in particular.

ভূমিকা

প্রাচীন বাংলার সাহিত্যে ধর্মীয় সুর ও ভক্তির আত্মনিবেদন লক্ষ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন বাংলায় ধর্ম এবং জীবন আলাদা ছিল না। জীবনাচরণের মধ্যেই ধর্মের স্থান সুনির্দিষ্ট থাকাতে এবং পারমার্থিক আকুতি তীব্র হওয়াতে জীবনের সত্য অনুভূতির ধারক সাহিত্য ধর্মীয় প্রেরণাকেও সাহিত্যে রূপদান করেছে।[১] বস্তুত দ্বাদশ শতক বাংলায় সংস্কৃত সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক সেন শাসকদের অধীনে এ সময়ে বাংলায় সংস্কৃত সাহিত্যের পুনরুত্থান ঘটে। একদিকে ধর্মশাস্ত্র ও অপরদিকে উচ্চাঙ্গের কাব্য এই যুগকে অমর করে রেখেছে। আর এই যুগের সার্থক রূপকার হলেন *গীতগোবিন্দ* রচয়িতা কবি জয়দেব। কবি জয়দেব সংস্কৃত সাহিত্যের একজন সার্থক মৌলিক কবি। এযুগের লৌকিক সাহিত্যের গীতিকবিতাকে সংস্কৃত শ্লোকে সাজিয়ে জয়দেব সংস্কৃত ভাষায় অভিনব গীতিকবিতার সৃষ্টি করেন। তাঁর গীতিকবিতার আদর্শে বাংলায় পদাবলী কীর্তন ও অনুরূপ গীতিকবিতার নতুন ধারা সৃষ্টি হয়। *গীতগোবিন্দ* রচয়িতা জয়দেব প্রাচীন বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। প্রতিষ্ঠা ও প্রভাবের দিক থেকে তিনি সর্বভারতীয় কবিদের মধ্যে অন্যতম। ষোড়শ শতকের সন্ত কবি নাভাজি দাস তাঁর *ভক্তমাল* গ্রন্থে জয়দেবের প্রশস্তি গেয়ে বলেছেন:

জয়দেব কবিনৃপ চক্কবৈ খণ্ডমণ্ডলেশ্বর আণি কবি ॥
প্রচুর ভয়ো তিহুঁলোক গীতগোবিন্দ উজাগর।[২]

---

* প্রভাষক, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

[১] প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত, *গীতগোবিন্দ ও জয়দেবগোষ্ঠী*, (কলকাতা: ইন্ডিয়ান পাবলিকেসনস্, ১৩৮১), পৃ. ১।

[২] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদি পর্ব* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৪), পৃ. ৬২৬।

অর্থ: কবি জয়দেব হলেন চক্রবর্তী রাজা আর অন্যকবিরা খণ্ডমণ্ডলেশ্বর অর্থাৎ ক্ষুদ্র ভূস্বামী মাত্র। তিন লোকেই অর্থাৎ সাহিত্যলোক, সঙ্গীতলোক ও শিল্পলোকে *গীতগোবিন্দ* উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

জয়দেবের পরিচয়

বাংলার কবি জয়দেব ছিলেন লক্ষ্মণসেনের সভাকবি। শ্রীধর দাস সংকলিত *সদুক্তিকর্ণামৃত* গ্রন্থের একটি প্রশস্তি শ্লোকে জয়দেব লক্ষ্মণসেনকে উদ্দেশ্য করে বলেন:

লক্ষ্মীকেলিভুজঙ্গজঙ্গমহরে সংকল্পকল্পদ্রুম
শ্রেয়ঃ সাধকসঙ্গসঙ্গরকলা গাঙ্গেয় রঙ্গপ্রিয়।
গৌড়েন্দ্র প্রতিরাজরাজক সভালংকারকর্ণার্পিত
প্রত্যর্থিক্ষিতিপাল পালকসত্যং দৃষ্টোহসিতুষ্টবয়ম্ ॥[৩]

অর্থ: হে লক্ষ্মীদেবীর কেলিসহচর, জঙ্গমহরি, যাচকের কল্পদ্রুম! হে শ্রেয় সাধকের সহায়ক, যুদ্ধবিদ্যায় গঙ্গানন্দন ভীষ্ম! হে বঙ্গপ্রিয়! হে গৌড়েন্দ্র! হে রাজা ও প্রতিরাজাদের সভার অলংকার, শত্রু নরপতিদের কারার্পিতকারি! হে সজ্জনপালক, আপনাকে এখন দেখছি এবং এতেই আমরা তুষ্ট।

জয়দেব খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষ ভাগের কবি ছিলেন।[৪] জয়দেব সম্বন্ধে কিংবদন্তী বহু থাকলেও ঐতিহাসিক তথ্য বিরল। *গীতগোবিন্দের* তৃতীয় সর্গে জয়দেব নিজেকে কেন্দুবিল্ব সম্ভব বলেছেন:

বর্ণিতং জয়দেবকেন হরেরিদং প্রবণেন।
কেন্দুবিল্ব-সমুদ্রসম্ভব-রোহিণী রমণেন ॥[৫]

অর্থ: কেন্দুবিল্ব গ্রামের পূর্ণচন্দ্র জয়দেব অতিবিনয় সহকারে শ্রীহরির এই বিলাপ-বাক্য বর্ণনা করলেন।

এই কেন্দুবিল্ব গ্রাম বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার অজয় নদীর তীরে জয়দেব কেন্দুলী। *গীতগোবিন্দ* গাথা মুখর কেন্দুলীতে জয়দেব ঐতিহ্যের প্রত্যক্ষ সাক্ষী আছে কুশেশ্বর শিব মন্দির। কথিত আছে এই শিবমন্দিরের অষ্টদল পদ্মাঙ্কিত পাষাণযন্ত্রে ত্রিপুরাসুন্দরী মন্ত্র জপ করে জয়দেব সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তাই পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন যে, জয়দেব রাঢ়ের কবি, বীরভূমের কবি।[৬] আজও জয়দেবের পূত স্মৃতিকে কেন্দ্র করে এখানে প্রতিবছর পৌষ সংক্রান্তিতে বিরাট মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলায় বহু ভক্ত বৈষ্ণব, বাউল, অবধূত প্রভৃতি নানা মতের সাধক সাধিকা উপস্থিত হন এবং জয়দেবকে স্মরণ করে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সাধন সঙ্গীত পরিবেশন করে থাকেন।[৭] জয়দেবের পিতার নাম ছিল ভোজদেব এবং

---

[৩] প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত, পৃ. ১০৮-১০৯।

[৪] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান* (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৩৬৯), পৃ. ৩৮।

[৫] বেণীমাধব শীল (সম্পা.), *শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্* (কলকাতা অক্ষয় লাইব্রেরী, ১৩৯৩), পৃ. ৩৯।

[৬] হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ* (কলকাতা গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স, ১৩৬২), *ভূমিকা*, পৃ. ১৬।

[৭] অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (প্রথম খণ্ড) (কলকাতা মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৮), পৃ. ৭১৩।

মাতা হলেন বামাদেবী। তাঁর একজন বন্ধুর নাম পরাশর। *গীতগোবিন্দের* দ্বাদশসর্গের শেষ শ্লোক থেকে আমরা জয়দেবের পিতৃ পরিচয় সম্পর্কে জানতে পারি।

শ্রীভোজদেবপ্রভবস্য বামাদেবীসুতশ্রীজয়দেবকস্য
পরাশরাদিপ্রিয়বন্ধুকণ্ঠে শ্রীগীতগোবিন্দকবিত্বমস্তু ॥[৮]

অর্থ: শ্রীভোজদেব এবং বামাদেবীর পুত্র কবি জয়দেব *শ্রীগতিগোবিন্দ* রচনা করে পরাশরাদি প্রিয়বন্ধুকণ্ঠে উপহার অর্পণ করলেন।

জয়দেবের পত্নীর নাম ছিল পদ্মাবতী। *গীতগোবিন্দের* প্রথম সর্গের ২নং শ্লোকে বলা হয়েছে 'পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্তী', একাদশ সর্গের ২১ নং শ্লোকে বলা হয়েছে 'বিহিত পদ্মাবতী সুখ সমাজে', দশম সর্গের ১০নং শ্লোকে বলা হয়েছে 'জয়তি পদ্মাবতী-রমণ-জয়দেব-কবি-ভারতী-ভণিতমতিশাতম্'। এই সব উদ্ধৃতি সহজেই জয়দেব পত্নী পদ্মাবতী সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করে।

কিংবদন্তী

চক্রদত্তের সংস্কৃত *ভক্তমাল*, নাভজীদাসের *ভক্তমাল* এবং বীরভূমের কবি বনমালী দাসের *জয়দেব-চরিত্র* এবং *শেকশুভোদয়া* গ্রন্থে জয়দেবের কথা আছে। তবে মূলত কিংবদন্তীকে আশ্রয় করেই এসব গ্রন্থে জয়দেবের জীবন কথা রচিত হয়েছে। *ভক্তমালের* মাধুরীমণ্ডিত এই জীবনকথাটি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

পুরীর জগন্নাথের মন্দিরে এলেন দক্ষিণদেশবাসী এক ব্রাহ্মণ দম্পতি। নিঃসন্তান তাঁরা, সন্তান কামনায় ধর্ণা দিলেন এই মন্দিরে। সংকল্প করলেন সন্তান হলে জগন্নাথের সেবাতেই নিযুক্ত করবেন তাকে। স্বপ্নে পেলেন এক জ্যোতির্ময় মূর্তির আশীর্বাদ। সানন্দচিত্তে গৃহে ফিরলেন তাঁরা। তাদের ঘর আলো করে এলো এক কন্যা। ব্রাহ্মণ কন্যার নাম দিলেন পদ্মাবতী। শৈশবেই সঙ্গীত ও নৃত্যে পদ্মাবতীর অদ্ভুত দক্ষতা দেখা গেল। কন্যার বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থাও করলেন ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ সংকল্পের কথা ভুলতে চেয়েও পারলেন না। জগন্নাথের কাছেই সমর্পণ করলেন কন্যাকে। ব্রাহ্মণ আবার স্বপ্নাদৃষ্ট হলেন যে তাঁর কন্যা সাধারণ নয়, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই তার জন্ম। জয়দেব গোস্বামী নামে কেন্দুবিল্ব গ্রামে এক ব্রাহ্মণ আছে, সেই তোমার কন্যার পতি, কন্যা সমর্পণ করবে তাঁকে।

এরপরে বহু অন্বেষণে অজয়ের ধারে এসে ব্রাহ্মণ পেলেন কেন্দুবিল্ব গ্রামে জয়দেবের সন্ধান। দেবাদেশে ব্রাহ্মণ তাঁর কাছেই কন্যা গ্রহণের আবেদন জানালেন। জয়দেব জানালেন যে, তিনি কন্যাদানের যোগ্য পাত্র নন, জয়দেব আরো বললেন যে, তিনি দীন ও অনিকেতন, অতএব তাঁর কাছে এ আবেদন বৃথা।

কিন্তু ব্রাহ্মণ তাঁর কন্যাকে বললেন, ইনিই তোমার স্বামী, তোমাকে এঁর কাছেই রেখে গেলাম। শেষ পর্যন্ত জয়দেব গ্রহণ করলেন পদ্মাবতীকে। তাঁরা সমপ্রাণ হলেন, কৃষ্ণনাম গান করতে করতে নৃত্যে বিভোর হলেন। একদিন জয়দেব ভাবলেন নিজের লেখা কৃষ্ণগান গাইব। তাই তিনি *গীতগোবিন্দ* রচনায় হাত দিলেন। একদিন লিখলেন:

স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং।

[৮] হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, পৃ. ১৫৯।

এর পরের পংক্তিটি তাঁর মনেই রয়ে গেল লিখতে পারলেন না, পরে ভেবে চিন্তে লিখবেন এই ভেবে জয়দেব নদীতে স্নান করতে গেলেন। পদ্মাবতী দেখলেন কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বামী স্নান সেরে ফিরেছেন। আহারের শেষে জয়দেব বললেন-পুঁথিটি আনো তো পদ্মাবতী, ঐ পদটা লেখা শেষ করি। জয়দেব লিখলেন:

স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারম্।

লেখা শেষ করে জয়দেব বিশ্রামের জন্য ঘরে গেলেন, পদ্মাবতী স্বামীর পাতে রোজকার মতো খেতে বসলেন। এমন সময় স্নান সেরে কৃষ্ণ নাম গাইতে গাইতে জয়দেব বাড়িতে প্রবেশ করলেন। পদ্মাবতী অবাক হলেন, স্বামীকে অভুক্ত রেখেই আজ সে আহারে বসেছে। পদ্মাবতী বিশ্রাম কক্ষে ছুটে গিয়ে দেখলেন কেউ নেই। বুঝলেন স্বয়ং কৃষ্ণ এসেছিলেন গৃহে। পুঁথি এনে জয়দেবকে দেখালেন, স্পষ্ট লেখা আছে:

দেহিপদপল্লবমুদারম্।

কৃষ্ণ স্পর্শধন্য *গীতগোবিন্দ* কাব্যটি শেষ করলেন জয়দেব। রাধানাথের মন্দিরে গাইতে লাগলেন সেই গান। জয়দেবের নাম ছড়িয়ে পড়ল সারাদেশে। গৌড়রাজ লক্ষ্মণসেনের রাজসভাতেও গিয়ে পৌছল সেই নাম। লক্ষ্মণসেন সাদরে তাঁর সভায় স্থান দিলেন এই গীত স্রষ্টাকে।[৯]

গীতগোবিন্দের গঠন ও বিষয়বস্তু

জয়দেব ছিলেন লক্ষ্মণসেনের রাজসভার (১১৭৯-১২০৫ খ্রিস্টাব্দ) পঞ্চরত্নের শ্রেষ্ঠরত্ন। তাইতো নবদ্বীপের রাজসভাদ্বারে ক্ষোদিত হয়েছে:

গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি পঞ্চেতে লক্ষ্মণস্য চ ॥[১০]

অর্থ: লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় পাঁচটি রত্ন উমাপতিধর, গোবর্দ্ধন, শরণ, ধোয়ী এবং জয়দেব।

বাঙালির সারস্বত সাধনার ইতিহাসে উমাপতিধর,[১১] গোবর্ধন আচার্য,[১২] শরণ[১৩] এবং কবিরাজ ধোয়ীর[১৪] সতীর্থ ছিলেন জয়দেব । তাঁর নিজের উক্তিতেই এর স্বীকৃতি মেলে:

---

[৯] নগেন্দ্রনাথ বসু, *বাংলা বিশ্বকোষ* ষষ্ঠ ভাগ, (দিল্লী: বি আর পাবলিশিং কর্পোরেশন, ১৯৮৮), পৃ. ৬৬৩-৬৬৫।

[১০] R.C Majumder (ed.), *History of Bengal* Vol. I, (Dhaka: Dhaka University, 2006) P. 363.

[১১] উমাপতিধর: লক্ষ্মণসেনের সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। ১২০৬ খ্রি: শ্রীধরদাস সঙ্কলিত *'সদুক্তিকর্ণামৃত'* গ্রন্থে উমাপতি ধরের ৯০টি শ্লোক গৃহীত হয়েছে। দেওপাড়া প্রশাস্তিতে উমাপতিধর বিজয়সেনকে পল্লবিত বাক্যে সম্বোধন করে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর তাম্রলিপিতেও উমাপতিধরের রচনা কৌশল লক্ষণীয়। মনে হয়, বিজয়সেন হতে আরম্ভ করে লক্ষ্মণসেন পর্যন্ত তিন পুরুষ ধরে উমাপতি ধর সেন রাজসভার সাথে যুক্ত ছিলেন। দেওপাড়া লিপিতে উমাপতি ধর সম্বন্ধে বলা হয়েছে, শব্দজ্ঞান ও শব্দার্থবোধ দ্বারা এই কবি পরিশুদ্ধবুদ্ধি ছিলেন। আর জয়দেব বলেছেন যে, উমাপতি ধরের লেখনীতে বাক্য যেন পল্লবিত হতো। (তথ্যসূত্র: নীহাররঞ্জন রায়, পৃ. ৬২৪-৬২৫; অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়, পৃ. ৭৯।)

[১২] গোবর্ধন আচার্য: *আর্যাসপ্তশতীর* কবি হিসেবে সর্বভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। *আর্যাসপ্তশতী* অর্থাৎ সাতশ শ্লোক বা আর্যার সমষ্টি এই কবিতাগুচ্ছের জন্যই বন্ধু জয়দেব তাঁর কাব্য সম্বন্ধে বলেছেন

বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিংগিরাং
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে।
শৃঙ্গারোত্তরসৎ প্রমেয়রচনৈরাচার্য্যগোবর্দ্ধন
স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কবিক্ষ্মাপতিঃ ॥[১৫]

অর্থ: কবি উমাপতিধর বাক্যকে পল্লবিত করেন। দুরূহ পদের দ্রুত রচনার কবি শরণ প্রশংসনীয়। শৃঙ্গাররসের সৎ এবং পরিমিত রচনায় আচার্য্য গোবর্দ্ধনের সমকক্ষ কেউ আছে বলে শুনতে পাওয়া যায় না। ধোয়ী কবিরাজের শ্রুতিধর বলে প্রসিদ্ধি আছে। কবি জয়দেব শুদ্ধ সন্দর্ভ রচনায় সমর্থ।

গীতগোবিন্দ জয়দেবের বিখ্যাত রচনা। এটি একটি সংস্কৃত গীতিকাব্য, রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা এর মুখ্য বিষয়। কাব্যের নায়ক-নায়িকা রাধা-কৃষ্ণ হলেও তাঁদের প্রত্যেকে জীবাত্মা পরমাত্মার সম্পর্ক এবং নরনারীর চিরন্তন প্রেমই এর মূল বক্তব্য। ২৮৬টি শ্লোকে এবং ২৪টি গীতের সমন্বয়ে ১২টি সর্গে *গীতগোবিন্দ* রচিত।[১৬] বর্ণিত বিষয়ের তত্ত্ব নির্দেশটি বারোটি ভিন্ন ভিন্ন নামে সর্গগুলির নামকরণ করা হয়েছে।

প্রথম সর্গ: সামোদ দামোদর

কন্দর্পক্লিষ্ট রাধা কৃষ্ণকে খুঁজছেন বৃন্দাবনের বনে বনে। কিন্তু সখী তাঁকে দেখিয়ে দিলেন তিনি অন্য নায়িকার সাথে বিলাসে মত্ত। কৃষ্ণ সোহাগের বহু স্মৃতির তরঙ্গ বয়ে গেল রাধার হৃদয় দিয়ে। কিন্তু সেই দামোদর আজ তাঁকে ছেড়ে অন্য নায়িকাকে নিয়ে আমোদে রত। তাই এই সর্গের বক্তব্য 'সামোদ দামোদর' নামে চিহ্নিত।

---

[১২] গোবর্ধন আচার্য: *আর্যাসপ্তশতীর* কবি হিসেবে সর্বভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। *আর্যাসপ্তশতী* অর্থাৎ সাতশ শ্লোক বা আর্যার সমষ্টি এই কবিতাগুচ্ছের জন্যই বন্ধু জয়দেব তাঁর কাব্য সম্বন্ধে বলেছেন যে, শৃঙ্গার রসের সৎ ও পরিমিত রচনায় আচার্য গোবর্ধনের কেউ সমকক্ষ আছেন বলে শুনতে পাওয়া যায় না। এই কাব্য হতেই জানা যায় যে, গোবর্ধনের পিতার নাম ছিল নীলাম্বর এবং দুই ভ্রাতার নাম উদয়ণ ও বলভদ্র। গোবর্ধন সুদক্ষ কবি এবং সুপণ্ডিত ছিলেন তা তাঁর আচার্য উপাধিতে প্রমাণ পাওয়া যায়। তথ্যসূত্রে: রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস* প্রাচীনযুগ, (কলকাতা জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮১), পৃ. ১৯৩-১৯৪; অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়, পৃ. ৮৫-৮৬।

[১৩] শরণ: রচিত ২০টি শ্লোক *সদুক্তিকর্ণামৃত* গ্রন্থে পাওয়া যায়। শরণ সম্পর্কে প্রশংসা করে জয়দেব বলেছেন যে, শরণ অতি দ্রুত বেগে দুরূহ শব্দের দ্বারা শ্লোক লিখতে পারতেন। *সদুক্তিকর্ণামৃতে* উল্লেখিত শ্লোক হতে তাঁকে লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক বলে জানা যায়। তথ্যসূত্রে: নীহাররঞ্জন রায়, পৃ. ৬২৪।

[১৪] ধোয়ী: *পবণদূত* কাব্যের রচয়িতা হিসেবে ধোয়ী প্রসিদ্ধলাভ করেছেন। মেঘদূতের আদর্শে যত দূতকাব্য পরবর্তীকালে রচিত হয়েছে তার মধ্যে পবনদূত প্রাচীনতম। মন্দাক্রান্তা ছন্দে ১০৪টি শ্লোকে ধোয়ী পবনদূত কাব্যে তাঁর পৃষ্ঠপোষক লক্ষ্মণসেনের স্তুতিবাদ করেছেন। *সদুক্তিকর্ণামৃতে* ধোয়ী রচিত ২০টি শ্লোক আছে। জয়দেব ধোয়ীকে কবিক্ষ্মাপতি অর্থাৎ কবিগণের রাজা এবং শ্রুতিধর বলে বর্ণনা করেছেন। তথ্যসূত্র: নীহাররঞ্জন রায়, পৃ. ৬২৪।

[১৫] হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৬।

[১৬] প্রভাসচন্দ্র দে, *জয়দেব* (প্রথম খণ্ড), (কলকাতা কোহিনুর প্রিন্টিং ওয়ার্কস ১৩৩৪), পৃ. ৪০। সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাপিডিয়া*, ৩য় খণ্ড, (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৪), পৃ. ৪৭১-৭২।

দ্বিতীয় সর্গ: অক্লেশ কেশব

সখীর কথায় ম্রিয়মাণ রাধা অন্যকুঞ্জে গেলেন। অন্য নারীর সাথে মিলিত কৃষ্ণকে তিনি যেন প্রত্যক্ষ করছেন। তবু কৃষ্ণের সাথে তাঁর মিলনস্মৃতি ভুলতে পারলেন না। কৃষ্ণ গোপীদের বিলাসকলা দেখে নিশ্চয় রাধাকেই বেশি স্মরণ করছেন। কবি বলছেন এই নবকেশব সকলের ক্লেশ দূর করুন। শেষের পংক্তিতে ফুটে উঠেছে 'অক্লেশ কেশব' নামের তাৎপর্য।

তৃতীয় সর্গ: মুগ্ধমধুসূদন

যাঁর জন্য সংসারবাসনার শৃঙ্খল আনন্দে পরেছেন, কৃষ্ণ সেই রাধাকে হৃদয়ে ধ্যান করতে করতে তিনি হঠাৎ ব্রজ সুন্দরীর সঙ্গ ত্যাগ করে চললেন। কোথাও রাধাকে না পেয়ে কৃষ্ণ বিষণ্ন মনে ভাবছেন, আমার বিরহে না জানি তিনি কী করছেন। রাধার অভাবে আমারই বা কী কাজ ধনে জনে গৃহে। মুগ্ধ হয়ে হরি একথা ভাবছেন। তাই সর্গটির নাম 'মুগ্ধ মধুসূদন'।

চতুর্থ সর্গ: স্নিগ্ধ মধুসূদন

রাধার এক সখীর কাছে কৃষ্ণ শুনলেন, রাধা তাঁর বিরহে সূর্যদগ্ধ কুসুমের মত শুষ্ক। এ সংবাদ শুনে ভয়ে ভীত কৃষ্ণ স্নিগ্ধ হলেন, তাঁর দুশ্চিন্তা দূর হলো। তাই এই সর্গের নাম হলো 'স্নিগ্ধ মধুসূদন'।

পঞ্চম সর্গ: সাকাঙ্ক্ষপুণ্ডরীকাক্ষ

অন্যনারী সংসর্গ করেছেন বলে নিজেকে অপরাধী মনে করেন কৃষ্ণ। তাই সখীর মুখে রাধার অবস্থার কথা শুনেও রাধার কাছে ছুটে যেতে পারলেন না তিনি। রাধাকেই সখী নিয়ে আসুক তাঁর কাছে এই ইচ্ছা প্রকাশ করলেন কৃষ্ণ। সখী রাধাকে কৃষ্ণ অভিসারে যেতে আহ্বান জানালো, কারণ তিনি যে, 'সাকাঙ্ক্ষ'। সর্গটি তাই সার্থকনামা।

ষষ্ঠ সর্গ: ধৃষ্ট বৈকুণ্ঠ

সখী এসে বলে শ্রীরাধা কৃষ্ণ বিরহে বিহ্বল। তাই কৃষ্ণের উচিত লজ্জা ত্যাগ করে নিজেই তাঁর কাছে যাওয়া। বিপরীত অভিসারে কৃষ্ণ ধৃষ্ট অর্থাৎ নির্লজ্জ হোন সখীর এই আকুতি এই সর্গে প্রকাশিত, নামের ইঙ্গিত ও সেই দিকে।

সপ্তম সর্গ: নাগর নারায়ণ

রাধা অধীর প্রতীক্ষায় থাকেন। পাতায় সামান্য শব্দ হলেও উন্মুখ হয়ে ওঠেন, বুঝি তিনি এই এলেন। কিন্তু কৃষ্ণ এলো না। সখীর কাছে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন রাধা। তাঁর চোখে ভাসে অন্য নারীর সঙ্গে বিলাসে মত্ত বহুনারীপ্রিয় নারায়ণের ছবি। তাই এই সর্গের এই নাম 'নাগর' অর্থাৎ বহুবল্লভ নারায়ণ।

অষ্টম সর্গ: বিলক্ষ লক্ষ্মীপতি

কোনোমতে দুঃসহ বেদনায় রাত কাটালেন রাধা। ভোর হলে দেখলেন যে, কৃষ্ণ কুঞ্জদারে, মুখে অনুনয়বাণী, রাধার চোখে পড়ে কৃষ্ণদেহে অন্যনারীর সংসর্গের চিহ্ন। রাধা তাঁকে ভর্ৎসনা করতে থাকেন। বিলক্ষ অর্থাৎ বিস্মিত হয়ে চেয়ে থাকেন কৃষ্ণ। তাই সর্গটির নাম 'বিলক্ষ লক্ষ্মীপতি'।

নবম সর্গ: মুগ্ধ মুকুন্দ

রাধা অভিমানে ফিরিয়ে দিলেন কৃষ্ণকে। কিন্তু যাঁকে ফিরিয়ে দিলেন তাঁর জন্যই হলেন আকুল। সখী কৃষ্ণের কাছে গিয়ে রাধার অনুতাপের কথা বলে। কৃষ্ণ মুগ্ধ হন রাধার প্রকৃতি দেখে, এই মান, আবার এই অনুতাপ। সর্গটির নাম তাই 'মুগ্ধ মুকুন্দ'।

দশম সর্গ: মুগ্ধ মাধব

রাধার মান কমে আসতে থাকে। কুঞ্জবনে নেমে আসে অন্ধকার। কৃষ্ণ এলেন, বাতাস সুগন্ধ হলো। রাধা চাইলেন সখীদের দিকে সখীরা সরে গেল সেখান থেকে। মুগ্ধ কৃষ্ণ নতজানু হয়ে বললেন দেহি পদ-পল্লবমুদারম্। সর্গটি কৃষ্ণের এই বিমুগ্ধ ভাবটিকেই রূপ দিয়েছে।

একাদশ সর্গ: সানন্দ গোবিন্দ

মিনতি জানিয়ে কৃষ্ণ প্রসন্ন করলেন রাধাকে। রাধা ভুলে গেলেন সব বেদনা। কৃষ্ণ হলেন আনন্দিত। সর্গটি তাই সার্থকনামা।

দ্বাদশ সর্গ: সুপ্রীত পীতাম্বর

সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এবারে মিলন। কৃষ্ণ রাধার প্রীতি সম্পাদনে সফল, তাই তিনি 'সুপ্রীত'। জয়দেব তাঁর গীতকে বলেছেন প্রবন্ধ। প্রথম সর্গের ২নং শ্লোকে বলা হয়েছে:

শ্রী বাসুদেবরতিকেলিকথাসমেত
মেতং করোতি জয়দেবকবিঃ প্রবন্ধম্ ॥[১৭]

অর্থ: কবি জয়দেব শ্রীবাসুদেবরতিকেলিকথা সংবলিত এই প্রবন্ধ রচনা করলেন।

প্রবন্ধগান 'নিবন্ধ' অর্থাৎ ধাতুবন্ধগানের অন্তর্ভুক্ত। ধাতু হচ্ছে গানের অবয়ব বিভাগ আর তা উদগ্রাহক, মেলাপক, ধ্রুব ও আভোগের সমন্বয়ে গঠিত। যে অবয়বে গান আরম্ভ করা হয় তাকে উদ্‌গ্রাহক বলে। মেলাপক মানে যা মিলিয়ে দেয় বা যোগ সাধন করে। প্রথম ধাতু উদ্‌গ্রাহক এবং তৃতীয় ধাতু ধ্রুবের মিলনসাধক অবয়বের নাম মেলাপক। 'ধ্রুব' ধাতুটি গানের সবগুলো কলি বা তুকে নিত্য বর্তমান। প্রবন্ধের অন্তিম অবয়বের নাম আভোগ, এই অংশেই সাধারণত গীত রচয়িতার নাম বা ভণিতা থাকে। ধ্রুব এবং আভোগের মধ্যে যদি অন্য ধাতু থাকে তবে তার নাম অন্তর বা অন্তরা। গীতগোবিন্দের গান পঞ্চধাতুক। এটি ছায়ালগ বা সালগ সুড় শ্রেণীর প্রবন্ধ।[১৮] জয়দেব তাঁর চব্বিশটি প্রবন্ধ গানে মালব, গুর্জরী, বসন্ত, রামকিরি, কর্ণাটি, দেশবরাড়ি, গোণ্ডকিরি, ভৈরবী ও বিভাস রাগ প্রয়োগ করেছেন। বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদও সুর ও তালে গাওয়া হতো। চর্যাপদের ৫০টি গানে প্রযুক্ত ১০টি রাগের মধ্যে জয়দেব ব্যবহৃত গুর্জরী, রামকিরি, বরাড়ী ও ভৈরবী রাগের নাম পাওয়া যাচ্ছে।

---

[১৭] বেণীমাধব শীল (সম্পা.), পৃ. ৬।

[১৮] প্রসূন বসু (সম্পা.), *সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, (কলকাতা নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮২), পৃ. ১৫২।

জয়দেব যেসব তালের উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে আছে: রূপক, নিঃসারুক, যতি, একতালী এবং অষ্টতালী। এসব তাল কীর্তনগানে এখনও শাস্ত্রোক্ত রীতিতেই ব্যবহৃত হয়। অষ্টতাল হলো আটটি তালের সমাহার, যথা: আড়, দোজ, জ্যোতি, চন্দ্রশেখর, গঞ্জন, পঞ্চ, রূপক ও সম।

জয়দেবের সময়ে *গীতগোবিন্দে* উল্লিখিত রাগগুলি কী সুরে গাওয়া হতো বর্তমানে তা জানবার কোনো উপায় নেই। কালক্রমে রাগরূপের পরিবর্তন ঘটেছে এবং সারাভারতে প্রচলিত *গীতগোবিন্দ* একেক অঞ্চলে প্রচলিত জনপ্রিয় রাগে অথবা লোকায়ত সুরে গীত হতে থাকবে এটাই স্বাভাবিক।[১৯]

গীতগোবিন্দ জয়দেব ৭৭টি শ্লোক বিভিন্ন বৃত্তছন্দে রচনা করেছেন। এছাড়া একটি শ্লোক জাতিছন্দে এবং ২টি শ্লোক ও ২৪টি গীত অপভ্রংশ ছন্দে রচনা করেছেন। যে সমস্ত সংস্কৃত বৃত্তছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে তার মধ্যে শার্দূল বিক্রীড়িত ছন্দই বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। জয়দেবের ছন্দনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় মাত্রা ছন্দে লেখা চব্বিশটি গানে। *গীতগোবিন্দের* গানগুলো সংস্কৃত ছন্দকে বিদায় দিয়ে অপভ্রংশের ছন্দকে স্বাগত জানিয়েছে।[২০]

গীতগোবিন্দে রাধা

বসন্তরাস পরিত্যাগ করে রাধার বিরহ, কৃষ্ণ সন্ধান, মান-অভিমান ও মিলন এসমস্তই হলো *গীতগোবিন্দের* বিষয়বস্তু। সংস্কৃত সাহিত্যে একাদশ শতক পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ পাওয়া গেলেও একান্তভাবে রাধাকৃষ্ণকে নিয়ে লেখা পূর্ণাঙ্গ কাব্য দ্বাদশ শতকে রচিত জয়দেবের *গীতগোবিন্দ*। এখানে রাধাকে আমরা পাই পূর্ণাঙ্গ রূপে। রাধাকে কেন্দ্র করেই সকল প্রেমলীলার স্ফূর্তি। সমগ্র কাব্যের নায়ক হলেন কৃষ্ণ, নায়িকা রাধা আর সখীগণ লীলা সহচরী। বৈষ্ণব ধর্মে ও সাহিত্যে রাধা এখানে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত।[২১]

গীতগোবিন্দের প্রভাব

কৃষ্ণভক্তিমূলক সাহিত্যের ধারায় *গীতগোবিন্দ* সত্যই অভিনব। এর কাহিনীটি *ভাগবতের* সমগ্র কৃষ্ণলীলা বর্ণনার একটি টুকরা অংশবিশেষ। *গীতগোবিন্দের* অভিনবত্ব তাঁর সমগ্র কাহিনী বুননে। রাধাকৃষ্ণ প্রেমের প্রকীর্ণ প্রথাসিদ্ধ বর্ণনার চারুত্ব এ কাব্যে সংহতি ও তীক্ষ্ণ ঔজ্জ্বল্য লাভ করেছে। মেঘমেদুর অম্বর, তমালবনের শ্যামায়মান অন্ধকার, আসন্ন রাত্রিকাল, বৃন্দাবনারণ্যের ব্যাকুল বসন্ত, কলিন্দনন্দিনী যমুনার নিভৃত তটান্তকুঞ্জ, অভিসারোপযোগী তিমিরময় বনপথ, অধীর ও মুখর মঞ্জীররব, কিশলয়শয়নের ব্যাকুল প্রতীক্ষা এই সমস্তই কৃষ্ণরাধিকার নায়ক-নায়িকোচিত সমস্ত অনুভাবকে উপযুক্ত পোষকতা দিয়েছে। ফলশ্রুতিতে সংস্কৃত ভাষার কান্তকোমল মধুর পদাবলীর মধ্য দিয়ে বৈষ্ণব অনুষঙ্গবাহী ভক্তির সুরভিতে সুরভিত হয়ে উঠেছে। এখানে জয়দেব

---

[১৯] হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৮৩-৯১।

[২০] প্রসূন বসু, পৃ. ১৫৩।

[২১] শশীভূষণ দাশগুপ্ত, *শ্রী রাধার ক্রমবিকাশ দর্শনে ও সাহিত্যে*, (কলকাতা এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ ১৩৭০), পৃ. ১৩৮-১৪৯।

সার্থককাম হয়েছেন বলেই পরবর্তী কবিগণ নির্দ্বিধায় তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন।[২২]

সংস্কৃত গীতিকাব্যসমূহের মধ্যে *গীতগোবিন্দ* সুউচ্চ আসন অধিকার করে আছে। অধ্যাপক ম্যাকডোনেলের মতে এই কাব্যটি বিশুদ্ধ গীতিকবিতা ও বিশুদ্ধ নাটকের মধ্যে এক উত্তরণ কাল সূচিত করে। স্যার উইলিয়াম জোন্স *গীতগোবিন্দকে* ধর্মোপদেশ মূলক নাটক নামে অভিহিত করেছেন। আবার অধ্যাপক ল্যাসেন একে গীতিকাব্যধর্মী নাটক বলে মনে করেন। শ্রোয়েডার একে পরিশীলিত যাত্রা হিসেবে দেখেন। অধ্যাপক পিশেল ও লেভি একে সংগীত ও নাটকের মাধামাঝি পর্যায়ে ফেলেছেন। কোনো কোনো ভারতীয় পণ্ডিত মনে করেন কাব্যগ্রন্থটি সভামহাকাব্য।[২৩]

গীতগোবিন্দ সংস্কৃতে লেখা হলেও জয়দেব এই গ্রন্থে সংস্কৃতকে সশ্রদ্ধচিত্তে বিদায় দিয়ে কাব্য মঞ্চে স্বাগত জানালেন আধুনিক আর্যভাষার কবিদের। *গীতগোবিন্দের* ভাষা শব্দ ও ব্যাকরণের দিক দিয়ে সংস্কৃত কিন্তু ছন্দ, রীতি ও ভঙ্গিতে লোকায়ত স্থানীয় ভাষার অনুসারী। *গীতগোবিন্দের* প্রভাবেই পরবর্তীকালে বৈষ্ণবপদাবলীর স্রোতধারা বয়ে চলল। শুধু বৈষ্ণব পদাবলীই নয় মঙ্গল কাব্য ধারার উৎসও *গীতগোবিন্দ*।[২৪] জয়দেব নিজেই তাঁর গানকে বলেছেন 'মঙ্গলগীতি'। *গীতগোবিন্দের* প্রথম সর্গের ২৫ নং শ্লোকে বলা হয়েছে:

শ্রীজয়দেবকবেরিদং। করুতেমুদং। মঙ্গলমুজ্জলগীতি ॥[২৫]

অর্থ: শ্রীজয়দেব কবির এই উজ্জ্বলরসের মঙ্গলগান সকলের আনন্দ বর্ধন করুক।

তাছাড়া, বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের* গঠন বিভাগ, নাট্যধর্মিতা ইত্যাদি নানা বিষয়ে *গীতগোবিন্দের* প্রভাব লক্ষ করা যায়। জয়দেব পরবর্তীকালে *গীতগোবিন্দ* গৌড়ীয় বৈষ্ণব অনুসারীদের নিকট ধর্মগ্রন্থের মর্যাদার অধিষ্ঠিত হয়। এর ফলে সমগ্র উত্তর ভারতে *গীতগোবিন্দের* প্রতিষ্ঠা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অব্যাহত ছিল। যে সমস্ত সম্প্রদায়ের প্রধান আশ্রয় ভক্তি ও প্রেম সে সমস্ত মতবাদের নিকট *গীতগোবিন্দ* বিশেষভাবে সম্মানিত হয়। এর ফলে জয়দেব বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায়ের আদিগুরু হিসেবে বিবেচিত হন। বল্লভাচারী সম্প্রদায়ও *গীতগোবিন্দকে* অন্যতম ধর্মগ্রন্থ বলে স্বীকার করেন। বল্লভাচার্যের পুত্র বিঠ্ঠলেশ্বর *গীতগোবিন্দের* অনুকরণেই তাঁর *শৃঙ্গাররসমণ্ডন* গ্রন্থ রচনা করেন। *গীতগোবিন্দ* অনুকরণীয় কাব্য বিবেচিত হওয়ায় বৃহস্পতি মিশ্র, ধৃতিদাস, উদায়নাচার্য, রাণাকুম্ভ, নারায়ণ ভট্ট, পীতাম্বর, শঙ্কর মিশ্র প্রমুখ বিভিন্ন অঞ্চলের পণ্ডিতরা *গীতগোবিন্দের* প্রায় চল্লিশটি টীকা রচনা করেন। *গীতগোবিন্দের* অনুকরণে রচিত হয় *গীতদিগম্বর, গীতগৌরী, গীতরাঘব, অভিনব গীতগোবিন্দ, সঙ্গীত মাধব, গোবিন্দবলভ*-নাটক ইত্যাদি গ্রন্থ। এসব গ্রন্থের রচয়িতা যথাক্রমে বংশমুনি, তিরুমলরাজ, হরিশঙ্কর, গজপতিরাজ, পুরুষোত্তমদেব, গোবিন্দদাস এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর।[২৬]

---

[২২] প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত, পৃ. ২০৯-২১০।

[২৩] S.N. Das Gupta & S.K. De, *History of Sanskrit Literature,* (Kolkata: Kolkata University, 1947) p. 363.

[২৪] নীহাররঞ্জন রায়, পৃ. ৬২৮-৬২৯।

[২৫] হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, পৃ. ১৭।

[২৬] নীহাররঞ্জন রায়, পৃ. ৬২৭-৬২৮; নগেন্দ্রনাথ বসু (সম্পা.), পৃ. ৬৬৫।

সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও *গীতগোবিন্দের* প্রভাব লক্ষ করা যায়। যদিও জয়দেবের রাগসঙ্গীতের ধারা বা রূপান্তরকে বর্তমানে জানা যায় না। তবু উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বহু মন্দিরে *গীতগোবিন্দের* গান গাওয়া হয় এবং এই গানের চর্চার মধ্য দিয়ে বহু বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়ে চলেছে। *গীতগোবিন্দের* প্রভাব বিশেষভাবে পড়েছে কীর্তন গানে। চৈতন্যদেবের সময় থেকেই কীর্তনের সূচনা। তিনি গীতগোবিন্দের স্বরূপ দামোদর অংশের গানগুলি গভীর তৃপ্তি নিয়ে শুনতেন।[২৭] আধুনিক কালের নৃত্য ও নৃত্যনাট্যে গীতগোবিন্দের গান প্রয়োগ করা হচ্ছে।

ভারতে মধ্যযুগের ভাস্কর্য চিত্রশিল্পেও *গীতগোবিন্দের* প্রভাব লক্ষণীয়। ভুবনেশ্বর, পুরী, কোণারক এবং খাজুরাহোর ভাস্কর্যে *গীতগোবিন্দে* বর্ণিত অনেক ভাবমূর্তিকে রূপায়িত করা হয়েছে। গুজরাট, রাজস্থান, বৃন্দাবন, বারাণসী, কাংড়া, উড়িষ্যা, বাংলা, আসাম, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণটিক, কেরালা, তামিলনাড়ু ইত্যাদি বিস্তীর্ণ এলাকার চিত্রকলা ও ভাস্কর্যে *গীতগোবিন্দের* প্রভাব লক্ষণীয়।[২৮]

শ্রীধরদাসের কোষকাব্য *সদুক্তিকর্ণামৃতে গীতগোবিন্দের* ৫টি শ্লোক সহ আরও ২৬টি শ্লোক পাওয়া যায়। শিখদের ধর্মগ্রন্থ *গ্রন্থসাহেবেও* জয়দেব রচিত দুটি শ্লোক স্থান পেয়েছে।[২৯]

উপসংহার

জীবনের শেষাবস্থায় জয়দেব জন্মভূমি কেন্দুলী গ্রামে এসে বাস করেন এবং এই গ্রামেই ইহলোক পরিত্যাগ করেন।[৩০] সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপী যে সমস্ত কবিদের খ্যাতি বিস্তৃত, সেই শ্রেণীর প্রধান সংস্কৃত কবিদের মধ্যে জয়দেবকে অন্তিম কবি বলা যায়। মহাকবি কালিদাসের ভারতব্যাপী প্রভাবের সঙ্গেই জয়দেবের তুলনা করা যেতে পারে। মানুষের ধর্মজীবনে অনুপ্রেরণা দেওয়ার সৌভাগ্য ভারতের অল্প সংখ্যক কবির ভাগ্যে ঘটে ছিল। ব্যাসদেব, বাল্মীকি এবং কালিদাস ছাড়া আর কোনো কবি এভাবে সাহিত্য ও ইতিহাসের দৃঢ় পার্থিব ভূমি হতে পুরাণ-সুলভ কাহিনীর ও মধ্যযুগের ধর্মসাধনার গগনপথে উন্নীত হতে পারেন নাই।[৩১]

---

[২৭] রাজ্যশ্বর মিত্র, *প্রাচীন বাংলা সঙ্গীত*, কলিকাতা, ১৩৮২, পৃ. ৬৫।

[২৮] প্রসূন বসু (সম্পা.), পৃ. ১৫০।

[২৯] নীহাররঞ্জন রায়, পৃ. ৬২৯।

[৩০] নগেন্দ্রনাথ বসু, পৃ. ৬৬৫।

[৩১] হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৪০।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, সপ্তদশ সংখ্যা ১৪১৬

বাংলাদেশের মাটির পুতুল : নান্দনিক বৈশিষ্ট্য ও শৈল্পিক মান

শাহরিয়ার হোসেন*

Abstract: The spectacular earthen dolls are important part of Bangladeshi folk-art. These earthen dolls are diversified in the style of presentation and subject. The presentation is simple and eligible and there is no exaggeration to make it sensitive. But it has the full success to represent the main idea or ideal beauty. As the dolls are made of earth, the artists made these in different style according to their will. For example, the same thing is made in different style in different regions. It is observed that, the earthen elephant is made in different style in Khulna, Panchagar, Dhaka, Mymansing, and other places. In every region they have their own distinction. In this article the author tried to explore the standard of the art and aesthetic characteristics.

সূচনা

বাংলাদেশের মাটির পুতুল এক অনবদ্য লোকশিল্প। গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষ বংশপরম্পরায় তৈরি করে আসছে এসব পুতুল। যা গ্রামের শিশুদের বিনোদনের অন্যতম উৎসগুলোর একটি। বিচিত্র তার বিষয়, বিচিত্র তার রূপÑকনেপুতুল, বাঘ, ঘোড়া, সিংহ, পাখি, হরিণ ইত্যাদি পুতুল দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ঢঙে তৈরি হয়। অধিকাংশ পুতুলই বাস্তবধর্মী করে গড়া হয় না। তবে বিষয়ের মূল ভাবরস শতভাগ উপলব্ধি করা যায়। The traditisnal ärtists do not attempt to depict feet and palms either in human or animal figures realistically. They are sometimes suggested by thick lines and curves.[১]

মাটির পুতুলগুলো তৈরি হয় প্রতীকধর্মী রূপে। পাখির চঞ্চুর আকৃতির নারীমুখে গোলাকৃতি ক্ষুদ্র মাটির তাল বসিয়ে চোখ করা হয়। কখনো বা শলা দিয়ে খুঁচিয়ে চোখ, অলঙ্কার এবং মাথায় চুলের চিত্র আঁকা হয়। মুখের ত্রিভুজ গিয়ে মেশে অর্ধগোলক মাথায়, আর পেছনে উঁচু করে খোঁপা বসানোর কায়দা বেশ মনোরম। কোনো কোনো পুতুল আরো বিমূর্ত, শলার খোঁচা তাতে থাকে না। আঙুলের চাপে ফর্ম বা অবয়ব সৃষ্টি হয়, তাতে নারীর নিটোল মুখ, বুক ও দেহভঙ্গি প্রকাশ পায়, সন্তান কোলে অথবা দু'পা ছড়িয়ে দিয়ে সন্তানকে ঘুম পাড়ানো অবস্থায় যে ক্ষুদ্র নারীমূর্তি তা ষষ্ঠী হিসেবেই পূজিত, সে পুতুল আসে ছেলের হাতে খেলনা রূপে। কথাগুলো লোকশিল্পের গবেষক

---

* ড. শাহরিয়ার হোসেন, সহকারী অধ্যাপক, নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

[১] অজিত কুমার মুখোপাধ্যায়, *Folk Art of Bengal* (Kolkata: Firma KLM, 1978), পৃ. ১২।

তোফায়েল আহমদের। তিনি আরো বলেন—'মাতৃদেবীর আদি চেতনা থেকে উৎসারিত নারী মূর্তি যেমন পুতুল তৈরির ক্ষেত্রে প্রচলিত, মুসলমানি লোকবিশ্বাস থেকে উদ্ভূত সত্য পীরের ঘোড়া কারবালার দুলদুলও তেমনি জনপ্রিয়।'[২]

বাংলাদেশের মাটির পুতুল

মাটির পুতুলের সৃষ্টি কবে কোথায় কীভাবে হয়েছে তা বলা মুশকিল। তবে এ পর্যন্ত পুতুলের সবচেয়ে পুরনো নিদর্শন মহেঞ্জোদারো (খ্রি. পূ. ২০০০) সভ্যতায় পাওয়া যায়। এরপর বাংলাদেশে বগুড়া- মহাস্থানগড়, নওগাঁ-পাহাড়পুর, কুমিল্লা-ময়নামতি, খুলনা-বাগেরহাটের পুরাকৃর্তিতে মাটির পুতুলের নির্দশন পাওয়া যায়। এরই ধারাবাহিকতায় ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, ঢাকা, ফরিদপুর, বগুড়া, নওগাঁ, মাগুরা, বাউফল সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আজো মাটির পুতুল তৈরি হয়ে চলেছে। খেলনা পুতুল সম্বন্ধে শিল্প সমালোচক বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর বলেন—'ইমেজ থেকে দৈব কিংবা দেবতা খসে গেলে পুতুল হয়।'[৩] অনেক লোকজ খেলনা পুতুলের মধ্যেই লোকবিশ্বাসের ছাপ আছে।

> শিশুদের হাতের খেলনা বয়স্কদের কাছে আরাধ্য। সন্তান কোলে জননীর যে পুতুল তা ষষ্ঠী। সে জন্য আমাদের মাটি, কাঠ ও শোলার স্টাইলাইজড পুতুলে নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিতো আছে। দীর্ঘ দিনের সংস্কৃতি ও আবেগকে ধারণ করে আছে এসব পুতুল।[৪]

পুতুল যে বিশ্বাস থেকেই সৃষ্টি হোক না কেন শিশুদের কাছে তা অতি আকর্ষণীয় একটি বিষয়। দেশের প্রায় সব অঞ্চলেই পালপাড়া আছে এবং তাদের মাঝে দু'একজন হাঁড়ি-পাতিল তৈরির ফাঁকে ফাঁকে খেলনা পুতুল তৈরি করেন। অর্থাৎ পাল বা কুমার সম্প্রদায় যে মাটি দিয়ে হাঁড়ি-পাতিল তৈরি করেন সে মাটি দিয়েই পুতুল তৈরি হয়। অঞ্চল ভেদে এ মাটির সামান্য ভিন্নতাও দেখা যায়। যেমন- লালমাটির অঞ্চলে লালমাটি, দোঁআশ মাটির অঞ্চলে দোঁআশ মাটি ব্যবহার হয়। মাটির খেলনা যাঁরা তৈরি করেন তাঁরা অনেকেই মৃৎশিল্পের সাথে জড়িত। তাঁদের আবাসস্থল সাধারণত নদীর ধারে কিংবা নিচু এলাকার আশে পাশে গড়ে উঠে। কারণ মৃৎশিল্পের উপযোগী মাটি নদীর তলদেশে এবং নিচু এলাকায় পাওয়া যায়। কুমার, পাল বা খেলনাশিল্পীরা শুকনো মৌসুমে নদীর তলদেশ কিংবা নিচু অঞ্চল থেকে মাটি সংগ্রহ করে থাকেন। মাটি এনে বাড়ির সামনে স্তূপ করে রাখা হয়। অনেকে আবার মাটিতে বড় গর্ত করে তাতে সংগৃহীত মাটি সংরক্ষণ করেন। গর্তের মুখ খর বা কচুরিপানা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। মাঝে মধ্যে তাতে পানি ছিটানো হয়।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ভাবে মাটির খেলনা তৈরি হয়। কেউ পোড়ানোর পক্ষপাতী কেউ পোড়ানোর পক্ষপাতী না। কেউ এনামেল রং করেন, কেউ ট্র্যাডিশনাল রং করেন। কেউ ছাঁচে তৈরি করেন, কেউ ছাঁচ ছাড়া হাতেই তৈরি করেন। রাজশাহী, নওগাঁ, চট্টগ্রাম, বরিশাল বিভিন্ন এলাকায় পোড়ানো খেলনার পাশাপাশি রোদে শুকানো মাটির খেলনার নিদর্শন পাওয়া যায়। মূলত যাঁরা প্রতিমা তৈরির পাশাপাশি খেলনা তৈরি করেন তাঁরা কেউ কেউ খেলনাটিকে পোড়াতে চান না। কাঁচা মাটি দিয়ে তৈরির পর রোদে শুকিয়ে রং লাগানোর পর্যায়ে চলে যান। এ

---

[২] তোফায়েল আহমদ, *লোকশিল্প* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ. ৬৮।

[৩] তোফায়েল আহমদ, পৃ. ৬৬।

[৪] তোফায়েল আহমদ, পৃ. ৬৭।

ব্যাপারে তাঁদের কেউ কেউ জানান 'পূর্ব পুরুষেরা পোড়াতেন না আমরাও পোড়াই না'। কেউ বলেন 'নিষেধ আছে'। কেউ মনে করেন প্রতিমা পোড়ানোর রীতি নেই জন্যই হয়ত পুতুল তৈরিতে এই প্রভাব পড়েছে। তবে অনেক তরুণ শিল্পীরা মনে করছেন পোড়াতে হলে তাঁদের আলাদা আয়োজন করতে গিয়ে সময়, শ্রম ও অর্থ যে পরিমাণ ব্যয় হবে তা বিক্রয় মূল্য থেকে আসবে না জন্যই হয়ত পোড়ানো হয় না। পোড়ানো খেলনার মাটি প্রস্তুতিতে তুলনামূলক ভাবে বেশি যত্ন নিতে হয়। কারণ মাটিতে কাঁকর, পাথর বা বাতাস থাকলে পেড়ানোর সময়ে তা ফেটে যায়। অর্থাৎ প্রথমে মাটি শুকনো থাকলে তা পানি দিয়ে ভিজিয়ে নিতে হবে। এরপর লোহার একপ্রকার ছেনি বা কাঁচির সাহায্যে মাটিকে পাতলা করে কাটা হয়। অনেক সময় বাঁশের চটা দিয়ে দু'হাতে এ কাজ করা হয়। এরপর একটি চাটাই বা পাটির উপর সামান্য বালি ছিটিয়ে (যাতে পায়ে লেগে না যায়) মাটিকে পা দিয়ে মাড়ানো হয়। মাড়ানোর পর বৃদ্ধাঙ্গুলির সাহায্যে অথবা মাটি বেশি হলে পা দিয়ে টিপে টিপে মাটি থেকে অপ্রয়োজনীয় পাথর, কাঁকর, কাঠের টুকরা বা এই জাতীয় ময়লা সরিয়ে ফেলা হয়। এই ভাবে কয়েকবার মাটি পাতলা করে কাটা ও মাড়ানো হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না মাটি মসৃণ হয়। এরপর শিল্পীরা কাজ শুরু করেন। পক্ষান্তরে প্রতিমা তৈরির পাশাপাশি যাঁরা খেলনা তৈরি করেন অর্থাৎ যাঁরা খেলনাটিকে পোড়ান না তাঁরা মোটামুটিভাবে পাথরকণা বেছে নিয়ে কাজ শুরু করেন।

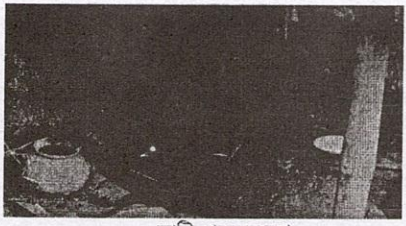

মাটি প্রস্তুতকরণ

সুপ্রাচীনকাল থেকেই মাটির খেলনা দুটি ধারায় তৈরি হয়ে আসছে। একটি হলো চাকের(চাকা) সাহায্যে অপরটি খালি হাতে, যেখানে দু'হাতের দশটি আঙুলই বলতে গেলে মূল হাতিয়ার। পুতুল বা খেলনা তৈরির ধারায় সর্বশেষ সংযোজন হল ছাঁচে গড়া পুতুল। বগুড়া-মহাস্থানগড়ে (খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী), নওগাঁ-সোমপুর বিহারে (সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দী) এবং খুলনা-বাগেরহাটে (সপ্তদশ ও অষ্টদশ শতাব্দী) ছাঁচ পদ্ধতিতে তৈরি খেলনার নিদর্শন পাওয়া যায়। বর্তমানে অধিকাংশ খেলনা ছাঁচে তৈরি হলেও তা মূল কাঠামো পর্যন্ত, শেষে কিছু কাজ হাতেই করতে হয়। অর্থাৎ কিছু বাড়তি মাটি সংযোজন হাতে করতে হয়। যেমনÑপ্রস্ফুটিত চোখ, মুখ, ভ্রুর আভাস, কণ্ঠহার, কোমরবন্ধ, বাজুবন্ধ, চুলের আভাস, মাথায় চূড়া ইত্যাদি।

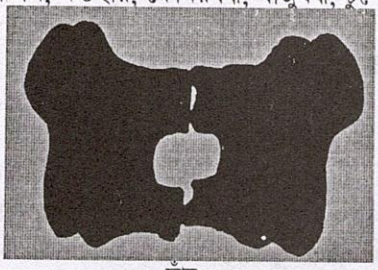

ছাঁচ

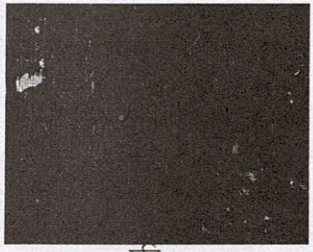

চুল্লি

পুতুল বা খেলনা তৈরির পর একে রোদে শুকাতে হয় দুই দিন থেকে চারদিন। অর্থাৎ খেলনার আকার বিশেষে শুকানোর সময় নির্ভর করবে। এরপর যাঁরা পোড়ানোর পক্ষপাতী তাঁরা চুল্লিতে সাজিয়ে পোড়ানোর ব্যবস্থা করেন। কুমার সম্প্রদায় তাঁদের হাঁড়ি-পাতিল পোড়াতে যে চুল্লি ব্যবহার করেন সেই চুল্লিতেই মাটির অন্যান্য পাত্রের সাথে খেলনাগুলো পুড়িয়ে থাকেন। অনেকে শুধু খেলনা পোড়ানোর জন্য ছোট চুল্লি তৈরি করেন।

পুতুল তৈরির শেষ পর্ব হল রঞ্জন পর্ব। অবশ্য প্রায় সব ধরনের লোকজ খেলনা তৈরির সর্বশেষ পর্ব হল রঞ্জনপর্ব। যদিও কোনো কোনো খেলনায় রঞ্জনের কোনো পর্বই থাকে না। মাটির পুতুলে সাধারণত দু'ধরনের রং হয়ে থাকে। একটি হলো ঐতিহ্যগত বা প্রতিমায় ব্যবহৃত রং, অন্যটি এনামেল রং। এনামেল রং বলতে বাজারে কৌটায় যে রং পাওয়া যায়, যে রং জানালা দরজায় লাগানো হয়। খেলনায় এ রঙের ব্যবহার এসেছে অনেক পরে, অর্থাৎ সর্বশেষে। এখন অধিকাংশ খেলনায় এই রঙের ব্যবহার দেখা যায়। কেউ কেউ এনামেল রং লাগানোর পর কাঁচা অবস্থায় কুপিবাতির ধোঁয়া দিয়ে নকশা করেন।

আর একটি পদ্ধতিতে এনামেল রং করা হয়। পানি ভরা ড্রামে বা বালতিতে কয়েক ফোঁটা রং দিয়ে পাত্রের পানি হাত দিয়ে বা অন্য কিছু দিয়ে ঘোরানোর ব্যবস্থা করা হয়। এরপর ঘূর্ণায়মান রং মিশ্রিত পানিতে ঝটপট খেলনা চুবিয়ে নিলে বিচিত্র রঙে রঞ্জিত হয়।

ঐতিহ্যবাহী রঙের উপকরণ হলো চকপাউডার, ভুস্যকালি, বিভিন্ন ধরনের গুঁড়া রং, তেঁতুল বিচির আঠা, সাগুর আঠা কিংবা বেলের আঠা, দোয়াতের কালি (লাল, নীল, কালো, সবুজ), আলতা, শিমপাতার রস, কুমড়া ফুলের রস, কাঁচা হলুদ ইত্যাদি। তেঁতুলবিচির আঠা একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়। প্রথমে তেঁতুলবিচিকে হালকা ভেজে নেওয়ার পর তা থেঁতিয়ে খোসা ছাড়িয়ে কিছু সময় (এক-দু' ঘণ্টা) পানিতে ভিজিয়ে রাখা হয়। পরে তা পাটাতে ভালভাবে পিষে নিয়ে পানিতে গুলিয়ে সিদ্ধ করে আঠা তৈরি করা হয়। তেঁতুলবিচির এই আঠা কিংবা বেলের আঠার সাথে চকপাউডার পানিতে গুলিয়ে পুরো খেলনাতে প্রলেপ দেওয়া হয়। অনেকে তেঁতুলবিচি কিংবা বেলের আঠার পরিবর্তে সাগুদানা ব্যবহার করেন। এরপর তা শুকিয়ে অন্যান্য রঙে রাঙিয়ে তোলেন এবং সবশেষে সরু তুলি দিয়ে নাক, চোখ, মুখ বা সূক্ষ্ম কাজগুলো সেরে নেন। অন্যান্য রংগুলো গুড়া রং অর্থাৎ অক্সাইড রং, পিউরি, সিঁদুর ইত্যাদি ব্যবহার করেন। দোয়াতের বিভিন্ন রঙের কালি, আলতা, পাওয়ার রং, শিমপাতার রস, কুমড়া ফুলের রস কিংবা কাঁচা হলুদের মাথা কেটে বিভিন্ন রকম আলপনা বা নকশাচিত্র অঙ্কন করা হয়।

রং ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সব এলাকার শিল্পীরা উজ্জ্বল রং ব্যবহার করতে পছন্দ করেন। শুধু বাংলাদেশের লোকজ পুতুলে উজ্জ্বল রং ব্যবহার হয় তা নয় অন্যান্য দেশের লোকজ পুতুলেও উজ্জ্বল রঙের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। শিশুরা উজ্জ্বল ও চটকদার রং বেশি পছন্দ করে বলেই খেলনা শিল্পীরা এমন চকচকে রং ব্যবহার করে, যদিও আগের যুগে রং ছাড়া অনেক পুতুল হতো। কিন্তু এখন রং ছাড়া কোনো পুতুল চোখেই পড়ে না।

নান্দনিক বৈশিষ্ট্য ও শৈল্পিক মান

লোকশিল্পের এই খেলনা পুতুলের শৈল্পিক মান ও নান্দনিক বৈশিষ্ট্য বিষয়ে আলোচনার পূর্বে শিল্পকলা ও নান্দনিক মূল্য সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনার প্রয়োজন। শিল্প ও কলা শব্দ দুটি বাংলা ভাষায় এসেছে সংস্কৃত ভাষা থেকে। যদিও শব্দ দুটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এখনও সুনির্দিষ্ট নয়। শব্দগত দিক থেকে 'শিল্প' ও 'কলা' এক অর্থবোধক হলেও সংস্কৃত ভাষায় শিল্পকলা বলতে নৃত্য,

গীত-সঙ্গীত, অভিনয় ইত্যাদি চৌষট্টি রকম বিদ্যাকে বোঝাত। বাংলায় কলা বলতে শিল্পবিদ্যা বোঝায়। শিল্পবিদ্যা বলতে ART-কে বোঝানো হয়। শিল্প শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ ART গ্রীক ভাষা থেকে রূপান্তরিত ল্যাটিন শব্দ ARS থেকে গৃহীত হয়েছে। ইংরেজি প্রতিশব্দ ART এসেছে ফরাসি ভাষার মাধ্যমে। শিল্পকলা বা ART শব্দটি যে ভাষা থেকে যেভাবেই আসুক না কেন এর কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা আজও নেই। তবে যুগে যুগে পণ্ডিতগণ শিল্পকে নানভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কেউ মনে করেন শিল্প হলো অনুকরণ আবার কেউ মনে করেন শিল্প নির্মাণ নয় সৃষ্টি। এ ধরনের আরও মত আছে। যেমন—

ক) শিল্প হল মানুষের সুন্দর কাজ, সচেতনভাবে শৈল্পিক চেতনার মধ্য দিয়ে সে যা সৃষ্টি করে।
খ) শিল্প যখন বাস্তব এবং কল্পনার মিশ্রণে নতুন একটি বস্তু তৈরি করে তখন তা শিল্প।
গ) শিল্প হল দৃষ্টিগোচর পৃথিবীকে অনুভব করার একটি আবেগময় কৌশল।

অর্থাৎ শিল্প কি, এই বিষয়টির পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। শিল্প হচ্ছে মানব সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়াস, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) মতে 'যার উৎপত্তি নিছক প্রয়োজনের বাইরের একটি গূঢ় তাগিদ থেকে।' বলা যায় শিল্প সৃষ্টি কোনো প্রয়োজন থেকে উদ্ভূত নয়। শিল্প সৃষ্টির তাগিদই শিল্পের কারণ। সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, বলেছেন 'শিল্প কখনো শূন্যতাকে অবলম্বন করে টিকে থাকতে পারে না। সমাজ, পরিবেশ, জীবন ইত্যাদির সাথে এর সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।'[৫] অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪-২০০২) বলেছেন, 'একটা না একটা ছলে আমি আমার আপনাকে দিচ্ছি আর তিনি আমাকে পাচ্ছেন। আমার পক্ষে এই দেওয়াটা আনন্দের, তার পক্ষে এই পাওয়াটা আনন্দের। দেওয়া পাওয়ার এই যে ছল বা উপলক্ষ বা মাধ্যম এরই নাম শিল্প।'[৬] শিল্পী কামরুল হাসানের (১৯২১-১৯৮৮) মতে, 'যা সবার ভাললাগে, যা দৃষ্টিনন্দন, যা প্রাণে এক অপরূপ আবেগ ও আনন্দ সৃষ্টি করে সেটাই উৎকৃষ্ট শিল্প।'

শিল্প এমন একটি বিষয় যা এমনিতেই হয় না অর্থাৎ এ কোনো প্রাকৃতিক বিষয় নয়। শিল্প মানুষের সৃষ্টি। কাজেই শিল্পের বয়স মানব সভ্যতার সমান। যখন থেকে মানুষ একের সাথে অপরের যোগাযোগ স্থাপন করল, চিন্তার মাধ্যমে জগৎ কে বুঝতে শিখল, জৈবিক আনন্দ, তৃপ্তি ও বেদনাকে শিল্পিতভাবে উপলব্ধি করতে পারল, তখন থেকেই তার বহু বিচিত্র অনভূতিরাজিকে প্রকাশের তাগিদও উপলব্ধি করল। বালির উপর কটি রেখা, গুহার দেয়ালে রঙিন মাটি বা পাথরের ঘর্ষণে উৎকীর্ণ কিছু আঁকিঝুকি, গতির আবেগ শুদ্ধ জ্যামিতিক ফর্ম, চক্রের আকারে নির্মিত চাকা- এসবই আদিম মানব মনের শিল্পিত প্রকাশ।

নন্দন অর্থ সৌন্দর্য। তবে সৌন্দর্য বিষয়টি কী, কাকে সৌন্দর্য বলা হবে কিংবা সৌন্দর্যের স্বরূপই বা কি, এ বিষয়ে সরাসরি কোনো উত্তর দেওয়া দুরূহ। শিল্পী আবদুস সাত্তার "প্রকৃত শিল্পের স্বরূপ সন্ধান" গ্রন্থে সুন্দর বিষয়টিকে বাতাসের সাথে তুলনা করেছেন। বাতাস যেমন দেখা যায় না অনুভব করা যায়। সুন্দরও তেমন অনুভবের বিষয়।[৭] বাংলায় অনেকেই ইংরেজি

---

[৫] সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, *নন্দনতত্ত্ব* (ঢাকা:বাংলা একাডেমী, ১৩৯৫), পৃ. ৩৮।
[৬] অন্নদাশঙ্কর রায়, *আর্ট* (কলকাতা: পুনশ্চ, ১৯৮৯), পৃ. ৯।
[৭] আবদুস সাত্তার, *প্রকৃত শিল্পের স্বরূপ সন্ধান* (ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৪১০), পৃ. ১৩।

Aesthetics-এর প্রতিশব্দ রূপে 'সৌন্দর্যতত্ত্ব' শব্দটি ব্যবহারের পক্ষপাতী। কিন্তু Aesthetics শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ আর যাই হোক, 'সৌন্দর্যতত্ত্ব' কখনোই হতে পারে না।[৮]

Aesthetics-এর আলোচ্য বিষয়াবলির মধ্যে সৌন্দর্য একটি বিষয় মাত্র। কারণ মানুষের অভিজ্ঞতা কেবল সৌন্দর্যের বোধ এবং অভিজ্ঞতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রাকৃতিক কোনো দৃশ্যের সামনে এসে আমাদের যে অনুভূতি জাগে, অনেক সময়ে তাকে সৌন্দর্য না বলে মহীয়ান বা Sublime বলা হয়, কিংবা ট্রাজেডির অভিনয়-দর্শনে মনে যে প্রতীক দেখা দেয় তাকে ট্রাজিক বোধ ছাড়া অন্য কিছু বলা যেতে পারে বলে মনে হয়। আবার হাস্যরসের গান শুনে মনে যে ভাবের উদয় হয়, তাকে আর যাই হোক, সৌন্দর্যের অভিজ্ঞান বলা কোনো মতেই চলে না।

> Chernyshevsky showed that mans aesthetic emotions are by no means connected only with beauty. Of course other aestetics knew this as well, and spoke about such aesthetic phenomena as the elevate the tragic and the comic.[৯]

এ প্রসঙ্গে চের্নিশেভ্স্কির মতামত উদ্ধৃত করে লুনাচার্স্কি লিখেছেন যে, চের্নিশেভ্স্কি জানতেন যে মানুষের ঈস্থেটিক বা বৈক্ষিক আবেগ কেবল সৌন্দর্যের সঙ্গেই সংযুক্ত নয়। অন্য বীক্ষাতাত্ত্বিকেরাও ভালভাবে জানেন, ট্রাজিক এবং কমিক রূপেও তাঁরা বৈক্ষিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের কথা বলেছেন।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম তাঁর "নন্দনতত্ত্ব" গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সৌন্দর্যের সন্ধান' নামক প্রবন্ধ থেকে কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন। এভাবে—

> পণ্ডিতের সামনে এসে সুন্দর দায়গ্রস্ত হল- প্রশ্নে উঠলো সুন্দরকে নিয়েÑতুমি কেন সুন্দর, কিসে সুন্দর ইত্যাদি। সুন্দর যে সুন্দর বলেই সুন্দর, মনে ধরল বলেই সুন্দর, এ সহজ কথা সেখানে খাটলো না, পণ্ডিত সেই সুন্দরকে বিশ্লেষণ করে দেখাবার চেষ্টা করেছেনÑকী নিয়ে সুন্দরের সৌন্দর্য। সেই বিশ্লেষণের একটা মোটামুটি হিসেব করলে এই দাঁড়ায়Ñ ১. সুখদ বলেই ইনি সুন্দর, ২. কাজের বলেই সুন্দর, ৩. উদ্দেশ্যে এবং উপায় দুয়ের সঙ্গতি দেন বলেই সুন্দর, ৪. অপরিমিত বলেই সুন্দর, ৫. সুশৃঙ্খল বলেই সুন্দর, ৬. সুসংহতো বলেই সুন্দর, ৭. বিচিত্র-অবিচিত্র সমÑবিষম দুই নিয়ে ইনি সুন্দর। —এই সব প্রাচীন এবং আধুনিক পণ্ডিতগণের মতামত নিয়ে সৌন্দর্যের সার ধরবার জন্যে সুন্দর একটি জাল বুনে নেওয়া যে চলে না তা নয়, কিন্তু তাতে করে সুন্দরকে ঠিক যে ধরা যায় তার আশা আমি দিতে সাহস করি না।[১০]

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর্ট বা শিল্পকে সংজ্ঞায়িত করার অসারতা সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিয়ে আরো বলেছেন, 'আর্টের মধ্যে রীতিনীতি, চক্ষু-জুড়ানো, মন-ওড়ানো, প্রাণ-ভোলানো ও কাঁদানো গুণ, কিংবা এর যে কোনো একটা যেমন আর্ট নয়, আর্ট বলেই যেমন সে আর্ট, সুন্দরও তেমনি সুন্দর বলেই সুন্দর।' সৌন্দর্যের কোনোও বহিঃসত্তা নেই, সৌন্দর্যবোধই সৌন্দর্য বা সুন্দর।

---

[৮] অজিত বন্দোপাধ্যায়, *সৌন্দর্য মূলের বৈশিষ্ট্য, মার্কসবাদ ও নন্দনতত্ত্ব* (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯০), পৃ. ৭১।

[৯] A lunacharsky, *On Literature and Art* (Moscow: Progress Publishers, 1965), পৃ. ৫৪-৫৫।

[১০] সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, *নন্দনতত্ত্ব* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৩৯৫), পৃ. ১৬।

> Monuments of art, which are the stimulants of aesthetic reproduction, are called beautiful things to the physically beautiful. This combinatisn of words constitutes a verbal parabox, because the beautiful is not a physical fact; it does not belong to things but to the activity of man, to spiritual energy. But henceforth it is clear through what wanderings and what abbreviations, physical things and facts which are simply aids to reproductions of the beautiful, and by being called elleptically beautiful things and physically beautiful.[১১]

ড. সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর "সৌন্দর্যতত্ত্ব" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—

> কোনো বস্তুকে যখন আমরা সুন্দর বলি তখন আমাদের মধ্যে যে প্রসন্নতার উদয় হয় তাহার মূলে বাহ্যবস্তুর সহিতো আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির কোনো নিগূঢ় সামঞ্জস্যের অনুভূতি রহিয়াছে। এই সামঞ্জস্যটির স্বরূপ কি তাহা আমরা বলিতে পারি না; কিন্তু কোনো অব্যক্ত প্রকারে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি যখন বাহ্যবস্তুকে আপনার সহিতো ঐক্যসূত্রে নিবদ্ধ বলিয়া পরিচয় পায়, তখন তাহার ফলে আনন্দ উদ্রিক্ত হয়।[১২]

এই আনন্দ মানব জীবনে অপরিহার্য একটি বিষয়। এ বিষয়ে শিল্পী ও শিল্প সমালোচক মতলুব আলী তাঁর "শিল্পী ও শিল্পকলা" গ্রন্থের শুরুতে উল্লেখ করেছেন—

> কায়িক শ্রম বাঁচার তাগিদকে সন্তুষ্ট করতে যে ভূমিকা পালন করে থাকে— তার চেয়ে মানুষের সৌন্দর্য-পিপাসার চিরন্তন আকাঙ্ক্ষার অবদান কিছু কম নয়। বরং বলতে পারি আমাদের মানসিক শ্রম পরিপূর্ণভাবে জীবনে টিকে থাকার অদম্য উৎসাহ ও প্রচেষ্টাকে ক্রমাগতই সৃজনশীল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলে। তাই আজ এ সত্য প্রতিষ্ঠিত যে মানসিক প্রস্তুতির উপর এবং মনের সার্বিক সহযোগিতার সাথে কর্মের ভালোমন্দ বা গুণাগুণ যথার্থই আপেক্ষিকভাবে নির্ভরশীল।[১৩]

শিল্প ও সৌন্দর্যের মূল্য শতভাগ আপেক্ষিক ব্যাপার। একই বিষয় সময় ও ব্যক্তি সাপেক্ষে কখনো সুন্দর কখনো অসুন্দর হতে পারে। যেমন— প্রিয়জনের চিঠিতে যদি কিছু নাও থাকে তবু তা মূল্যবান, আবার কিছু থাকলে তা আরো মূল্যবান। অন্নদাশঙ্কর আর্টের মূল্যকে তিন দফায় ভাগ করেছেন। 'এক, তার নিজের। দুই, তার রচয়িতার। তিন, তার বিষয়ের।'[১৪]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে মাটির পুতুল লোকশিল্পের একটি অংশ। লোকশিল্পের সংজ্ঞা নানাজনে নানাভাবে উপস্থাপন করেছেন। সর্বোপরি বলা যায়, যে শিল্প মুখ্যত এবং মূলত ব্যক্তিগত প্রতিভা অথবা বিশেষ স্কুল বা ব্যক্তি বিশেষের স্টাইলে অনুশীলিত নয় এবং অহংবাদ দ্বারা পুষ্ট নয় সেই শিল্পকে লোকশিল্প বলা যায়। আলোচনার সুবিধার্থে শ্রীসুহাস চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত "মার্কসবাদ ও নন্দনতত্ত্ব" গবেষণা গ্রন্থে প্রকাশিত বিনয় ভট্টাচার্যের 'সুন্দর ও অসুন্দর লোকশিল্পের মূল্যায়ন' প্রবন্ধ থেকে কিছু অংশ তুলে ধরা হলো—

---

[১১] *Theory of Aesthetics:* Ch. XIII. পৃ. ১৫৯।

[১২] সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, *সৌন্দর্যতত্ত্ব* (কলিকাতা: চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড), পৃ. ১২৭।

[১৩] মতলুব আলী, *শিল্পী ও শিল্পকলা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪), পৃ. ১।

[১৪] অন্নদাশঙ্কর রায়, পৃ. ১৭।

> ধনতান্ত্রিক যুগের ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিল্পের বহুপূর্বে এমন কি আধুনিকতম আবিষ্কারের সূত্র ধরে বলা যায় মানব সভ্যতার প্রথম প্রত্যুষকাল প্রত্নপ্রস্তর যুগের শেষ পর্ব থেকেই লোকশিল্পের উদ্ভব। মানুষের প্রয়োজনে, সমাজের অগ্রগতিতে নানা আবিষ্কারের ফলে লোকশিল্পেরও পরিবর্তন ঘটেছে। তবে এই পরিবর্তন ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়, অহংবাদে পুষ্ট নয়, তা একান্তভাবেই সামাজিক এবং নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক পরিবেশে প্রতিপালিত। লোকশিল্পের স্রষ্টারা স্থানীয় উপকরণের মাধ্যমে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের দ্বারা তাঁদের শিল্প রচনা করে থাকেন। সুদীর্ঘকাল তাদের শিল্পরীতি কারুকৃতি প্রবহমান থাকে। নিত্য পরিবর্তন লোকশিল্পের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। হঠাৎ চমক বা চটক লোকশিল্পে থাকে না। অহংবাদী শিল্পের সঙ্গে লোকশিল্পের পার্থক্য এইখানে। এই শিল্পকলার নান্দনিক মূল্যায়ন করতে গেলে ব্যক্তি প্রতিভার প্রেক্ষিতে করা যাবে না। অহংবাদ এখানে সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত।[১৫]

দীর্ঘ দিনের ঔপনিবেশিক শিক্ষার প্রভাবে দেশের আলোকপ্রাপ্ত মানুষদের কাছে এতদিন পর্যন্ত লোকশিল্পকে অশিক্ষিত গ্রামীণ মানুষের নিম্নস্তরের কারুকর্ম বলে বিবেচনা করা হতো। যদিও বিগত কয়েক দশকে সারা বিশ্ব জুড়ে প্রখ্যাত শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, সঙ্গীতকার, চলচ্চিত্রকার, নাট্যকার, সমাজবিজ্ঞানীদের লোকশিল্প নানাভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। মানব সভ্যতার প্রাচীনতম পর্যায় থেকে সমাজে শ্রেণী বৈষম্য সৃষ্টি হবার কারণেই লোকায়ত ও পরিশীলিত এই দুই শিল্পচর্চার ধারা বিকাশ লাভ করেছে সমান্তরালভাবে। লোকশিল্প প্রকৃত পক্ষে লোকায়ত শিল্পধারা থেকে উদ্ভুত একটি নির্দিষ্ট ধারা। বিশ্বে বিভিন্ন দেশের জাতীয় শিল্পে পরম্পরায় লোকশিল্পের অস্তিত্বের ক্রমবিকাশ লক্ষ করা যায়। একেবারে প্রাচীন যুগ থেকে বিভিন্ন দেশে অসমানভাবে হলেও, যে পরিশীলিত শিল্পধারার বিপুল অগ্রগতি ঘটেছে, সেখানে লোকশিল্প খুব গুরুত্বপূর্ণ অবদান যুগিয়েছে, আজও যুগিয়ে চলেছে। আধুনিক ও সমকালীন শিল্প চেতনার বিকাশে এই শিল্পধারা নান্দনিক প্রশ্নে নানা মৌলিক উপাদান যুগিয়ে সমৃদ্ধ করেছে।

শিল্পীর চিন্তা-চেতনাকে জীবন সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা সহকারে অনুশীলন করতে নানাভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। লোকশিল্পের উল্লেখযোগ্য গুণ হল প্রকৃতির নিখুঁত প্রতিলিপি অপেক্ষা প্রকৃতির মূল ভাব ও ভাষাটুকু শিল্পে ব্যক্ত করা। শিল্পীদের কাছে Realism অপেক্ষা বস্তুর লক্ষণ ও আভাস হলো বড় কথা। এই জন্য আমরা লোকশিল্পে কোনো জটিলতা খুঁজে পাই না। ঘোর প্যাঁচ নেই, কারিগরি সূক্ষ্মতা নেই, বাহুল্য নেই, আড়ম্বর নেই—ঠিক যতটুকু না হলে নয়। সবটাই সহজ সাবলীল ও আটপৌরে। লোকশিল্পীরা প্রথাসিদ্ধ শিক্ষা ছাড়াই পারিবারিক পরম্পরা, প্রতিদিনের অভ্যাস ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এক বিশেষ ধরনের নান্দনিক বোধ ও শৈল্পিক দক্ষতা অর্জন করে থাকেন। শিল্পীদের চিন্তা চেতনায় প্রচলিত বিশ্বাস, সংস্কার ইত্যাদিরও কম বেশি প্রভাব থাকে। বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিষয় ও সামাজিক বিষয়ের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। লোকশিল্প অর্থে গ্রামীণ সমাজ ও সংস্কৃতি এবং জীবনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত সহজিয়া আবেদনসমৃদ্ধ এক সাবলীল ও প্রাণবন্ত শিল্পশৈলী ও প্রকাশভঙ্গি। লোকশিল্পের বিভিন্ন বিভাগ আছে। পাটা, পুথি, মূর্তি, মুখোশ, চালচিত্র, পুতুল নাচ, ধাতুর কাজ, কাঠের কাজ, শোলার কাজ, বাঁশ ও বেতের কাজ, দড়ির কাজ, কাপড়ের কাজ, জরির কাজ, পোড়ামাটির কাজ, কাগজের মণ্ডের কাজ, বিভিন্ন ধরনের খেলনা ইত্যাদি। এর মধ্যে মাটির পুতুল উল্লেখ্যযোগ্য একটি দিক।

---

[১৫] বিনয় ভট্টাচার্য, *সুন্দর ও অসুন্দর লোকশিল্পের মূল্যায়ন, মার্কসবাদ ও নন্দনতত্ত্ব* (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯০), পৃ. ১৩২।

এই বিশেষ শিল্পের একটি আন্তর্জাতিক আবেদন আছে। সমাজজীবনে বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছে এই শিল্পের ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও আকর্ষণ রয়েছে। খুব দ্রুত সরাসরি দর্শকের মনে প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি করতে পারে এবং মনের মধ্যে স্থায়ী ছাপ ফেলতে পারে। এসবের মূলে রয়েছে সহজ-সরল ও আসল ভাবটুকু সরাসরি উপস্থাপন করা।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে নির্দ্বিধায় বলা যায়, যেকোনো ধরনের শিল্পকলার শৈল্পিক মান ও নান্দনিক বৈশিষ্ট্য একটি অপেক্ষিক বিষয়। অর্থাৎ মাটির পুতুলের ক্ষেত্রেও তাই। এক শিশু থেকে আর এক শিশুতে এর আবেদনগত পার্থক্য আছে। এ মূল্য শিশুদের একান্ত ভাল লাগার। তবে শিশুদের কাছে যে কোনো মাটির পুতুলের মূল্য অপরিসীম।

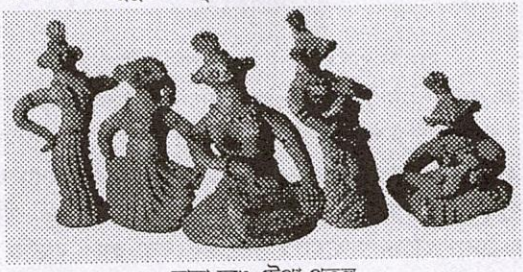

নানা ঢঙে টেপা পুতুল

পুতুল তৈরির জন্য মাটি আমাদের সহজলভ্য বিষয়। মাটির খেলনা পুতুলগুলোর বিষয়বৈচিত্র্য অনেক। যেমনÑবিভিন্ন ধরনের কনে পুতুল, দম্পতি, পরী, হাতি, ঘোড়া, হরিণ, পাখি, গরু, বাঘ, সিংহ, কুমির, বিড়াল, খরগোশ, হাঁস, মুরগি, মাছ, মাথা নাড়ানো বৃদ্ধ ইত্যাদি। উপাদান হিসেবে মাটির সহজলভ্যতা এবং করণকৌশলে যেমন খুশি তেমন গড়ন দিতে পারায় মাটির খেলনা পুতুলের বিষয়বৈচিত্র্য অনেক বেশি। তবে পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার, মহাস্থানগড়, ময়নামতি, বাগেরগাট বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান থেকে পাওয়া খেলনাগুলোর সাথে আজকের খেলনাগুলোর উপস্থাপন ভঙ্গিতে যথেষ্ট মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বাড়তি ভনিতা ছাড়া সহজ-সরলভাবে মূল বিষয়টিকে উপস্থাপন করা হয়েছে। কোনো বিষয়ই বাস্তবধর্মী (Realism) করে গড়া হয়নি। তথাপি শিশুদের বুঝতে অসুবিধে হয় না খেলনাটি গরু, ঘোড়া, বাঘ না কনেপুতুল। শিশুর হাসির মতই সহজ। গড়ন ও রং দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়, তা যত সহজে শিশুর মনে পৌঁছে যায় সেটা-ই খেলনাগুলোর লক্ষ্য। বিষয় নির্বাচনেও তাই করা হয়েছে। শুরু থেকে এ পর্যন্ত যত খেলনাপুতুল তৈরি হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হচ্ছে কনেপুতুল নানা আঙ্গিকে ও নানা ভঙ্গিতে এটি তৈরি হয়েছে। মহেঞ্জোদারোর ১৪ সেন্টি মিটারের নৃত্যরত রমণী থেকে আজ অবধি নানাভাবে কনেপুতুল উপস্থাপিত হয়েছে। কখনো মা, কখনো মেয়ে, কখনো বধূ, কখনো পরী ইত্যাদি রূপে। কোনো কোনো এলাকার কনেপুতুলে দু'শ বছরের ঔপনিবেশিক প্রভাবও লক্ষণীয়। স্কার্ট, ম্যাক্সি, হ্যাট এদেশীয় পোষাক না হওয়া সত্ত্বেও এদেশীয় লোকশিল্পীরা তা যুক্ত করেছে কনেপুতুলের সাথে। আবার গারো শিল্পীরা কনেপুতুলকে উপস্থাপন করেছে গারো রমণীর আদলে। কোনো অঞ্চলে রং ব্যবহৃত হয়েছে, কোনো অঞ্চলে হয় নি। এগুলোর অঙ্গভঙ্গি নানা রকম। যেমন হস্ত প্রসারিত, নৃত্যরত, কলসিকাঁখে, বধূসাজে, সন্তান কোলে, পরীর ঢঙে, চুল আচঁড়ানো, বাদ্য বাজানো ইত্যাদি। নিত্যদিন পুতুলগুলোর এসব ঢঙ যে পরিবর্তিত হয় তা নয়। যুগ যুগ ধরে একই ঢঙে তৈরি হচ্ছে এসব খেলনা। শিল্পী পরিবর্তন হলেও গড়ন খুব বেশি পরিবর্তিত হয় না। সময়ের সাথে সাথে সামান্য কিছু পরিবর্তন ঘটে। যেমন এক সময়ে এনামেল

রঙের ব্যবহার ছিল না। কিছু ছিল তৈরির পর শুধু পোড়ানো হতো, আবার কিছু ছিল পোড়ানোর পর তেঁতুলবিচির আঠা কিংবা সাগু গুলিয়ে তাতে রং মিশিয়ে প্রলেপ দেওয়া হতো। এসব খেলনা খুব বেশি পরিবর্তিত না হওয়ার কারণে, বংশপরম্পরায় একই সম্প্রদায় এটি তৈরি করে আসছে। তবে যারা পেশাদারী প্রতিমা শিল্পী তাদের করা পুতুলে প্রতিমা তৈরির প্রভাব পড়ে। যেমন—

কলসি কাঁখে রমণী, প্রাপ্তিস্থান: শ্রীনগর

হাতে চুড়ি পায়ে আলতা চোখ দুটো টানা টানা এ ধরনের কনেপুতুল দাঁড়ানো বা বসার মধ্যে আছে লাবণ্য ও কমনিয়তা। শাড়ির ভাঁজ ও শরীরের ভাঁজ এবং নারীদেহের কোমল ভাবটুকু স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রতিমাশিল্পী ছাড়া অন্যদের করা কনে পুতুলগুলোতে এত বাস্তবধর্মিতা লক্ষ্য করা যায় না। নারীদেহের মূল ভাবটুকু ঠিক রেখে সহজ-সরল উপস্থাপন। যেমন ময়মনসিংহ-নেত্রকোণার পুতুলগুলো হাত দিয়ে চেপে ছাঁচের সাহায্য ছাড়া তৈরি করা হয়। বাড়তি রং বিহীন এই কনে পুতুলগুলোর মুখশ্রী সুচালো। চোখ, চুল ও আঙুলের ভাঁজ শলার খোঁচা দিয়ে বুঝানোর চেষ্টা করা হয়। গলার মালা বা বাজুবন্ধ পাতলা মাটি বসিয়ে খাঁজ কেটে বোঝানো হয়।

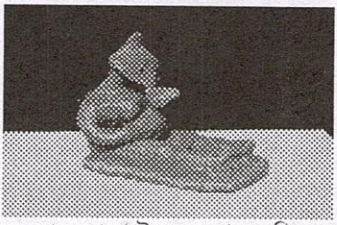

শিশুকে চুমু দেওয়ার দৃশ্য (টেপা পুতুল), প্রাপ্তিস্থান: ময়মনসিংহ

চিত্রে পুতুলটিতে মা ও শিশুর আবেগঘন মুহূর্তের দৃশ্য ফুটে উঠেছে। তুলে ধরা হয়েছে শিশুর প্রতি মায়ের আদি অকৃত্রিম ভালোবাসার কথা। শিশুর গালে মায়ের চুমু অতি পরিচিত একটি দৃশ্য। পা মেলে দু'হাতে শিশুকে জড়িয়ে ধরে বসে আছে মা। পায়ে নূপুর হাতে বাজুবন্ধ, গলায় মালা আর মাথায় চুল পরিপাটি করে আঁচড়িয়ে খোপা বাঁধা। রূপচর্চা দেখে ভেবে নেওয়া যায় অল্প বয়েসী মা। শিশুর কাছে মায়ের দুধের মূল্য যে অপরিসীম, শিল্পীর এ উপলব্ধি তার কাজে প্রতিফলিত হয়েছে। এ অংশে সে বাড়তি গুরুত্ব দিয়েছে শলা দিয়ে চেপে নকশা এবং বৃন্তে ছিদ্র রেখেছে। পুতুলটির কোনো অংশে বাস্তবধর্মী ড্রইং উপস্থাপিত হয় নি। কিন্তু মা ও শিশুর মাঝে যে সম্পর্ক সেইভাব ও সেই রস পুরোটাই ফুটে উঠেছে এই পুতুলটিতে। সহজ-সরল উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে মূল রসটুকু তুলে ধরাই খেলনা পুতুলগুলোর আসল উদ্দেশ্য। এ ধরনের আরো দুটো খেলনার ছবি নিচে দেওয়া হলো।

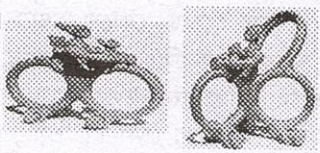

সাইকেল ও রিকশা, প্রাপ্তিস্থান: ঢাকা

উল্লিখিত সাইকেল ও রিকশা শিল্পী মরণ চাঁদ পালের (রায়ের বাজার ঢাকা) তৈরি করা খেলনা। এ ধরনের খেলনা ময়মনসিংহ অঞ্চলেও তৈরি হয়। খেলনা দুটি প্রতীকধর্মী। এখানে শিল্পী সাইকেল, মানুষ কিংবা রিকশার সুক্ষ্ম শিরা উপশিরা না দেখে সাইকেলের মূল ফর্ম, সাইকেলের সঙ্গে মানুষেরা সম্পর্ক কিংবা রিকশার মূল ভাবটুকু কতটা সহজভাবে শিশুদের কাছে উপস্থাপন করা যায় তারই চেষ্টা করেছেন এবং তাতে শিল্পী শতভাগ সার্থকতা পেয়েছেন। দুটো খেলনা একপলক দেখলেই বুঝা যায় যে একটি সাইকেল অন্যটি রিকশা। সাইকেলে তিন জন আরোহী, এক চালক আর দুই বালক কিংবা বালিকা। গ্রামে গঞ্জে অহরহ এই দৃশ্য দেখা যায়। মামা, চাচা, অথবা বাবার সাথে শিশুদের সাইকেলে ওঠার মজাই আলাদা। শিশুদের সে আনন্দ উপলব্ধির একটি দৃশ্য খেলনাটিতে ফুটে উঠেছে। সামনের শিশুটি অপলক দৃষ্টিতে সম্মুখপানে চেয়ে আছে, পেছনের শিশু উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করছে সাইকেলটি কোনো দিকে চলেছে। আর চালক বেশ সিদ্ধহস্তে সাইকেল চালনা করছে। তিন জনের পৃথক পৃথক তিনটি ভঙ্গি ফুটে উঠেছে খেলনাটিতে। সাইকেলে স্পোক নেই, চেইন নেই, পেডেল নেই এমনকি চালকের পাও নেই তথাপি আমাদের এতটুকু বুঝতে অসুবিধে হয় না যে এটি সাইকেল চালানোর একটি দৃশ্য। খেলনার নিচে চারটি ছোট চাকা দেওয়া হয়েছে। দড়ি বেঁধে টেনে বেড়ানোর জন্য। এতে যে শিশুটি খেলনাটি নিয়ে খেলবে তার মাঝে সাইকেলের চলার অনুভূতি জেগে উঠবে। অদ্ভুত শিল্প চিন্তা রয়েছে এই খেলনাটির মধ্যে। অথচ দীর্ঘ দিনের ঔপনিবেশিক শিল্পচিন্তায় পর্যবসিত কিছু শিল্প সমালোচক বা বিশ্লেষক এক সময় এই সব শিল্পকর্মকে ছোট চোখে দেখার চেষ্টা করেছেন। বিভাজন করেছেন মেজর আর্ট আর মাইনর আর্টে। আর্য আর ব্রিটিশদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে আমরা যেমন জানি ফর্সা মানে সুন্দর। তেমন জানি তাদের কৌশলে আকাঁ ছবি বা শিল্পকর্ম হল মেজর আর্ট। যে শিল্পকর্মে বুদ্ধি ও অনুভূতি উভয়ের সমন্বয় ঘটে তাকে ছোট করে দেখার কিছু নেই।

অপর খেলনাটি রিকশা এটিও একই ধরনের খেলনা। রিকশার তিন চাকা আর হুড বুঝানোর জন্য উপরে আরো একটি চাকা বসানো, যাতে খাঁজ কাটা নকশা আছে। যা দেখে রিকশায় রেকসিনের ভাঁজ ভাঁজ নকশার কথা মনে করিয়ে দেয়। আজ থেকে প্রায় বিশ-ত্রিশ বছর আগে রিকশার সামনে কুপি জ্বালানোর ব্যবস্থা ছিল। গ্রামে আজো দু'একটা রিকশায় তা দেখা যায়। কুপিবাতির এই স্মৃতিটুকু রয়ে গেছে এই খেলনা রিকশায়। অতি সহজ সরল করণকৌশলে বিষয়টি অসাধারণ উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে যে শিল্পমানের সৃষ্টি হয়েছে তা কোনো নিক্তিতে মাপা সম্ভব নয়।

নওগাঁ অঞ্চলে শুভ্র সাদা কিছু খেলনা পুতুল তৈরি হয় যেগুলো কোমলমতি শিশুর মতই দেখতে। নিচে সে ধরনের কিছু খেলনা পাখির ছবি দেখানো হল।

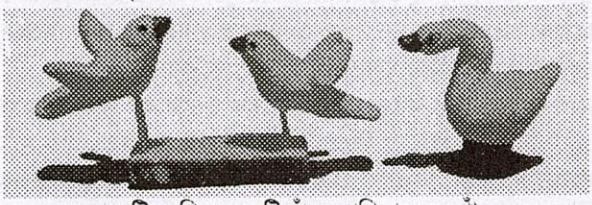

দুটি পাখি ও একটি হাঁস, প্রাপ্তিস্থান: নওগাঁ

গল্পরত দুটি পাখি ও একটি রাজহাঁস। এদের ঠোঁট আর লেজের কিছু অংশ লাল এবং চোখে কালো রং ছাড়া পুরোটা সাদা ধব ধবে। তেঁতুলবিচির আঠার সাথে চকপাউডার মিশিয়ে রং করা

হয়েছে। পাখি ও হাঁসের গড়ন শিশুদের মতোই সাদামাটা। শরীরে সূক্ষ্ম ভাঁজগুলো নেই বললেই চলে। সুক্ষ্ম ভাঁজ না থাকলেও কোনো স্থবিরতা নেই। শিল্পী পাখি দুটির মধ্যে কথোপকথনের একটি সার্থক দৃশ্য রচনা করেছেন। হাঁসটি উঁকি দিয়ে উপরে কিছু দেখছে। শুভ্র সাদার সাথে লাল ও কালোর সুন্দর সমন্বয় ঘটেছে। খেলনা দুটোরগড়ন শিশুতুল্য। শিশুদের দৈহিক গড়নে কিছু বিশেষত্ব আছে যেমন—শরীরের মাংসপেশিগুলো বড়দের মতো অতিরিক্ত ভাঁজবহুল হয় না, তুলনামূলক চোখও চোখের কালো অংশ বড়। এই একই ধরনের বৈশিষ্ট্য আলোচ্য পাখি ও হাঁসের মাঝে পাওয়া যায়। শিশুর শরীর আর মনের সাথে খেলনা পাখিগুলোর যে অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে তা অতুলনীয়।

অধিকাংশ লোকজ খেলনা তৈরিতে মূল ভাবটুকুকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এ বিষয় নিয়ে আলোচনার সুবিধার্থে কিছু খেলনাপুতুলের ছবি উল্লেখ করা হলো :

সিংহ, প্রাপ্তিস্থান: পঞ্চগড়

ঘোড়া, প্রাপ্তিস্থান: ঠাকুরগাঁ

ঘোড়া, প্রাপ্তিস্থান: পাবনা

ষাঁড়, প্রাপ্তিস্থান: নেত্রকোণা

ছবিতে খেলনা পুতুলগুলোর মাঝে স্পষ্ট লক্ষ করা যায় এদের মূলভাব কী। যেমন—সিংহের মাঝে হিংস্রতা, ঘোড়ার মেদহীন শরীর আর যোদ্ধা ষাঁড়ের শক্তি। এদের কোনোটির গঠনই বাস্তবধর্মী নয়; না ড্রইং; না রং। তবে বলা যায় সবকটিই ভাবধর্মী। সিংহের হিংস্রতা প্রকাশ পেয়েছে তার মুখমণ্ডলে। হিংস্র অবস্থায় সাধারণত এক সাথে এতগুলো দাঁত দেখা সম্ভব। রক্ত মিশ্রিত লাল জিহ্বা তার আর একটি বহিঃপ্রকাশ। সিংহ রেগে গেলে চোখ বড় হয় কিনা জানা নেই। তবে মানুষের ক্ষিপ্ততার একটি বহিঃপ্রকাশ হল বড় চোখে তাকানো। আর এ ধারণা থেকে সিংহের চোখ বড় করা হয়েছে। মানুষের মুখমণ্ডলের যে প্রভাব পড়েছে তার আরো একটি প্রমাণ নাকে। সিংহের নাক মানুষের নাকের মতো করা হয়েছে। আর হিংস্রতা বোঝাতে মুখমণ্ডলে এত বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে যে, শরীরের তুলনায় মাথা বড় হয়েছে।

ঘোড়ার বাড়তি মেদ বা বিশাল ভুঁড়ি নেই। ঝরঝরে সুঠাম শরীরের অধিকারী ঘোড়া। ঠিক এই ভাবটুকু তুলে ধরা হয়েছে পাবনা ও ঠাকুরগাঁর ঘোড়া দুটিতে। বাস্তবের সাথে অনেক অসঙ্গতি আছে অনেকাংশে। কিন্তু সবটা মিলিয়ে ঘোড়ার মূলভাব ঠিকই অনুভব করা যায়।

যোদ্ধা ষাঁড়, অর্থাৎ লড়াইয়ের ষাঁড়ের গর্দান অনেক চওড়া হয় যা শক্তির প্রকাশ এবং শিং তার মূল অস্ত্র। এ দুটি বিষয়কে প্রাধান্য দিতে গিয়ে গর্দানের প্রশস্ততা প্রায় মাটি পর্যন্ত ছুঁয়েছে আর শিং হয়েছে অস্বাভাবিক বড়। কিন্তু সব মিলিয়ে দুর্দান্ত শক্তিধর ষাঁড়ের প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে চোখের সামনে এবং খেলনাটির সার্থকতা এখানেই।

আজকের খেলনাশিল্পীদের এই মূল বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে তা বড় করে উপস্থাপন আর গুহামানবের প্রিমিটিভ আর্টে মূল বিষয়ে প্রাধান্যের ধরনে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। হাজার হাজার

বছর আগে শিকারিমানুষ শিকারে যাবার আগে কিছু অর্চনা করে বের হতো। আর এই অর্চনার প্রয়োজনে গুহাগাত্রে শিকারের লক্ষ যেসব পশু তার ছবি আঁকা হতো বেশ বড় করে কিন্তু পাশাপাশি মানুষের ছবি আঁকা হতো অনেক ছোট ও সিম্বলিক করে। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল পশু শিকার। সে কারণেই হয়ত পশুর ছবি বড় হতো। যেমন আজকের কিছু লোকজ খেলনার মধ্যে তা লক্ষ্য করা যায়। ঠাকুরগাঁয়ের খেলনা ঘোড়ার যে সোয়ারি দেখা যায় তা ঘোড়ার তুলনায় অনেক ছোট। এখানে শিল্পীর কাছে মানুষের চেয়ে ঘোড়াটি বেশি প্রাধান্য পেয়েছে।

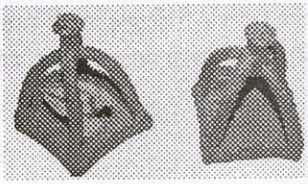

পাখির খাঁচা, প্রাপ্তিস্থান: দিনাজপুর

কিছু খেলনা আছে বেশ সিম্বলিক। যেমন— দিনাজপুরের পাখির খাঁচা। বাস্তবে পাখির খাঁচা তৈরি হয় বাঁশের শলা, জি.আই. তার ইত্যাদি উপকরণ দিয়ে এবং তা অতি জটিল গাঁথুনি সংবলিত। পক্ষান্তরে খেলনাটি মাটি দিয়ে তৈরি এবং তা অতি সরল। একটি চারকোণা পাটাতনের উপর দুটি মাটির কয়েল আড়া-আড়ি ভাঁজ করে লাগানো। উপরে ধরার জন্য গোলাপ ফুল আকৃতির হাতল যুক্ত। অতি সহজ-সরল প্রতীকী এই খাঁচা শিশুদের খুবই প্রিয়।

লোকজ পুতুলগুলো যত সহজ করে তৈরি করা হোক না কেন শিশুদের মনে পুতুলের মূল ভাবাবেগ সঞ্চারণে শতভাগ সার্থকতা পেয়েছে। কিছু খেলনায় বাড়তি কৌশলের মাধ্যমে আনন্দের আরো মাত্রা যুক্ত হয়েছে। যেমন— মাটির পাখির লেজের অংশে ছিদ্র রেখে তাকে বাঁশিতে রূপান্তর করা হয়েছে। এ বাঁশি বাজালে মনে হয় পাখিটি তার সুরেলা কণ্ঠে ডাকছে। দেখা, শোনা ও খেলার সার্থক সমন্বয় ঘটেছে খেলনাটিতে।

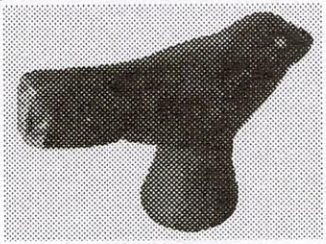

বাঁশি পাখি, প্রাপ্তিস্থান: নওগাঁ

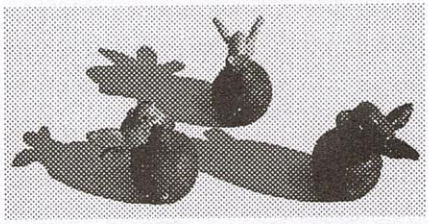

কাক ও কলস, প্রাপ্তিস্থান: নওগাঁ

মাটির কিছু খেলনা আছে যেগুলো নিছক আনন্দের পাশাপাশি উপস্থিত বুদ্ধির যোগান দেয়। কলস থেকে কাকের পানি খাওয়ার গল্পটি আমরা অনেকে জানি। গল্পটিতে কাকের উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দেখানো হয়েছে। 'কলসের তলায় পানি। কাকের প্রচণ্ড তৃষ্ণা। কিন্তু পানি খাবে কী করে, তখন সে ছোট ছোট পাথরের টুকরো কলসের ভিতরে ফেলতে শুরু করে। এক পর্যায়ে নীচে পাথরের পরিমাণ বেশি হওয়াতে পানি উপরে উঠে আসে এবং সে পান করে।' উপস্থিত বুদ্ধির এই গল্পটি খেলনাকারে রূপ দিয়েছে নওগাঁর এক লোকশিল্পী। শিশুদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য পুতুলটিতে চটকদার রং ব্যবহার করা হয়েছে।

উপসংহার

লোকশিল্পের অন্যতম অধ্যায় এই মাটির পুতুল। সহজ-সরল উপস্থাপন । তবে বিষয়ের পূর্ণ রসটুকু আস্বাদন করা যায়। অধিক সূক্ষ্মতা কোনো পুতুলেই নেই। কিন্তু শিল্পীর চিন্তা শক্তির প্রতিফলন পাওয়া যায় প্রায় প্রতিটি পুতুলে। সমাজের অনেক চিত্র উঠে এসেছে পুতুলগুলোতে। নিছক খেলার জন্য এসব তৈরি হয়নি। খেলার ছলে শিশুদের সাথে সমাজ ও প্রকৃতির কিছুটা পরিচিতি ঘটানোও একটি উদ্দেশ্য। শৈল্পিক মান কিংবা নান্দনিক বৈশিষ্ট্য আপেক্ষিক বিষয়। যেমন—পুতুলের চটকদার রং একাডেমিক শিক্ষায় শিক্ষিত শিল্পীদের ভালো নাও লাগতে পারে, কিন্তু শিশুদের কাছে নিঃসন্দেহে তা অতি আকর্ষণীয়। সর্বোপরি বাংলাদেশের মাটির পুতুল দৃষ্টিনন্দন এক অনবদ্য শিল্পকর্ম।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, সপ্তদশ সংখ্যা ১৪১৬

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নির্ভর চিত্রকলা : ইতিহাস ও ঐতিহ্যানুরাগ

বিদ্যুৎ জ্যোতি সেন শর্মা*

Abstract: The history of Bengali culture and politics entails two distinctive trends; the conservative communal aspiration of Muslims individualism and entity that remained one of the predominant factors in the creation of Pakistan, and on the other hand, the essence of regional supremacy and tributary attachment to tradition of secular culture that was steadied in their intellectual enticement in the creation of Bangladesh as an independent state. These features have also been poignantly depicted in the pre-liberation paintings of 1970s. The article intends to bring into perspective a few of these artworks, which were created in the spirits of Liberation War and elevated their features.

ভূমিকা

পাকিস্তানি অপশাসনে বীতশ্রদ্ধ প্রতিবাদীচিত্ত পূর্ববঙ্গবাসী যখন বাঙালি জাতীয়বাদী চেতনার দিকে মুখ ফেরায় তখন শিল্পীদেরকে বাংলা ভাষার উৎপত্তিকাল থেকে বিশ শতকের চল্লিশের দশক পর্যন্ত প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক ধারার তথা চিত্রকলা চর্চার ঐতিহ্যিক পরম্পরাতে মনোনিবেশ করতে দেখা যায়। এ ধারায় পুষ্টির জন্যে তাঁরা অবদানও রাখেন। কোনো কোনো ছবিতে শিল্পীরা স্পষ্টতই পক্ষাবলম্বন করেছেন সমাজে নিগৃহীত শ্রেণীর। চিত্রকলা যেন ব্যবহৃত হয়েছে সমাজ-সচেতনতা ও পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে। শিল্পীরা ব্যক্তিগতভাবে সম্পৃক্ত হয়েছেন প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে, সময় এবং সুযোগে সৃষ্টি করেছেন প্রতিবাদী চিত্রকলা। এইসব চিত্রকলায় পাওয়া যায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনার উন্মেষ ও বিকাশকালীন জনচিত্তের পরিচয়। অপর দিকে নানা প্রকার সাহিত্যকর্মের চেয়ে সময়োপযোগী এবং কার্যকর এসব বাস্তব বিষয় ও আঙ্গিকে বিরচিত চিত্রকর্ম সাধারণ মানুষকে উদ্ভূত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলির যৌক্তিকতা বুঝতে, হৃদয়ঙ্গম করাতে এবং একাত্ম হতে সহায়তা দিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধকালে রচিত চিত্রকলাতেও বজায় থাকে এই ধারাবাহিকতা। এ সময় শিল্পী মানসে প্রত্যক্ষবাদী প্রবণতার সচেতন উপস্থিতির ফলে মানবতার অপমাননাকারীদের চিহ্নিত করণে ও তাদের বিরুদ্ধে লড়ে যেতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করনের শৈল্পিক দায় শিল্পীরা সচেতনভাবে নির্বাহ করেছিলেন। মানবতাবোধ, ধর্মনিরপেক্ষতা, সাম্যের উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বাঙালিত্বের যে নির্যাস, তাকে

---

* ড. বিদ্যুৎ জ্যোতি সেন শর্মা, সহকারী অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান, ডিপার্টমেন্ট অব ফাইন আর্টস, শান্ত-মরিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেক্‌নোলজি, উত্তরা, ঢাকা।

স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করার যে উদ্দীপনা মুক্তিযুদ্ধকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল, মা-মাতৃভূমির চেতনায় উজ্জীবিত শিল্পীরা তাতে একাত্ম হয়েছিলেন স্বাদেশিক সবকিছুর জন্যই শুভকিছু করতে পারার শৈল্পিক তাগিদে। তাঁরা আত্মকেন্দ্রিকতা পরিত্যাগপূর্বক জৈবিকগুণ সম্পন্ন চিত্র সৃষ্টির কর্মকাণ্ডে নিজেদেরকে নিয়োজিত করে আন্তর্জাতিক শিল্প আন্দোলনের সেই ধারাটির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছিল, যেটিতে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে শিল্পকলার প্রয়োজনবাদকে স্বীকার করা হয়। এভাবেই পূর্ববাংলার শিল্পীর শিল্প চেতনায় বৈশ্বিক ভাবনা তথা আন্তর্জাতিকতাবাদ স্থান পেয়ে যায়।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাঙালিত্বের চেতনার গতিশীল প্রবাহের পাশাপাশি এ দেশ আন্তর্জাতিকভাবে সোভিয়েত নেতৃত্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের সাথে ঘনিষ্ঠ থাকায় রাজনীতি ও সংস্কৃতি অঙ্গনে প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর সার্বিক মুক্তির প্রসঙ্গটি উচ্চকিত থেকেছে। চিত্রকলার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ছিল না। আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক চিত্রধারার প্রতি আস্থা রেখে শিল্পীরা মুক্তিযুদ্ধের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে বিধৃত করে ইতিহাস সচেতনতার পরিচয়ও দিয়েছেন। গত শতাব্দীর সত্তর দশকের এরূপ কিছু চিত্রকর্মের বিশ্লেষণ নব প্রজন্মের কাছে তাঁর জাতির পরিচয়ের স্বরূপ উপলব্ধি সহায়ক বলে গণ্য হতে পারে।

বাঙালির বাংলাদেশ

বিভিন্ন সময়ে আগত ও স্থানীয় বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর মিশ্রণে এবং ভাষা ও ধর্মীয় আচার আচরণে সমন্বয়ী ভাব নিয়ে একটি সংকর ধরনের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বাঙালি, বাংলার ভূপ্রকৃতির প্রভাবে গঠিত মন-মানসিকতায় ও চিন্তা-চেতনায় ভারতবর্ষীয় অন্যান্য অঞ্চলের সাথে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে সাম্যবাদী সমাজ আকাঙ্ক্ষায় সামন্ততান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থাতে স্থির, কিন্তু নিশ্চিত কৃষিভিত্তিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিল। অন্যদিকে কৌম জীবনে অভ্যস্ত বাঙালির প্রাচী কৌমস্মৃতি ও চেতনার সঙ্গে প্রায় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত আঞ্চলিক স্মৃতি ও আঞ্চলিক চেতনা। এই আঞ্চলিক চেতনার বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও মহারাজ শশাঙ্কের শাসনামলে (আনুমানিক ৫৯৩-৬৩৫খ্রিস্টাব্দ) রাঢ় গৌড়, পুণ্ড্র প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে গড়ে ওঠা জনপদগুলিকে একক সত্তায় সন্নিবিষ্ট করার প্রয়াসের মাধ্যমে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় চেতনা জেগে উঠেছিল, পাল আমলে যা অধিক পরিস্ফুট। পাল আমল (আনুমানিক ৭৫৩-১১৫০ খ্রিষ্টাব্দ) থেকেই বাঙালি তার আপন স্বভাব-বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ধর্ম ও অঙ্কুরিত ভাষাকে নিয়ে তৎকালীন সময়ের ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতি সহনশীল থেকেও একটি বিশেষ জাতি হিসেবে বিকশিত হয়ে উঠেছিল। 'অবহট্ট' ভাষায় রচিত কাব্য কবিতায় বাঙালি চেতনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কৌমতন্ত্রের রাজতন্ত্রে বিবর্তনের প্রক্রিয়া, পদ্ধতি ও সময়, ধনোৎপাদনে পদ্ধতিগত ও রাষ্ট্রবিন্যাসগত অসামঞ্জস্যের কারণে জনসাধারণের মধ্যে দেশের সামগ্রিক ঐক্যচেতনা গড়ে না উঠলেও পাল শাসনামলের মধ্যভাগ হতেই রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গি সংকুচিত হয়ে সর্বভারতীয় থেকে সরে এসে প্রান্তীয় স্বতন্ত্র সত্তায় স্থির হতে থাকে। এই স্বাধীন সত্তার চেতনাই বাংলার রাষ্ট্রীয় চেতনা, যা মধ্যযুগে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ'র শাসনামলে (১৩৪২-১৩৫৮) বাঙালির একক জাতিসত্তা গঠনে জন্য আবশ্যকীয় ভূখণ্ডগত ঐক্য গড়ে তুলতে সক্ষম হয় এবং বাংলা বা বাঙ্গালা নামে অভিহিত হয়। পরে মোঘল সম্রাট আকবরের সময়ে পুনরায় দিল্লীর অধীন হলেও 'সুবে বাঙ্গালা' নামে নির্দিষ্ট ভূখণ্ড হিসেবে থাকে। ব্রিটিশ সরকরের অধীনস্থ হওয়ার পরে

এর নাম হয় বেঙ্গল।[১]

বাঙালির নিশ্চিত কৃষিভিত্তিক জীবন ব্যবস্থা ব্রিটিশ শাসনামলে চূড়ান্তভাবে ভেঙে পড়ে। সে সময় জমির উপর কৃষকের সামন্ত্রতান্ত্রিক অধিকারটুকু উৎখাত হয়। তৎকালীন সরকার ও অভিজাত শ্রেণী কর্তৃক কৃষক ও অন্যান্য বৃত্তিধারী শ্রমিক শ্রেণীর উপর নির্বিশেষে দারিদ্র্য চাপানোর ফলে বিভিন্ন সময়ে প্রতিরোধ আন্দোলন ও সশস্ত্র অভ্যুত্থান দেখা দিতে থাকে। সেগুলির মূল লক্ষ্য ছিল বিদেশি শাসন হতে মুক্তি, জমিদার শ্রেণীর কবল থেকে ভূমি স্বত্বের পুনরুদ্ধার এবং সর্বোপরি সকল প্রকার শোষণ উৎপীড়ন থেকে মুক্তি (যেমনÑসন্ন্যাসী বিদ্রোহ, ফকির বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, ফারায়জি আন্দোলন, টংক বিরোধী আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলন, নাচোল বিদ্রোহ ইত্যাদি)।[২] এসব আন্দোলন ও বিদ্রোহের কোনো কোনোটিতে ধর্ম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করলেও প্রয়োজনে বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে নিষ্পেষিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ব্যাপক অংশগ্রহণে আন্দোলনগুলির চরিত্র হয়ে দাঁড়ায় মূলত ইহজাগতিক। এইসব তাৎপর্যমণ্ডিত ঘটনাপ্রবাহই বঙ্গদেশীয় জনসমষ্টির জাতীয় জীবনের সংগ্রামী চেতনার ঐতিহাসিক সঞ্চয়।[৩]

এভাবে বাঙালির জাতিসত্তা গঠনের উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক উপাদান ও রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা সমূহে অন্বেষণ চালালে দেখা যায়, প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালির মানস প্রকৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ঘুরে ফিরে ইহজাগতিকতায় মনোনিবেশ, মানবতাবাদে পূর্ণ আস্থা। প্রাচীন সাহিত্যে বাঙালির দৈনন্দিন জীবনের নানা মানবী লীলা ও মানবিক আবেদন সমান প্রত্যক্ষ। শিল্প-সাহিত্য ও ধর্ম সাধনায়, এমনকি ব্যাপকভাবে অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রেও বাঙালি আশ্রয় করেছে তার সহজ প্রাণশক্তি, হৃদয়াবেগ ও ইন্দ্রিয়ালুতাকে। ধর্মীয় ভাব-ভাবনায় বার বার প্রতিফলিত হয়েছে ঐহিক জীবনের প্রতি আসক্তি, বৈরাগ্যের প্রতি অশ্রদ্ধা। সহজযানী সিদ্ধাচার্যরা বর্ণ, শ্রেণী, ধর্ম ও আচারানুষ্ঠানের ভেদাভেদ জ্ঞানকে অবজ্ঞা করে সকলের উর্ধ্বে মানুষের যে মানব-মহিমা, তার পক্ষে সুস্পষ্ট ঘোষণা জানিয়েছেন। সাধকগণের সাধন-দর্শন এবং সাধন পদ্ধতি ছিল দেহাশ্রিত। মানুষই সকল সাধনার পরমাদর্শ, পরমাশ্রয়। ধ্যানস্থ সাধক- শিল্পী ঈশ্বরের রূপ কল্পনায় মানব দেহকেই বেছে নিয়ে তাতে প্রকৃতিস্থ বস্তু উপকরণের সাদৃশ্য- সংযোগ ঘটিয়ে অতিপ্রাকৃত ভাব ফুটিয়ে তুলেছেন। ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণা দিতে গিয়ে বাঙালি তার বস্তুগত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ উপমার সাহায্য নিয়েছে। দেহকোষের টীকায় 'সহজভাব' বোঝাতে বিকামোন্মুখ সকল মানুষই এক জাতি, এই ধারণাটিও দেওয়া হয়েছে। বস্তুগত চিন্তা এবং সাম্য-ভাবনার প্রেমাবেগের এ ধারাতেই মধ্যযুগের কবি চণ্ডিদাসের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে, 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার

---

[১] অজয় রায়, "বাংলাদেশ: পুরাবৃত্ত, ইতিবৃত্ত", মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পা), *বাংলাদেশ: বাঙালী আত্মপরিচয়ের সন্ধানে* (ঢাকা: সাগর পাবলিশার্স, ১৯৯১), পৃ. ১৯-৩২। ক্ষেত্র গুপ্ত, *বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস* (কলিকাতা: গ্রন্থনিলয়, ১৯৯২), ভূমিকা।

[২] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস :আদিপর্ব* (কলিকাতা: লেখক সমবায় সমিতি), পৃ. ১১-১৮। কার্ল মার্কস, "ভারতে বৃটিশ শাসন", কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস, *প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ: ১৮৫৭-১৮৫৯* (মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৭১), পৃ. ১৮-১৯। কো; আন্তোনভা ও অন্যান্য,*ভারত বর্ষের ইতিহাস*, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় (অনু), ২য় সং (মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৬), পৃ. ২৪৫-৫৯।

[৩] রতনলাল চক্রবর্তী, "প্রতিরোধ আন্দোলন ও কৃষক বিদ্রোহ", সিরাজুল ইসলাম (সম্পা), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩), ভূমিকা।

উপরে নাই'। এ সব মানস উপকরণ রক্ষণশীল আর্যভারত ও ব্রাহ্মণ্য কিম্বা আশরাফ শ্রেণীর মুসলিম মানস-প্রকৃতির সাথে অনভিজাত বাঙালির মানস গঠনের উপাদানগত পার্থক্য নির্দেশ করে।[৪]

পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃত্ব তৎকালীন বাংলা প্রদেশের জনসৌধ এবং তাদের প্রকৃত মানস গঠন, ভূগোল পরিচিতি ও পরিবেশ, ভূমি ব্যবস্থা ও উৎপাদন শক্তির সম্পর্ক, ভাষা-সাহিত্য, শিল্পকলা, ইতিহাসের মূলধারা ও ঐতিহ্য-লালিত আচার আচরণ, জনসৌধের ঐতিহ্যমণ্ডিত সমন্বয়ধর্মী দার্শনিক চিন্তা প্রভৃতিকে উপেক্ষা করে। তারা বাঙালির সাংস্কৃতিক পরিচয় নির্ধারণে প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের সাথে ধর্মীয় বাহ্যিক আচার আচরণের ভিন্নতাকে প্রাধান্য দিয়ে জনসাধারণের সরল ধর্মানুভূতিকে বিপথে চালনা করে সাফল্য লাভ করেছিল। এ প্রয়াস ছিল মূলতঃ রাজনৈতিক প্রয়োজন এবং অর্থনৈতিক স্বার্থবুদ্ধিনির্ভর। এই ধর্মভিত্তিক তথা সম্প্রদায়ভিত্তিক রাজনীতির ধারা ও সাতচল্লিশোত্তর পূর্ববাংলায় (পূর্ব পাকিস্তান) তার প্রয়োগ প্রচেষ্টা এবং সেই প্রচেষ্টার বিরোধিতায় বাঙালি জাতীয় স্বার্থ চেতনার উন্মেষে যে জাতীয় ঐতিহ্যানুরাগ ক্রিয়াশীল ছিল, তাই বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। ১৯৪৮-৭১ সময়কালের মধ্যে বিকশিত ও বিজয়ী এই বাঙালি জাতীয়তাবাদের ঐতিহ্যনির্ভর উপকরণ সমূহের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি, মূল্যায়ন এবং তার প্রেক্ষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ জাতিসত্তা নির্মাণের যাবতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্য থেকেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা উত্থিত হয়েছিল।

সাধারণভাবে বলতে গেলে ১৯৭১ সালে সংঘটিত বাঙালি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার উদ্ভবকাল ১৯৫২ সাল। এই সালের ফেব্রুয়ারি রক্ত সিঞ্চনের ঘটনা বাঙালির মনোভূমিকে সিক্ত ও উর্বর করে জাতীয়তাবোধের অঙ্কুরোদ্গমে সহায়তা করে। প্রথম দিকে বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, পরবর্তীতে গণআন্দোলনে রূপ নেওয়া ভাষা আন্দোলনের চরিত্র ছিল সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক, একসাথে দুটোই। একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনাবলির মাধ্যমে বাঙালি সমাজ আপন পরিচিতির অবয়বকে অসাধারণভাবে আবিষ্কার ও পরে গ্রহণ করে নেয়। এ সময়কালে বাঙালি আপন জাতিসত্তার পরিচিতিতে নিজস্ব রাষ্ট্র সম্পন্ন উদ্যানসম সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি যথাক্রমে নির্মাণে ও নির্ধারণে এগিয়ে যেতে দৃঢ়চিত্ততায় প্রতিজ্ঞাবান হয়ে উঠে। বিশেষ করে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এবং এর জন্য সংঘটিত মহান আত্মত্যাগ, শৌর্য সাহস ইত্যাদি বোধনের জন্ম হয় একুশের ভাষা সংগ্রামের উৎসমূলে। আর এই উৎসমূলের কাছে দায়বদ্ধ বাঙালির বাঙালিত্বের পূর্ণতা এবং জাতীয় রাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষা ও অভীপ্সা। 'একুশ বাঙালির উজ্জীবনের সাড়া আর মুক্তিযুদ্ধ হলো সে উজ্জীবনের সফল পরিণতি'। 'একুশ ধর্মীয় বোধকে জয় করেছিল জাতীয় চেতনার অসাম্প্রদায়িক অনুশীলনের বোধে ও নিষ্ঠায় যা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বেগবান হয়ে ছিল ভাবাদর্শগত উপলব্ধিতে।[৫] নিকট অতীতের রাজনৈতিক সাফল্যে আত্মতুষ্ট পূর্ববাংলার মুসলমান সমাজের উপর ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ঘটনাবলি ঋণাত্মক প্রভাব ফেলে। পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে প্রকৃত জাতিসত্তার স্বরূপের সন্ধানে ঐতিহ্যানুরাগী হয়ে ওঠে এদেশের সমাজ। নিজ ভূখণ্ডের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যেই যে তার জাতিসত্তার আকৃতি ও প্রকৃতিটি বিদ্যমান, সে সত্যটি অনুভূত হয় সে সময়। প্রকৃতপক্ষে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় বাংলাকে

---

[৪] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব*, পৃ. ৬৯৬-৯৭, ৭০৮, ৭১৪-২০।

[৫] শওকত হাফিজ খান, "একুশ ও আজকের ভাবনা", *দৈনিক পূর্বকোণ* (চট্রগ্রাম) ১২ই ফাল্গুন, ১৪০০।

রাষ্ট্রভাষা করার দাবির মিছিলে তৎকালীন শাসকচক্র কর্তৃক গুলি বর্ষণের ঘটনাটি ছিল দ্বিজাতিতত্ত্ব রসে সিক্ত বাঙালি মুসলমান সমাজের গালে প্রথম চপেটাঘাত। ফলে সে সমাজকে তাদের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ঐতিহ্যের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে হয়। নতুনভাবে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ঐতিহ্যানুসন্ধানের ফলে সৃষ্ট জাতীয় মমত্ববোধ ও স্বার্থরোধ ক্রমশ হিন্দু-মুসলিম দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রভাবকে খাটো করে দেয় এবং বাঙালি-অবাঙালি দ্বৈততাকে সামনে নিয়ে এসে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটায়। এই জাতীয়তাবাদী চেতনাই ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালিকে বিজয়ী হতে অনুপ্রাণিত করে।

ইতিহাস ও ঐতিহ্যাশ্রয়ী চিত্রকর্ম: কাইয়ুম-কামরুল-কালিদাস ত্রয়ী

মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষিতে বিদ্যমান যে সব অনুষঙ্গের প্রভাবে কিংবা অবলম্বনে সত্তর দশকে শিল্পীরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-নির্ভর চিত্ররাজি গড়ে তুলেছেন সেগুলির মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ইতিহাস চেতনা, হত্যা নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞের চালচিত্র; স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগ ও বিজয়; এবং সমকাল সচেতনতা অগ্রগণ্য। প্রাথমিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-জারিত শৈল্পিক মানসের স্মৃতিপটে স্বদেশ-চেতনার অনুগামী হয়ে বিষয় হিসেবে ভেসে উঠেছে গণহত্যা, বুলেটে ক্ষত বিক্ষত লাশ, গণকবর, শত্রু ও তার দোসরদের জিঘাংসা, জ্বলন্ত ঘরবাড়ি, ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদ, নির্যাতিতা নারী দেশত্যাগী শরণার্থীর স্রোত, ধাবমান মুক্তিযোদ্ধা, শত্রু হনন ও বিজয়োল্লাসরত মুক্তিযোদ্ধার জীবন চিত্রসহ স্বাধীন দেশে ভূলুণ্ঠিত মানবতার নানা কথা জীবনের জয়গান। এই সব অনুষঙ্গ সত্তর দশকীয় চিত্রকলার ধারায় এক প্রকার বর্ণাঢ্যতা আনলেও দৃশ্যত তা কোনো বিশেষ মতাদর্শকে আশ্রয় করে বেড়ে ওঠেনি। এই ধরনের একটি রেশ পাওয়া যায় যখন চিত্রে স্বদেশ চেতনার পাশাপাশি স্বাধীনতার স্বপ্নভঙ্গের কথকতা প্রধান হয়ে উঠে। স্বাধীনতা সংগ্রামে শিল্পীদের সংশ্লিষ্টতায় শিল্পকলার ক্ষেত্রে বুর্জোয়া মানবতাবাদী প্রবণতা সমৃদ্ধ (রাজনীতি ও সমাজ সচেতনতার) যে সাংস্কৃতিক ধারা বহমান ছিল, এ সময় সে ধারাটিই যেন অস্থির চিত্ততায় বেশি তরঙ্গায়িত হয়ে উঠে। যা হোক, মুক্তিযুদ্ধের যে সব অনুষঙ্গ চিত্রকর্মকে যুদ্ধের চেতনা জারিত বলে প্রতিপন্ন করে, শিল্পীর বঙ্গীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ইতিহাস চেতনা সেগুলির মধ্যে অন্যতম বলে প্রাথমিকভাবে বিবেচ্য।

বঙ্গীয় ইতিহাসের প্রগতিশীল ধারাকে অবলম্বন করে অন্যান্য যে সব শিল্পী যুদ্ধকালীন চেতনার ঐতিহাসিক ভিত্তিমূলের রূপাঙ্কন করেন, কাইয়ুম চৌধুরী (১৯৩৪-) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। জেনোসাইড-৭১, শহীদ, বাংলাদেশ-৭১, স্বাধীনতা ইত্যাদি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বেশ কয়েকটি কাজ তিনি করেছিলেন, সেগুলি ১৯৭৩ সালে ভারতে (দিল্লি, বোম্বে) প্রদর্শিত হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই চিত্রমালার এখন আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না। অজানা কোনো লোকের নিকট বিক্রি করার কারণেই এইরূপ হয়েছে। যা হোক, কাইয়ুম চৌধুরী 'প্রতিবাদ' নামে যে ছবিটি (চিত্র-১) আঁকেন তাতে বাঙালি জাতির গঠন বৈশিষ্ট্য, জাতীয় সংস্কৃতির চরিত্র এবং সেসব রক্ষণে জাতির বৈপ্লবিক উদ্দীপনাকে ফর্ম এবং মোটিফের মায়াজালের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। সেন যুগের ভাস্কর্যের পৃষ্ঠপটের অলংকার বহুলতা, সুলতানি আমলের স্থাপত্য গাত্রের জটিল নকশাদারি, মোঘল মিনিচেয়ারের ঠাস বুনন ইত্যাদি ঐতিহ্যগত শিল্প-শৈলীর কথা স্মরণ রেখেই সম্ভবত তিনি আলোচ্য চিত্রের তলকে নানা উপাদানে ঘন সন্নিবেশিত করে তুলেছেন। তাছাড়া বিষয়ের ব্যাপকতা তো আছেই। চিত্রের ডান দিকের আয়তাকার প্রায় সাদা ক্ষেত্রটি আপাত দৃষ্টিতে অসংলগ্ন মনে হলেও অপ্রাসঙ্গিক নয়। এর দ্বারা চিত্রের অপর একটি তল তৈরি

হয়েছে, যা চিত্রের দর্পণ ও আসন। এর মাধ্যমে তিনি নিজ সময়ে বসে দূর এবং নিকট অতীতকে পর্যবেক্ষণ ও বর্ণনা করেন। চিত্রটির বামদিকের উপরের কোণায় উত্তোলিত নৌকার বৈঠার আকৃতিগুলি ধরে বিদ্রোহী বাঙালি জাতি ও তার মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসের চিত্রকথন শুরু হয়েছে। বামদিক ধরে চিত্রটিকে লম্বালম্বি তিনটি কাল্পনিক ভঙ্গুর লাইনে ভাগ করে নিলে চিত্রলেখন বুঝতে সুবিধা হয়। দেখা যাচ্ছে, শিল্পী ছবিটির রূপবন্ধ প্রস্তুত করতে জ্যামিতি ও জৈবের মিশ্রণ প্রক্রিয়া অনুসরণ করেছেন এবং প্রকারে-প্রকারান্তরে একদা এদেশে বহুল প্রচলিত ভারতীয় সাংখ্য দর্শনের 'পুরুষ-প্রকৃতি' তত্ত্বের উপর তাঁর সৃষ্টিকে স্থাপিত করেছেন। কল্পিত প্রথম লাইনের নিচের দিকে দেশীয় কৃষ্ণকায় নারী, অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল বর্ণের পুরুষাবয়বের হাতে প্রজনন প্রতীক বৃক্ষ, পেছনে ঘর গৃহস্থালি, উত্তোলিত হাতের আভাস দিয়ে শিল্পী আমাদের সমন্বয়ধর্মী প্রাচীন সমাজ সংগঠনের প্রাথমিক চিত্রটি সম্পর্কে ইঙ্গিত দেন এবং তাতে সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের মহামায়ার পুরুষ-প্রকৃতির লীলারসের জাগতিক বোধকেও সঞ্চারিত করেন। এই বোধে নানা ভাবে জারিত হয়েছেন বাংলার তান্ত্রিক, যোগী, বাউল, ফকির, পীর, দরবেশ প্রায় সকলেই। আবার জাল-মেঘ-নদী ও উত্তোলিত বৈঠার নিচে ফিগারদ্বয়কে সংস্থাপিত করে শিল্পী এদেরকে জেলে-মাঝি বৃত্তিভুক্ত করেন এবং একাত্তরের 'যার যা আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকার' আন্দোলনে শামিল করে বিষয়কে সমকালীন করে তোলেন। অপরদিকে প্রাচীন বাংলার কৈবর্তদের বিদ্রোহ বিজয়ের (দশম শতাব্দী) ইতিহাসকেও আমাদের স্মৃতিপটে জাগিয়ে দেন।

আমাদের দেশে আধ্যাত্মিক চিন্তাধারায় পরম 'পুরুষ' ধারণার পাশাপাশি 'প্রকৃতি'কে অবহেলা করা হয়নি। বরং প্রকৃতির প্রাকৃতিকতারই জয় ঘোষিত হয়েছে অনেক সময়। প্রকৃতির টানেই প্রাকৃতিক ফর্মের প্রতি মহাকর্ষ সতত কাজ করে যায় বাঙালির শিল্পী হৃদয়ে। এ দেশের শিল্প-সাহিত্যের ইতিহাসে এর নজির কম নেই। শিল্পে মাতৃরূপীনী প্রকৃতির প্রাকৃতিক ফরম নারীসুলভ কমনীয়তা ও লাবণ্য নিয়ে শিল্পীর বোধ থেকে নিঃসৃত হয়েছে। শিল্পীর প্রকৃতি বশ্যতা, বাঙালি দার্শনিক তথা বঙ্গদেশীয় শিল্পীর আধ্যাত্ম চেতনার সম্ভাব্য গতিপথ সম্পর্কে ধারণা ভাস্কর্য চর্চার প্রেক্ষাপটের আলোচনায় পাওয়া যায়। 'প্রতিবাদ' চিত্রের চিত্রীও এ বিষয়ে বিস্মৃত হননি। চিত্রের শুরুতেই (বৈঠাকৃতি ফরমগুলোর পাশে) তাঁর একাডেমিক শিল্প শিক্ষা থেকে রচিত মেঘ-নদী প্রভৃতিকে প্রেক্ষাপটে রেখে সামনে কিছু জৈবনিক ফরম এঁকে দিয়ে প্রাচীন শিল্পদর্শন তথা জাতিগত ঐতিহ্যের প্রতি তিনি বিনীত হন। এভাবে চিত্রের প্রথম ভাগটি বিষয়গত, দর্শনগত ও ইতিহাসগতভাবে ঐতিহ্য-সংলগ্ন হয়।

ইসলামের ধর্মজ শিল্পকলার অনুগামী তীক্ষ্ণ জ্যামিতিকতা মধ্যযুগীয় বাংলার শিল্পাঙ্গনে নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। ইসলামী শিল্পকলায় জ্যামিতির বিমূর্ত ভাব ব্যঞ্জনা মুসলিম শিল্পীর পৌত্তলিকতা-বিরাগকে চরিতার্থ করে। অপর দিকে জ্যামিতির মাধ্যমে শিল্প রচনার পথ অপেক্ষাকৃত বেশি বুদ্ধি আশ্রয়ী হওয়ায় 'নিরাকার' স্রষ্টার বিমূর্ত ভাবনাকে জ্যামিতির আকারে আবদ্ধ করার বৌদ্ধিক প্রয়াস মানবের জাগতিক শক্তি ও চেতনা-উজ্জীবনী জ্ঞানের পরিচায়ক। প্রকৃতির নির্যাস ছেঁকে আবিস্কৃত এই বৌদ্ধিক ফরম তাই বিমূর্ত হয়েও মানুষের প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞান-প্রসূত হওয়ায় যথেষ্ট জাগতিক ও বাস্তব। এভাবে অধ্যাত্ম ও জাগতিক উভয় পথ ধরেই মধ্যযুগীয় শিল্প লক্ষণে প্রবল জ্যামিতিকতা পূর্বতন শিল্পী চেতনাকে আচ্ছন্ন করতে চেয়েছিল। প্রাকৃতিক লাবণ্যনির্ভর শিল্প রচনার কৌশলকে লাবণ্যরহিত পুরুষালি জ্যামিতিকতা যেন জড়িয়ে ধরেছিল, চেপে বসেছিল, বিজয়ী হয়েছিল, রূপান্তরিত করেছিল। ফলে মিশ্র ফরমের তথা মিশ্র চরিত্রের

মোটিফের উদ্ভব ঘটেছিল। বাংলার শিল্পকলার ইতিহাসে এই জ্যামিতিকতার প্রাবল্য ও গাঠনিক নানা রূপান্তর ইসলাম ধর্মের রাষ্ট্রিক ও আধ্যাত্মিক বিস্তারের সমান্তরালে চলেছে। আকবরের আমলে (১৫৫৬-১৬০৫) মোঘল শিল্পকলায়, বিশেষ করে হিন্দু-মুসলিম স্থাপত্য অলঙ্করণ শিল্পে, জ্যামিতিক প্রাধান্য বেশ খানিকটা কমে গিয়ে রূপবন্ধের প্রাকৃতিক লাবণ্য পুনরায় উচ্চকিত হতে থাকে। বিভাগ পূর্বকালে কলকাতা কেন্দ্রিক শিল্পগুরুদের (যামিনী রায়, নন্দলাল বসু, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ) চিত্রকর্মের হ্রস্ব-দীর্ঘ, তীক্ষ্ণ-নম্র জ্যামিতিকতাতে শুধু পাশ্চাত্য লক্ষণ নয়, বঙ্গীয় ইতিহাসের এই বিশেষ অধ্যায়টির প্রতিও তাঁদের সচেতনতার ইঙ্গিত মেলে। তবে তাঁদের কর্ম তাঁদের সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থানের প্রভাব অনুযায়ীই হয়েছে। কাইয়ুম চৌধুরীও তাঁর অবস্থান থেকে অতীত বাংলার সমন্বয়ধর্মী সমাজ-রাজনীতি ও শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি মনোযোগের প্রমাণ রাখেন। 'প্রতিবাদ' চিত্রে অনুসৃত আঙ্গিকে জৈবনিকতা ও অ-জৈবনিকতার মাত্রাভেদে মিশ্রণের প্রক্রিয়া লক্ষ করলেই তা বোঝা যায়।

চিত্রতলের 'কেন্দ্রস্থল' আমাদের কাল্পনিক দ্বিতীয় অংশে অবস্থিত। পুরুষ ফিগারের হস্তে ধৃত বৃক্ষ অনুসরণ করেও যেমন এখানে পৌঁছানো যায়, তেমনি অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ জ্যামিতিক নকশা সংবলিত বৈঠাকৃতিগুলি ধরে দৃষ্টিকে ক্রমশ নিচের দিকে নামিয়ে আনলেও তা সম্পন্ন হয়। এই দৃষ্টিপথে এবং কেন্দ্রস্থলেই আমরা আমাদের পূর্বোক্ত পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী 'মোটিফ' কিংবা ফর্মের মিশ্ররূপ গ্রহণের বিবর্তনের ইঙ্গিত পাই। শিল্পী কখনো প্রাকৃতিক আকারের ঋজুতা বৃদ্ধি করে, কখনো জ্যামিতির কৌণিকতাকে নম্র করে জৈব-অজৈবের বিচিত্র এক লীলা ক্ষেত্র তৈরি করেন কেন্দ্রস্থলে, যেখান থেকে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে আবে এক মনুষ্যাবয়ব। এ সবের মাধ্যমে তিনি যেন বাঙালির সংকর জাতিগত বৈশিষ্ট্য ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বিবর্তন ধারাকে আমাদের সামনে তুলে ধরেন। 'যার যার ধর্ম তার তার মেহনতী মানুষ এক কাতার' এই দৃষ্টিভঙ্গিতে শিল্পী তাঁর বিশেষ ধর্মীয় পরিচয়কেও বিস্মৃত হন না, বরং তার শ্রেষ্ঠত্বকে স্পষ্ট করে তোলেন চিত্রের মোটিফে জ্যামিতির মাত্রাকে ক্ষণে ক্ষণে বাড়িয়ে দিয়ে। বাংলায় ইসলামের গৌরব গাঁথা আর শোক, বিদ্রোহ, বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা মুসলমানের বিজয় কেতন তিনি উড়িয়ে দেন চিত্রের প্রায় সর্বত্র, তীক্ষ্ণ ত্রিভূজের প্রতীকে। বঙ্গীয় শিল্প-সংস্কৃতির আদল গঠনে ইসলামের অবদান এবং বঙ্গীয় ইসলামের বিবর্তিত রূপের প্রতিভাস রচনা করেন চিত্রের ডানদিকে সর্বশেষ কল্পিত অংশের উপরের স্থানে, সেই একই পদ্ধতিতে; ফর্ম আর মোটিফের অঙ্গ-লাবণ্যে হেরফের ঘটিয়ে। এখানে শিল্পী তাঁর স্ব-সমাজ রাজনীতি ও শিল্প-সংস্কৃতির ঐতিহ্য সম্পর্কে কিছু নিশ্চিত ধারণার কৌশলী বয়ান দেন। মসজিদ স্থাপনার খিলান এবং খিলানের স্টেইন্ড (stained) গ্লাসের দরজায় জ্যামিতিক নকশা অঙ্কন কিরে তিনি শুধু ঐতিহ্যিক শিল্প-শৈলীতে ইসলামি জ্যামিতিকতার অবদানের দিকটিকেই ইঙ্গিত করেন না, অ-জৈসনিক শৈলীতে আমাদের আধুনিক চিত্র রচনা কৌশলে য়ুরোপীয় একক অবদানের প্রচলিত ধারণাকেও প্রশ্নের সম্মুখীন করেন। আসলে এখানে আধুনিক কালের অনেক আগেই জ্যামিতিক ফরম ও তার শিল্প দর্শনের সঙ্গে বাঙালির পূর্ব পরিচয় প্রসঙ্গে নিশ্চিতির প্রমাণ দেয়াই শিল্পীর প্রকৃত উদ্দেশ্য বলে মনে হয়। প্রাকৃতিক লাবণ্য আরোপের ফলে রৈখিক ঋজুতা খর্ব হয়ে, কৌণিক তীব্রতা ভোঁতা হয়ে জ্যামিতিক ফর্মে অর্জিত হয় এক ধরণের ছান্দসিক গুণ, বিনীত মণ্ডণধর্মিতা ও গতিশীলতা। ইসলামি শিল্পকলার প্রভাবে মধ্যযুগীয় স্থাপত্য গাত্র অলঙ্করণের মিশ্র চরিত্রে মোটিফে এসব লক্ষণ অনেক (যেমন: চাঁপাই নবাবগঞ্জের ছোট সোনা মসজিদ, রাজশাহীর বাঘার মসজিদ, দিনাজপুরের কান্তজীর মন্দির, পুঠিযার রাজবাড়ির মন্দিরসমূহ)। কখনো কখনো গতিশীল জ্যামিতিক গঠন নির্ভরতায় কাইয়ুমের

সমসাময়িক আধুনিক চিত্রকলার যে গড়ন লক্ষযোগ্য, তার সূত্র যে ঐতিহ্যগত শিল্পকলার বিশেষ ক্ষেত্রে ভিন্ন মাত্রায় বিদ্যমান, সে ধারণারই যেন প্রকাশ ঘটান শিল্পী খিলানের অভ্যন্তর ভাগে আরও কিছু মিশ্র চরিত্রের ফরমের উপস্থাপনার মাধ্যমে। এই ফরমগুলি ক্রমশ আলোড়িত হতে হতে গতিশীল জ্যাকিতিকতার নমুনা হয়ে আকাশের মেঘে পরিণত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্যের অবদানকে অস্বীকার না করেও কাইয়ুম চৌধুরীর শিল্পচৈতন্য ঐতিহ্যের মর্মমূলে পৌঁছে জ্যামিতি নির্ভরতায় গড়ে ওঠা আমাদের আধুনিক চিত্রচর্চার একটা ঐতিহ্যিক পরম্পরা খুজেঁ ফিরে। এবং তা তিনি পেয়েও যান বাঙালির জাতিসত্তায় (নৃতাত্বিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি) মিশ্রণ প্রক্রিয়ার মধ্যে। তিনি মসজিদ স্থাপনার নম্রাগ্র খিলান রচনা রে বাংলার ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্য ধারায় সওয়ার হন এবং সাস্কৃতিক মিলন সূত্র ধরে বাঙালির জাতিগঠন প্রক্রিয়ায় সমস্বয়ধর্মী ধর্মনিরপেক্ষ সাংস্কৃতিক স্রোতধারার ক্রিয়াশীলতা সম্পর্কে ইঙ্গিত দেন। এই ক্রিয়াশীলতা ধর্মজ ও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াশীলতার বাধা ডিঙিয়া মধ্যযুগীয় বাঙালির সামাজিক- সাংস্কৃতিক জীবনে অপর এক নবরূপ গ্রহণের আলোড়ন তুলেছিল। ইতিহাস ও সংস্কৃতির এই সত্যকে ধারণ করে বাঙালি মননে নানা সৃজনশীলতার প্রকাশ আধুনিককালেও দেখতে পাই

এ ধারায় স্বজাত্যাভিমানী ও ইতিহাস-সচেতন শিল্পী তাঁর পঠন-পাঠন অভিজ্ঞতা অবলম্বনে ফরম আর মোটিফের যোজন-বিয়োজনের ইঙ্গিতে বাঙালির আত্মপরিচয়ের তথা জাতীয় অস্তিত্বের হিসেবটি কষেন উপনিবেশবাদ তার নিজ স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে যখন এই হিসাবটিকে খন্ডিত অথবা বিলুপ্ত করতে চায়, তখনই ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র বাঙালি জাতি তার অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনেই প্রতিবাদী হয়ে ওঠে এবং অবশেষে মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে বিজয়ী হয়। চিত্রতলের ডানদিকের নিম্নভাগে সেই প্রতিবাদী-প্রতিরোধী বাঙালিদেরই প্রতিকৃতি অঙ্কন করেন শিল্পী। বক্তব্য প্রকাশোন্মুখ দৃঢ়চেতা বিক্ষুব্ধ মুখাবয়র, বিজয়ী পতাকা এবং তার দিকে উত্তোলিত বাঙ্ময় হাত, নৌকার বৈঠা ইত্যাদি উচ্চকিত সবকিছু মুক্তিপিয়াসী বাঙালির সংগ্রামী উদ্দীপনার পরিচায়ক হয়ে চিত্রের নামকরণকে যৌক্তিক করে তুলেছে, দেখা যায়।

অনুসৃত শৈলীর দেশীয় বৈশিষ্ট্য এবং ঘটনাবলির ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত বিবেচনা করলে কামরুল হাসান (১৯২১-৮৮) এর **'অভ্যুদয়ের ক্রান্তিলগ্নে'** (চিত্র ২) চিত্রটিকেও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ইতিহাস চেতনা নির্ভর চিত্রকলার অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে। সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করেও পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর প্রভুত্ববাদী মনোভাবের কারণে ক্ষমতায় যেতে পারেনি। দ্রুত পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে শেখ মুজির ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়ে সংগ্রামের লক্ষ্য হিসেবে স্বাধীনতাকে নির্দিষ্ট করেন। তারপর ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে পাকিস্তানি হানাদারদের হাতে গ্রেফতার হওয়ার আগ মূহূর্তে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে দেন। ইয়াহিয়া-ভুট্রো-টিক্কা খানের নীল নকশা অনুযায়ী পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ২৫শে মার্চের মধ্যরাত থেকেই শুরু করে জাতি বিনাশী হত্যালীলা, যা চলতে থাকে দীর্ঘ নয় মাস ধরে। সমগ্র দেশে পাকিস্তানী হানাদেরদের এই তাণ্ডবকে শিল্পী কামরুল হাসান জান্তব আক্রমণের সঙ্গে তুলনা করেন। সম্ভবত মধ্য-সত্তরের দিকে গোয়াশ মাধ্যমে অঙ্কিত **'অভ্যুদয়ের ক্রান্তিলগ্নে'** শিরোনামের চিত্রটিতে তিনি মুক্তিযুদ্ধকালে আক্রান্ত বাংলার বিভিন্ন ঘটনার প্রকৃতি এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক কূটচালকে পশুপক্ষীর আচার-আচরণের সঙ্গে উপমিত করেছেন। চিত্রে ধূর্ত শৃগাল বা হিংস্র হায়েনার আপাত

মায়াবী চোখের পাশেই তিনি এঁকে দেন খান সেনার বিকট মুখাকৃতি। উন্মত্ত দাঁতাল বন্যহস্তী, মৃত মাংস লোভী শকুন, কাক ও পেঁচার মিশ্ররূপের এক অশুভ পাখি আর এমন এক অদ্ভুত জন্তু আঁকেন শিল্পী, যেটার দেহ বৈশিষ্ট্যে একই সঙ্গে রয়েছে শৃগাল, গাধা, ষাঁড় এবং ঘোড়ার নানা প্রত্যঙ্গের আভাস। চিত্রে শহীদানের একটি করোটিও দেখি অজস্র মৃত্যুর প্রতীক হিসেবে।

শিল্প-চেতনায় বাঙালিত্বের বৈশিষ্ট্যান্বেষী কামরুল হাসান দেশ ও সমাজের নানা বিষয় সম্পর্কে ছিলেন তীক্ষ্ণ চক্ষু, অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ। সমকাল স্বদেশ ও স্ব-সমাজের প্রত শিল্পীর দায়বদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিত কামরুল স্বদেশের মৃত্তিকা ও মানুষকে যেমন ভালবেসেছেন, তেমনি স্বকীয় শিল্প শৈলী নির্মাণে দেখিয়েছেন ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ। ঐতিহ্যের শেকড়ের স্বাধীনতা উত্তরকালেও বজায় রাখেন। সমকালীন বৈশ্বিক ভাবনা, রীতি, প্রয়োগ-ভঙ্গিমা ও শৈলীগত বিবর্তন সম্পর্কে অবহিত থাকলেও তিনি পাশ্চাত্যের অনুকরণে এমন কোনো আধুনিকতার আশ্রয় নেননি যা তাঁকে অ-শনাক্তযোগ্য করে তুলতে পারে। দৈশিক বৈশিষ্ট্যে শনাক্তযোগ্য হওয়ার জন্য তিনি বিশ্বস্ত থাকেন অতীত বাংলার পট, পাটা, লক্ষ্মীর সরা, নকশীকাথাঁ কিংবা ময়নামতি, সহাস্থানগড়, পাহাড়পুরের মৃৎফলক রূপায়ণ কৌশলের কাছে এবং আংশিক জ্যামিতিক-সংলগ্ন হওয় সত্ত্বেও মূলত জৈবনিক গুণসম্পন্নতাই তাঁর শিল্পের চরিত্রলক্ষণ। এই বিশ্বস্ততার ফলে তিনি বিশুদ্ধ ইসলামি নিরাবয়ব ও অজৈবনিক শিল্প নির্দেশনাকে পাশ কাটিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ ইহজাগতিকতাবাদী বাঙালি শিল্পী হতে পেরেছেন, যা আবার তাঁকে পাশ্চাত্য নির্বস্তুক চিত্রধারার বিপরীতেও প্রতিস্থাপিত করেছে। জ্যামিতি-জৈবনিকতায় সৃষ্ট মিশ্র ফরমের খোঁজ কামরুলের কাজের মধ্যে পাওয়া যায়। তাঁর কাজের প্রতিটি অবয়ব, ভঙ্গীমা, অলঙ্করণ ও অভিব্যক্তিগুণে বক্তব্য প্রকাশে উন্মুখ হয়ে উঠে। বিমূর্তায়িত হতে হতেও কামরুল হাসানের চিত্র কর্ম জৈবনিকতায় উচ্চকিত, সুস্পষ্ট এবং সরলতায় পূর্ণ। এ রকমই একটি চিত্রকর্ম আমাদর আলোচ্য 'অভ্যুদয়ের ক্রান্তিলগ্নে'। চিত্রটি প্রতীকী ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ এবং সম্ভবত এ ক্ষেত্রে শিল্পী তা করেছেন ঘটনার ব্যপকতা, হিংস্রতা ও জটিলতাকে সীমিত পরিসরে ব্যক্তকরণ প্রয়াসে। অবশ্য পঁচাত্তর-পূর্বকালেই মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষ, নৈতিকতার অবক্ষয় আর মুক্তিযুদ্ধোত্তর আশাভঙ্গের নিদারুণ মনঃকষ্টজনিত উষ্মার প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে তাঁর কাজের ধারায় ব্যাপকভাবে প্রতীকী মাত্রা যুক্ত হতে থাকে।

একাত্তরের ১লা মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয় কর্তৃক জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার ফলে বিক্ষুব্ধ পূর্ব-বাংলাবাসী শেখ মুজিবের ৭ই মার্চের ডাকে অসহযোগ আন্দোলনের আঙ্গিকে স্বাধীনতার পথে দৃপ্ত পদক্ষেপ নেয়। দুই পাকিস্তানের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় এবং প্রাদেশিক সরকারের সমস্ত প্রশাসনিক কাজ আওয়ামী নেতৃত্বের নির্দেশানুযায়ী চলতে থাকে। অধিকার আদায়ের সংগ্রামে বাঙালিরা যখন একদেহ একপ্রাণ হয়ে অগ্নিপরীক্ষা দিতে প্রস্তুত, যখন জনতার চোখে মুখে মুক্তির কামনা, হৃদয়ে সংগ্রামের অগ্নিশিখা, তখন প্রায় হাত ছাড়া হয়ে যাওয় পূর্বপাকিস্তানকে কব্জায় রাখতে পাকিস্তানের সামরিক শাসকগোষ্ঠী ধূর্ততার আশ্রয় নেয়। কৌশল হিসেবে অবলম্বন করে আলোচনার ছল। ১৫ই মার্চ ইয়াহিয়া খান কিছু বিশ্বস্ত অনুচর নিয়ে ঢাকায় আসেন মুজিবের সঙ্গে আলোচনার কথা বলে, ২১শে মার্চ আসেন পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলি ভুট্টো (১৯২৮-৭৮)। উদ্দেশ্য একটাই: আলোচনার নামে কালক্ষেপ করা এবং সেই ফাঁকে গোপনে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসা। এই প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে নিরস্ত্র বাঙালি জনগণের উপর সার্বিক আক্রমণের নির্দেশ দিয়ে ২৫শে মার্চ রাত্রেই ইয়াহিয়া ও পরদিন সকালে ভুট্টো স্বদেশের পথে পাড়ি জমান। অন্যান্য যে সব

পশ্চিম পাকিস্তানি নেতা আপস রফার অছিলায় ঢাকায় এসেছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই ২৪ তারিখের মধ্যেই ঢাকা ত্যাগ করেছিলেন। প্রভুদের নির্দেশে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ২৫শে মার্চ রাত থেকেই জনসাধারণের উপর পাশবিক হিংস্রতায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুরু হয়ে যায় মুক্তিযুদ্ধ।

শিল্পী কামরুল হাসান রক্তে রঞ্জিত বাংলার সবুজ প্রকৃতির প্রেক্ষাপট সংবলিত আলোচ্য চিত্রটির বামদিকে পাকিস্তানিদের এই ধূর্ততা ও হিংস্রতাকে হায়েনার স্বভাবের তুলনা করে ওই দুই প্রাণীকে পাশাপাশি উপস্থাপন করেন। অসম এই যুদ্ধে বাঙালিদের সাধারণ প্রতিরোধ সহজেই ভেঙে যায়। পাকিস্তানি ট্যাঙ্ক আর কামান অপ্রতিরোধ্য গতিতে সব কিছু গুঁড়িয়ে দিয়ে গোটা বাংলাদেশ দখল করে নেয়। শিল্পী দখলদারদের এই অগ্রযাত্রাকে তুলনা করেন উন্মত্ত বন্য হস্তীর সবকিছু লণ্ড ভণ্ড করতে করতে ভয়ঙ্কর গতিতে ছুটে চলার সঙ্গে। চিত্রের লাল সবুজের প্রেক্ষাপটটি একাধারে বাংলার সবুজ প্রাঙ্গণে রক্তের হোলি খেলা, মুক্তিযুদ্ধের বিশাল রক্তাক্ত প্রান্তর, স্বাধীনতা সূর্যোদয়ের পূর্বাভাস এবং আমাদের জাতীয় পতাকার স্মারক। মুক্তিযোদ্ধা শিল্পী কামরুল এই পতাকার আবির্ভাবের পেছনে বিভিন্ন ঘটনায় নিজে সংশ্লিষ্ট থেকে নিবিড়ভাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর দীর্ঘ নিষ্পেষণ এবং শেষ পর্যন্ত সরাসরি জল্লাদের ভূমিকা গ্রহণের ফলে ক্ষত বিক্ষত স্বদেশের করুণ রূপ তাঁর হৃদয়কে বিক্ষুব্ধ ও রক্তাক্ত করে তুলেছিল। অমঙ্গলের বার্তায় শঙ্কিত শিল্পী জুলুমবাজ দখলদারদের মধ্যে যুগপৎ পেঁচার ভয় দেখানো রূপ ও আবর্জনাভুক কুৎসিত কাকের ধৃষ্টতাকে অবলোকন করেন। অসংখ্য মৃত্যুর মাঝে ভোজনোল্লাসে মত্ত কাক, শকুনেরা যেন ঘাতকের বন্দনা গেয়ে চলেছে। এই বীভৎস পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে যে শাসকগোষ্ঠী, তাদের কাজকে শিল্পী মধ্যযুগীয় সাম্রাজ্যবাদীদের নিষ্ঠুর বর্বরতার সাথে সমান করে দেখেন। যুদ্ধবিদ্ধস্ত রূপসী বাংলার প্রতীকে চিত্রায়িত খুবলে খুবলে খাওয়া চিত্রতলে মৃত্যু, অমঙ্গল, বিভীষিকার প্রতীক করোটি, কাক-পেঁচা, শকুনের সাথে এবার তিনি সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক হিসেবে অনেকটা অশ্বাকৃতি এক মিশ্র-চতুষ্পদকে সন্নিবেশিত করেন। প্রাণীটির স্মিতহাস্য বদনে রয়েছে শেয়াল এবং গাধার সম্মিলিত আদল।

আমরা তো জানি প্রাচীন ও মধ্যযুগে এবং সাম্রাজ্য বিস্তারে শক্তিশালী ও দ্রুতগামী প্রাণী হিসেবে ঘোড়া মুখ্য ভূমিকা পালন করে সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক হয়ে আছে। ভারতে আর্য আগমনে ও আর্যধর্ম প্রসারে এবং তুর্কি ও অন্যান্য মুসলিম বীরদের ভারত জয় তথা ইসলাম ধর্ম-সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রসারে অশ্বের কার্যকারিতা ছিলো ব্যাপক। পাবলো পিকাশোর (১৮৮১-১৯৭৩) চিত্রটিতেও আমরা বর্বরতার ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধোন্মাদনার প্রতীক হিসেবে ষাঁড় এবং ঘোড়াকে ব্যবহার করতে দেখি। 'গুয়ের্নিকা'র ঘোড়া প্রবল পরাক্রমী সাম্রাজ্যবাদের সর্বগ্রাসী ভয়ঙ্কর চিৎকারের অভিব্যক্তি নিয়ে চিত্রিত হয়েছে। এটিতে রয়েছে এক ধরনের বলবীর্যের পৌরুষ-দীপ্তি, একটু ভিন্নমাত্রায় যা রয়েছে কামনা কাতর বন্য ষাঁড়টির মাঝেও। কামরুল হাসান তাঁর চিত্রে এই দুই অশুভ প্রতীককে একই প্রাণীদেহে সংস্থাপন করেছেন। জন্তুটির পায়ের দিকে তাকালেই তা বোঝা যায়। কিন্তু শিল্পী তাঁর এই নির্দিষ্ট প্রতীকী জানোয়ারের ধড়ে যে মুণ্ডটি যোগ করেন, তা একাধারে বোকা গাধা ও ধূর্ত শৃগালের মুখাবয়ব। কেন তিনি এমন করেন? এর উত্তর রয়েছে মূলত অবাঙালি নেতৃত্বে পরিচালিত পাকিস্তান আন্দোলন এবং বাঙালি মুসলমানদের তাতে দাবার ঘুঁটির মতো ব্যবহৃত হওয়ার মধ্যে। ১৯৪০-এর লাহোর প্রস্তাবে বর্ণিত একাধিক মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রস্থাপনের শর্তের বরখেলাপ, বাংলা ভাষা উচ্ছেদ করে বাঙালি জাতি চেতনা বিলোপের প্রচেষ্টা

এবং ইসলামি ভ্রাতৃত্বের নামে অবাঙালি শাসক গোষ্ঠীর উপনিবেশবাদী ও ছলচাতুরীপূর্ণ শাসন-শোষণের ইতিহাসের মধ্যেই জন্ম, ওই কিম্ভুতকিমার শৃগাল-গর্দভ ফিগারটির। ভাবটি যেন এমন, অবাঙালি মুসলমান শাসক শোষকদের শেয়ালের মতো ধূর্ততার বিপরীতে বাঙালি মুসলমানেরা গাধার মতো বোকামি করে তাদের সব কথা বিশ্বাস করেছে। অন্যদিকে, বাঙালি মুসলমানদের সরলতার বিপরীতে '৪০ সাল থেকে '৭১ সাল পর্যন্ত অবাঙালি মুসলিম এলিট শ্রেণীর নানা সময়ের কপটতাকেও শিল্পী এক ধরনের বোকামি বলে মনে করে থাকতে পারেন। এভাবে আলোচ্য চিত্রের অদ্ভূত চতুষ্পদটি পাবলো পিকাসোর 'গুয়ের্নিকা'র স্মৃতি-সূচক হলেও এটির মুখাবয়বে শিল্পী কর্তৃক গাধার আদল জুড়ে দেওয়ার শৈল্পিক কারণটি খুঁজে পেতে কষ্ট হয় না।

প্রকৃতপক্ষে সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস সচেতন শিল্পী কামরুল হাসানের দক্ষ হাতের স্বল্প ছোঁয়ার সস্তা মাধ্যমে অঙ্কিত চিত্রটি মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট ও যুদ্ধকালের দেশ ও বিশ্ব সম্পর্কে আমাদের চোখ খুলে দেয়। আমারা বুঝে নেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার জাগতিক ভিত্তিটি কোথায়। জাগ্রত বিবেক ধিক্কার জানায় পাকিস্তানি অমানবিক ক্রিয়াকলাপকে। যুদ্ধোত্তর কালেও শিল্পীমনের গহন গভীরতা থেকে উৎসরিত মুক্তিযদ্ধের চেতনা-ঋদ্ধ ইতিহাস, সংস্কৃতি ও দেশাত্মবোধ (চিত্রের মাধ্যমে এবং লোক কথার অঙ্গন থেকে প্রতীক নির্বাচনের ব্যাপারটা বিশেষ লক্ষ্যণীয় মনকে আচ্ছন্ন করে। ব্যাপক ধ্বংস, হত্যা ও ধর্ষণের ভয়াবহতার চিত্র অন্তরে অহিংসার মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করে।

কালিদাস কর্মকারের (১৯৪৬-) 'শ্রদ্ধার্ঘ-১' (চিত্র-৩) শিরোনামের ছাপচিত্রটিও (এচিং) একটি ইতিহাস চেতনা নির্ভর চিত্র। ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী চেতনার জোয়ারের কালে করা এই কাজটিতে চোখে পটি বাঁধা শরীয়তী শ্মশ্রুমণ্ডিত ফাঁসির রজ্জুধারী অবয়বটি লক্ষ্য করে অনুমান করা যায়, শিল্পী আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় বিশেষ করে মুসলমানদের আত্মত্যাগের ইতিহাসকে স্মরণ করেছেন। ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নির্ভর শাসনতন্ত্র (বাংলাদেশী) কিভাবে শিল্পী চেতনাকে প্রভাবিত করে শিল্পকর্মের ভাবসম্পদকে এক রৈখিক করে তুলতে পারে আলোচ্য চিত্রটি তারও এক প্রজ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। চিত্রটির বিষয় উপাদান চিহ্নিত করতে গিয়ে দেখি মুখাবয়ের পেছনে বাঁশ আর লোহা দিয়ে গড়া বাঁশের কেল্লার এক দেয়াল, দেয়ালের উপরে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদনরত একটি পাখি (এটি শিল্পীর 'মন' পাখি এবং ছবির শিরোনামের কারণ), নিচের আয়তক্ষেত্রে শাসন নির্যাতনের প্রতীক রাজকীয় পিস্তল এবং ত্রিভুজক্ষেত্রে পিন্ডাকৃতি মানব ভ্রুণ, যেমন বিদ্রোহ আর বিপ্লবের জঠরে বেড়ে উঠতে থাকা আমাদের স্বাধীনতা। এইসব বিষয় উপাদানকে নির্ভর করে শিল্পী মূলত কোম্পানি আমলে শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে ভারত তথা বাংলায় আন্দোলন, বিদ্রোহ ও তার পরিণামের ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে যায় পূর্ববঙ্গে হাজি শরিয়ত উল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০) এবং তাঁর ছেলে দুদু মিয়ার (১৮১৯-৬২) নেতৃত্বাধীন ফারায়েজি আন্দোলনের কথা। আর ধারাবাহিকতার সূত্র ধরে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন বলে কথিত সিপাহি বিদ্রোহের (১৮৫৭) প্রসঙ্গটিও এখানে বিশেষভাবে মনে আসে।

বিট্রিশ পদাবনত বাংলায় সর্বদিক দিয়ে বিপর্যস্ত মুসলিম সমাজে পুনর্জীবন আনয়নে ফারায়েজি আন্দোলন ভূমিকা রাখে। ইংরেজ বিতাড়ণের পাশাপাশি মুসলমানদেরকে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে সচেতন কওে তোলার লক্ষে সংগঠিত ফারায়েজি আন্দোলন কৃষক স্বার্থকে সামনে নিয়ে এসে জমিদার ও নীলকরদেও বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গেও তিতুমীর (মীর নিসার আলী) কলকাতার কাছে নারিকেল বাড়িয়ায় একটি বাঁশের

কেল্লা নির্মাণ করেছিলেন। তিনি দেশে স্বেচ্ছাচার ও অত্যাচারমূলক শাসন নির্মূল করে একটি আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র কায়েমের ঐকান্তিক বাসনায় ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে মৃত্যবরণ করেন (১৮৩১)। তাঁর সেনাপতি মাসুম খাঁ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং ধৃত অন্যান্য অনুচর ইংরেজের জেল জুলুম সহ্য করেন। তিতুমীরের আপাত বিফল স্বাধীনতা সংগ্রাম পরবর্তীকালের সংগ্রামে (১৮৫৭) প্রেরণা যুগিয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের ব্যরাকপুরে সর্বপ্রথম সংঘটিত 'সিপাহী বিদ্রোহ' তাঁর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক কারণগুলির উপর ভর করে সর্বভারতে (বিশেষ করে উত্তর ভারতে) বিস্তৃতি লাভ করেছিল; ব্রিটিশ তখত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। সামাজিক অসন্তোষের কারণগুলির সুবাদেই এই বিদ্রোহের পক্ষে-বিপক্ষে ব্যাপক হারে জনসম্পৃক্তি ঘটে (বিদ্রোহের প্রেক্ষিতে সরকারের নিকট সুধী সমাজের বিভিন্ন নিবেদনের সূত্র ধরে এই কথা বলা যায়) এবং এই জন্যে কার্যত ব্যর্থ এই মহা বিদ্রোহ ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম হিসেবে পরিগণিত হয়। ইংরেজ বিতাড়নের উদ্দেশ্যে পরিচালিত এই বিপ্লব ভারতীয়দের জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের পথে এক বিরাট শিক্ষা ছিল। শিল্পী কালিদাস কর্মকার মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের বিপ্লবী ঐতিহ্যে উপরোক্ত ঘটনাবলিকে স্থান দিতে চান। বিশেষ করে তিনি সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করেন শহীদ তিতুমীরের বীরত্বব্যঞ্জক ভূমিকার কথা। শিল্পী আলোচ্য 'শ্রদ্ধার্ঘ-১' চিত্রটিতে ইঙ্গিতের মাধ্যমে বাঙালি জাতির বিপ্লবী ইতিহাসের এই বিশেষ পর্বটি দর্শকের সামনে তুলে ধরেছেন।

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চিত্রাবলীতে বাঙালি জাতির গঠন বৈশিষ্ট্য, জাতীয় সংস্কৃতির অসাম্প্রদায়িক চরিত্র, বাঙালির বীরত্বের ইতিহাস, শিল্পচর্চার পরম্পরা ইত্যাদি বিষয় মুক্তির সংগ্রামনির্ভর বিষয়-উপাদানকে অবলম্বন করে রূপক প্রতীকের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। জৈবনিক, জ্যামিতিক-জৈবনিক মিশ্র আকৃতি-প্রকৃতির মধ্য দিয়ে আরও প্রকাশিত হয় উপনিবেশবাদী উৎপীড়ন আর বাঙালির আত্মত্যাগের ইতকথা। পূর্ববাংলার স্বাধীনতাকামী বাঙালি জাতিসত্তাকে নির্মূল করার অপচেষ্টায় পাকিস্তানিদের দ্বারা পরিচালিত গণহত্যা, নির্যাতন, ধ্বংসযজ্ঞের ঘটনাকে বিষয় করে অনেক শিল্পী ছবি এঁকেছেন। আঙ্গিক ও ভাবগতভাবে মূর্ত-বিমূর্তের দ্বান্দ্বিকতার মধ্য দিয়েও বাস্তব ঘটনার ব্যাপকতা ও শিল্পীর অন্তর্জ্বালা অভিব্যক্ত হয়েছে এসব চিত্রে। জন্মভূমিকে মাতৃজ্ঞান করে দেশ জননীর বিপর্যস্ত অবস্থাকে ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পীকুল তাঁদের চিত্রপটে।

আসলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপক্ষে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক সন্ত্রাস সত্ত্বেও বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ এমন একটি অনুষঙ্গ দেশের সমাজ জীবনে যোগ করেছে যে তার প্রভাবকে পুরোপুরি মুছে ফেলা কখনও সম্ভব নয়। তাই দেখা যায় ভাষাশিল্পের মতোই চিত্রকলাও বাস্তব-অর্ধবাস্তব রীত্যানুগত্যে, কখনো রূপক প্রতীকের ব্যঞ্জনায় এই বিষয়টি শিল্পীর চিত্রপটে সগৌরবে উপস্থিত হয়েছে।

চিত্র নং ১ : প্রতিবাদ

চিত্র নং ২ : অভ্যুদয়ের ক্রান্তিলগ্নে

চিত্র নং ৩ : শ্রদ্ধার্ঘ

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, সপ্তদশ সংখ্যা ১৪১৬

পাবনা জেলার হাদল-কালিকাপুর এলাকায় গণহত্যা

মো. আতাউর রহমান*

Abstract: The liberation war of 1971 is the most important event in the national history of Bangladesh. The Pakistani Army with the collaboration of *Razakar, Al-Badr, At-Shams* and Members of the Peace Committee, massacred in everywhere in the then East Pakistan. In this article the author tried to explore the cruel events of genocide that took place in Hadal-Kalikapur area under the district of Pabna on 8th may 1971.

পটভূমি

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির জীবনে একটি বিরল, ব্যতিক্রমধর্মী, অবিস্মরণীয় ও শ্রেষ্ঠ ঘটনা। ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪'র নির্বাচন, ১৯৫৮'র সামরিক আইন জারি, ১৯৬৬'র আওয়ামী লীগের ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৬৯'র গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭০'র সাধারণ নির্বাচনের ধারাবাহিকতায় বাঙালি জাতির স্বাধিকার আন্দোলনের যে প্রকাশ ঘটেছিল, ১৯৭১ সালের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ তারই চূড়ান্ত অধ্যায়। এখানে সংগ্রাম বা যুদ্ধ শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্যে সংঘটিত হয়নি। বরং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন ও সামগ্রিক মুক্তি লাভই ছিল অভীষ্ট লক্ষ্য।[১]

বাঙালি জাতির হাজার বছরের ইতিহাসে গৌরবদীপ্ত অর্জন ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ। বাঙালি জাতির সংগ্রামের ইতিহাস পলাশী যুদ্ধের পর থেকেই শুরু হয়। তবে বাঙালি জাতির জীবনে মুক্তিযুদ্ধের ন্যায় জনযুদ্ধের দ্বিতীয় নজির আর নেই। পলাশীর যুদ্ধে যে বাঙালি দর্শকের ভূমিকা নিয়েছিল, একাত্তরে তারাই প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশ নেয় পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হবার আকাঙ্ক্ষায়।[২]

ইতিহাস জাতির দর্পণ। কিন্তু দুঃখের বিষয় পাক-ভারতের ইতিহাসে বাঙালি জাতির এবং বাঙালির সংগ্রামকে যথাযথভাবে তুলে ধরা হয়নি। ১৯৭০-এর সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা (১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি) অর্জন করলেও তাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়ার নির্দেশে পাক-সেনারা ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চ গভীর রাতে অতর্কিতে নিরীহ, নিরস্ত্র বাঙালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং

---

* ড. মো. আতাউর রহমান, সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যাল, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

[১] *গৌরবের ৫৫ বছর স্মারকগ্রন্থ, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ* (ঢাকা: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ২০০৪), পৃ. প্রসঙ্গকথা ও পৃ. ১১৮।

[২] *মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ* : প্রথম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, এপ্রিল, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৮৬।

নির্বিচারে হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ এবং নারী নির্যাতন করে। প্রাণ ভয়ে প্রায় এক কোটি বাঙালি ভারতের বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয়। এছাড়া যারা ভারতে যেতে পারেনি তারা শহর বন্দর ছেড়ে আত্মীয়-স্বজন কিংবা পরিচিতদের কাছে প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলে গিয়ে আশ্রয় নেয়। হত্যাযজ্ঞ থেকে রক্ষা করার জন্যে বিডিআর, আনসার, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সাথে তরুণ যুবকেরা সংগঠিত হয়ে এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ক্যাম্প থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করে। সেই মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষ নেয় মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলামী, আল-বদর, আল-শামস্ ইত্যাদি নামের সংগঠন। তারা নিরীহ বাঙালিকে মুক্তিযোদ্ধা বলে পাক-সেনাদের ডেকে এনে বাংলাদেশের সমগ্র এলাকায় তাদের উপর যে ধ্বংসলীলা চালায় তারই ধারাবাহিকতায় পাবনা জেলার ফরিদপুর উপজেলার হাদল-কালিকাপুর গ্রামের গণহত্যার করুণ চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধে। এক্ষেত্রে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় লোকদের সাক্ষাৎকারকেই প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

২৫শে মার্চের পর সারা দেশে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ১৯৭১ সালে ৯ এপ্রিল টিক্কা খাঁনের নির্দেশে পাকিস্তানের প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী, খাজা খয়ের উদ্দিনকে আহবায়ক করে গোলাম আজমসহ অন্যান্যদের নিয়ে ১৪০ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠিত হয় যা "ঢাকা নাগরিক শান্তি কমিটি" নামে আত্মপ্রকাশ করে এবং তাদের কাজের সুবিধার্থে ১৪ই এপ্রিল নাগরিক শান্তি কমিটির নাম পরিবর্তন করে "পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি" নাম রাখে। পরবর্তীতে এই কমিটি সারা দেশের প্রতিটি জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে তথাকথিত শান্তি কমিটি গঠন করে। এই শান্তি কমিটির মুষ্টিমেয় সদস্য ছাড়া অধিকাংশই ছিল স্বার্থবাদী ও পাকবাহিনীর সহযোগী আল-বদর, আল- শামস্ ও রাজাকার। যাদের লোলুপ দৃষ্টি ছিলো প্রত্যন্ত গ্রামে আশ্রিত শহর থেকে আগত বিত্তশালী ব্যক্তিদের আনিত স্বর্ণালংকার ও অন্যান্য অর্থ-সম্পদের প্রতি। হাদল-কালিকাপুর অঞ্চলে যে শান্তি কমিটি গঠিত হয় তা ছিল ২০ সদস্যবিশিষ্ট। এই বিবরণ পাওয়া গেছে গ্রামের নির্যাতিত ও সাধারণ জনগণের সাক্ষাৎকারে।

হাদল-কালিকাপুর শান্তি কমিটির সদস্যদের নামের তালিকা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	ঠিকানা
১.	মওলানা আবুল হাসান	সভাপতি	হাদল, ফরিদপুর, পাবনা।
২.	মোঃ লইমুউদ্দিন প্রাং	সম্পাদক	বালুঘাটা, ফরিদপুর, পাবনা।
৩.	মওলানা আজিজুল হক	সদস্য	হাদল, ফরিদপুর, পাবনা।
৪.	মোঃ সাদেক মোল্লা	সদস্য	হাদল, ফরিদপুর, পাবনা।
৫.	মোঃ মিনাজ প্রাং	সদস্য	কালিকাপুর, ফরিদপুর, পাবনা।
৬.	মোঃ আজিজুর হক মোল্লা	সদস্য	হাদল, ফরিদপুর, পাবনা।
৭.	মোঃ আহেদ আলী প্রাং	সদস্য	হাদল, ফরিদপুর, পাবনা।
৮.	মোঃ আব্দুল রহিম মোল্লা	সদস্য	হাদল, ফরিদপুর, পাবনা।
৯.	মোঃ রজব আলী প্রাং	সদস্য	হাদল, ফরিদপুর, পাবনা।
১০.	মোঃ কেফাতুল্লাহ খাঁন	সদস্য	হাদল, ফরিদপুর, পাবনা।
১১.	ডাঃ মোঃ আবু জাফর	সদস্য	হাদল, ফরিদপুর, পাবনা।
১২.	মোঃ রিয়াজুউদ্দীন প্রাং	সদস্য	হাদাল, ফরিদপুর, পাবনা।
১৩.	মওলানা রোস্তম হাদুলী	সদস্য	হাদল, ফরিদপুর, পাবনা।
১৪.	মসলেম আনাসারী	সদস্য	হাদল, ফরিদপুর, পাবনা।
১৫.	মোঃ মুজিবর রহমান	সদস্য	মষিয়ামুরা, ফরিদপুর, পাবনা।
১৬.	মওলানা আলাউদ্দিন	সদস্য	ধানুয়াঘাটা, ফরিদপুর, পাবনা।

১৭.	মোঃ আব্দুল গণি	সদস্য	খেতাবাঘা, ফরিদপুর, পাবনা।
১৮.	মওলানা ইয়াকুব আলী	সদস্য	হাদল, ফরিদপুর, পাবনা।
১৯.	মওলানা আবুল কাশেম	সদস্য	পার্শ্বডাঙ্গা, চাটমোহর, পাবনা
২০.	মোঃ ওবাহ খাঁন	সদস্য	হাদল, ফরিদপুর, পাবনা।

৭০-এর দশক পর্যন্ত হাদল-কালিকাপুর ছিলো হিন্দুপ্রধান বা হিন্দু অধ্যুষিত। এ গ্রামে বাস করতো প্রভাবশালী হিন্দু জমিদার পরিবার। ২৫শে মার্চ ঢাকা শহরে পাক বাহিনীর যে বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞ শুরু করে তার পরপরই পাবনা শহরের বিভিন্ন জায়গায় পাক হানাদার এসে পৌঁছে এবং একইভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে বর্বর হামলা ও লুটতরাজ শুরু করে।[৩] এই সময় পাক সেনারা বিশেষ করে হিন্দু ও মুক্তিবাহিনীর উপর আক্রমণ ও হত্যাযজ্ঞ চালায়। এহেন পরিস্থিতিতে পাবনা শহর থেকে উত্তর-পূর্বে ২৫ কিলোমিটার দুরে এক প্রত্যন্ত এলাকা হাদল-কালিকাপুরে বেশ কিছু বিত্তশালী পরিবার এসে তাদের আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করে। আর যাদের আত্মীয়স্বজন ছিল না তারা গোয়ালগাঁ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। এ সময় শহর থেকে আগত লোকসংখ্যা আনুমানিক ১০/১২শোর মতো। পাবনা শহর ও বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত পরিবারগুলোর কাছে ছিলো প্রচুর স্বর্ণালংকার, টাকা-পয়সা ও অন্যান্য সম্পদ। এই সকল সম্পদ দেখে কিছু সংখ্যক স্বার্থবাদী ও লোভী লোকের লোলুপ দৃষ্টি পড়ে এবং তারা বিভিন্নভাবে ষড়যন্ত্র করতে থাকে। আর এ স্বার্থবাদী মহল যখন সহজে এ আশ্রিত মানুষের অর্থ-সম্পদ কুক্ষিগত করতে পারছিল না তখন তারা পাক-বাহিনীকে এ সকল আশ্রিত বিত্তশালী লোকদের কথা জানিয়ে দেয় এবং বলে যে, হাদল-কালিকাপুর এলাকায় মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প রয়েছে।

অতঃপর পাক-হানাদারদের প্রায় ৩০০ সদস্য বড়াল-ব্রিজ স্টেশন থেকে ৭/৮ কিলোমিটার দক্ষিণে হাদল-কালিকাপুর এলাকায় আসে ৮ই মে, বাংলা ৯ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার। তারা প্রথমে তাদের সহযোগীদের নিয়ে রাতে সারা গ্রামটাকে ঘিরে ফেলে এবং ভোর বেলা অপারেশন শুরু করে। তাদের এই হত্যা, লুট, ধর্ষণ বেলা ১১টা পর্যন্ত চলতে থাকে। তারা শুধু হত্যা, লুট, ধর্ষণ করেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা সমস্ত এলাকা অগ্নিসংযোগ করে এবং এক পর্যায়ে পাক-সেনাদের সহযোগী বাহিনী গ্রামের মধ্যে যে সকল হিন্দু যুবতি ছিল তাদের ধরে এনে পাক-সেনাদের কাছে তুলে দেয়। পাক-সেনারা এ সকল মহিলাদের অলংকার ছিনিয়ে নেয় এবং তাদের কলেমা পড়ে মুসলমান হতে বলে এবং এ সময়ে সুন্দরী মহিলাদের নিকা করার জন্য রাজাকারদের নির্দেশ দেয়। কিছু কিছু হিন্দু মহিলা ও পুরুষ ঐ সময় প্রাণের ভয়ে মুসলমান হয় তবে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে তারা নিজেদের ধর্মে ফিরে যায়।[৩]

---

[৩] চৌধুরী মহাম্মদ বদরুদ্দোজা *জিলা পাবনার ইতিহাস* (পাবনা, ১৯৮৬), পৃ. ১৫১।

[৩] সাক্ষাৎকার :

(১) সুধীর চন্দ্র সরকার (৭৮) কালিকাপুর, ফরিদপুর, পাবনা, প্রত্যক্ষদর্শী।
(২) শ্রী বৈধ্যনাথ ডাক্তার (৬৫) মির্জাপুর, পাবনা, প্রত্যক্ষদর্শী।
(৩) শ্রী স্বপন কুমার সাহা (পলান) (৪৭), কালিকাপুর, ফরিদপুর, পাবনা, প্রত্যক্ষদর্শী।
(৪) শ্রী অশ্বিনী কুমার সাহা (৫৫), হাদল, পাবনা, প্রত্যক্ষদর্শী।
(৫) মোহাম্মদ আলী মোল্লা (৬০), সিনিয়র হেল্‌থ অফিসার, ফরিদপুর, পাবনা, প্রত্যক্ষদর্শী।

পাক-হানাদার বাহিনীর হাতে ঐ দিন হাদল-কালিকাপুর গ্রামে যারা শহীদ হয়েছিল তাদের মুষ্টিমেয় কজন ছাড়া অধিকাংশেই ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক । তাদের তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো:[৪]

১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের তালিকা

ক্রমিক নং	শহীদের নাম	স্বামী/পিতার নাম	ঠিকানা ও শহীদ হওয়ার তারিখ
১.	শহীদ বাবু বটকৃষ্ণ সাহা	মৃত- হারান চন্দ্র সাহা	হাদল, ফরিদপুর,পাবনা, ৯ই জৈষ্ঠ্য, ১৯৭১
২.	শহীদ তারাপদ সাহা	মৃত-শ্রীনাথ সাহা	কালিকাপুর, ফরিদপুর, পাবনা ঐ
৩.	শহীদ উপেন্দ্রনাথ সাহা	মৃত-রসিকলাল সাহা	কালিকাপুর, ফরিদপুর, পাবনা ঐ
৪.	শহীদ সুরোথ চন্দ্র সাহা (এস.এস.সি পরীক্ষার্থী)	মৃত-উপেন্দ্রনাথ সাহা	কালিকাপুর, ফরিদপুর, পাবনা ঐ
৫.	শহীদ কল্যাণী বালা সাহা	মৃত- গিরিন্দ্রনাথ সাহা	কালিকাপুর, ফরিদপুর, পাবনা ঐ
৬.	শহীদ শ্রীপদ সাহা	মৃত-শ্রীনাথ সাহা	হাদল,ফরিদপুর, পাবনা ঐ
৭.	শহীদ বাদল চন্দ্র সাহা	মৃত-কালাইলাল সাহা	হাদল, ফরিদপুর, পাবনা, ঐ
৮.	শহীদ পদ সাহা	মৃত- মুকুন্দ মহরি	হাদল, ফরিদপুর, পাবনা ঐ
৯.	শহীদ প্রিয়নাথ হালদার	মৃত-তারকনাথ হালদার	কালিকাপুর, ফরিদপুর, পাবনা ঐ
১০.	শহীদ হারান হালদার	মৃত-নফর চন্দ্র হালদার	কালিকাপুর, ফরিদপুর, পাবনা ঐ
১১.	শহীদ বিশ্বনাথ হালদার	মৃত-তারাকানাথ হালদার	কালিকাপুর, ফরিদপুর, পাবনা ঐ
১২.	শহীদ বিষ্ণু পদ সাহা **(এসএসসিপরীক্ষার্থী)	মৃত-বাদল সাহা	হাদল, ফরিদপুর, পাবনা ঐ
১৩.	শহীদ কুদুদীনি হালদার	মৃত-সৃষ্টি হালদার	কালিকাপুর, ফরিদপুর, পাবনা ঐ
১৪.	শহীদ মধুসুদন সাহা	মৃত- বিপেন সাহা	কালিকাপুর, ফরিদপুর, পাবনা ঐ
১৫.	শহীদ সুবল সাহা	মৃত- তারাপদ সাহা	কালিকাপুর, ফরিদপুর, পাবনা ঐ
১৬.	শহীদ বিনয়চন্দ্র সাহা	মৃত বিপেল বিহারী	কালিকাপুর, ফরিদপুর, পাবনা ঐ
১৭.	শহীদ পরেশ চন্দ্র সাহা	মৃত- শিব নাথ	কালিকাপুর, ফরিদপুর, পাবনা ঐ
১৮.	শহীদ নিরোদ হালদার	মৃত-নিমাই হালদার	কালিকাপুর, ফরিদপুর, পাবনা ঐ
১৯.	শহীদ নিমাই হালদার	মৃত-অনাথ হালদার	কালিকাপুর, ফরিদপুর, পাবনা ঐ
২০.	শহীদ বাদল সাহা	মৃত- করুণা চন্দ্র সাহা	কালিকাপুর, ফরিদপুর, পাবনা ঐ
২১.	শহীদ সমতোষ সাহা	মৃত- গোপেশ্বর সাহা	কালিকাপুর, ফরিদপুর, পাবনা ঐ
২২.	শহীদ মুংলা শীল	অজ্ঞাত	হাদল, ফরিদপুর, পাবনা ঐ

[৪] সাক্ষাৎকার :

(১) শ্রী নিধরমোহন সাহা (৭৬), গোপালপুর, পাবনা, শহীদ কমলকৃষ্ণের প্রত্যক্ষদর্শী।
(২) শ্রী লক্ষীনারায়ণ সাহা (৬১), শিক্ষক, সেলিম নাজির উচ্চ বিদ্যালয়, পাবনা, প্রত্যক্ষদর্শী ।
(৩) মোঃ কেফাতুল্লাহ খান (৬০) শিক্ষক, গোয়ালগাঁ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।
(৪) শ্রী সুবুত চন্দ্র সাহা (৭৬), শহীদ রাধাল্লভের ছেলে, শালগারীয়া, পাবনা, প্রত্যক্ষদর্শী ।
(৫) সুধীর চন্দ্র সরকার (৭৮) কালিকাপুর, ফরিদপুর, পাবনা, প্রত্যক্ষদর্শী ।
(৬) শ্রী বৈধ্যনাথ ডাক্তার (৬৫) মির্জাপুর, পাবনা, প্রত্যক্ষদর্শী।
(৭) মোহাম্মদ আলী সরকার (৬৪), শিক্ষক, খেতাবাঘা, প্রাথমিক বিদ্যালয়, প্রত্যক্ষদর্শী ।
(৮) মোহাম্মদ আলী মোল্লা (৬০), সিনিয়র হেল্থ অফিসার, ফরিদপুর, পাবনা, প্রত্যক্ষদর্শী ।
(৯) শ্রীমতি স্বপ্নারানী সাহা (৫৫), শালগারীয়া, পাবনা, প্রত্যক্ষদর্শী।
(১০) মোছাঃ জ্যোসনা বেগম (৫০), হাদল, সরকারপাড়া, পাবনা, প্রত্যক্ষদর্শী।
(১১) প্রফেসর অরুন কুমার বসাক, (৫৯) পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

২৩.	শহীদ শৈলেশ্বর সরকার	মৃত- পন্ডিত রামলাল সঃ	কালিকাপুর, ফরিদপুর, পাবনা ঐ
২৪.	শহীদ কমলরাণী হালদার	মৃত-স্বামী সৃষ্টি হালদার	কালিকাপুর, ফরিদপুর, পাবনা ঐ
২৫.	শহীদ সীতানাথ সাহা	মৃত-যুধিষ্টির সাহা	কালিকাপুর, ফরিদপুর, পাবনা ঐ
২৬.	শহীদ সমর চন্দ্র সাহা	মৃত- সীতা নাথ সাহা	কালিকাপুর, ফরিদপুর, পাবনা ঐ
২৭.	কুমারী চম্পারাণী (ধর্ষিতা)*	মৃত- গৌড়নাত সাহা	কালিকাপুর, ফরিদপুর, পাবনা ঐ
২৮.	শহীদ টেংরা সরকার	মৃত- কাঙ্গালী সরকার	কালিকাপুর, ফরিদপুর, পাবনা ঐ
২৯.	শহীদ অমর হালদার	মৃত-বনমালী হালদার	কালিকাপুর, ফরিদপুর, পাবনা ঐ
৩০.	শহীদ বান্টু হালদার	মৃত-বনমালী হালদার	কালিকাপুর, ফরিদপুর, পাবনা ঐ
৩১.	শহীদ বনমালী হালদার	মৃত-রামলাল হালদার	কালিকাপুর, ফরিদপুর, পাবনা ঐ
৩২.	শহীদ মাখন লাল হালদার	মৃত-মধুচরণ হালদার	কালিকাপুর, ফরিদপুর, পাবনা ঐ
৩৩.	শহীদ রাণী মহামায়া সাহা	মৃত-প্রশনজিৎ সাহা	কালিকাপুর, ফরিদপুর, পাবনা ঐ
৩৪.	শহীদ বাবু গোবিন্দ সাহা	মৃত-	কালিকাপুর, ফরিদপুর, পাবনা ঐ
৩৫.	শহীদ সুবাসীনি হালদার	স্বামী জগেন্দ্রনাথ হালদার	কালিকাপুর, ফরিদপুর, পাবনা ঐ
৩৬.	শহীদ অমলেন্দ্রনাথ সাহা	মৃত- উপেন্দ্রনাথ সাহা	কালিকাপুর, ফরিদপুর, পাবনা ঐ
৩৭.	শহীদ অঞ্জলীরাণী হালদার	মৃত- বানেশ্বর হালদার	কালিকাপুর, ফরিদপুর, পাবনা ঐ
৩৮.	শহীদ কানাই হালদার	মৃত-গোড়া হালদার	কালিকাপুর, ফরিদপুর, পাবনা ঐ
৩৯.	শহীদ কর্ণ হালদার	মৃত-গোড়া হালদার	কালিকাপুর, ফরিদপুর, পাবনা ঐ
৪০.	মাধব সাহা	অজ্ঞাত	কালিকাপুর, ফরিদপুর, পাবনা ঐ
৪১.	শহীদ হরি হালদার	অজ্ঞাত	কালিকাপুর, ফরিদপুর, পাবনা ঐ
৪২.	শহীদ লক্ষ্মী হালদার	স্বামী কালিপদ	কালিকাপুর, ফরিদপুর, পাবনা ঐ
৪৩.	শহীদ গোরা হালদার	অজ্ঞাত	কালিকাপুর, ফরিদপুর, পাবনা ঐ
৪৪.	শহীদ দুলাল চন্দ্র সাহা	অজ্ঞাত	কালিকাপুর, ফরিদপুর, পাবনা ঐ
৪৫.	শহীদ দেবেন চন্দ্র সাহা	অজ্ঞাত	কালিকাপুর, ফরিদপুর, পাবনা ঐ
৪৬.	শহীদ কালিদাস সাহা	স্বামী সুরেশ চন্দ্র	চাটমোহর, পাবনা, ঐ
৪৭.	শহীদ কৃষ্ণ চন্দ্র শীল		ইদিলপুর, পাবনা, ঐ
৪৮.	শহীদ মনা সাহা	মৃত- সাধুচরণ সাহা	ঈশ্বরদী, পাবনা, ঐ
৪৯.	শহীদ হাবিবুর রহমান	মৃত- গাছি	হাদল, ফরিদপুর, পাবনা, ঐ
৫০.	শহীদ মনিন্দ্রনাথ সাহা	মৃত-বিধুভষণ সাহা	পার্শ্বডাঙ্গা, পাবনা, ঐ
৫১.	শহীদ সমর সাহা	মৃত- কালিকুমার সাহা	শ্রীপুর, পাবনা, ঐ
৫২.	শহীদ বিশ্বনাথ সাহা	মৃত ললিত মোহন সাহা	মালঞ্চি, পাবনা,ঐ
৫৩.	শহীদ অরুন কুমার সাহা	করুনাকান্ত সাহা	হাদল, ফরিদপুর, পাবনা, ঐ
৫৪.	শহীদ অনীল বসাক	মৃত- বলরাম বসাক	ছোট শালগারীয়া, পাবনা, ঐ
৫৫.	শহীদ বিশ্বনাথ বসাক	মৃত- অনীল বসাক	ছোট, শালগারিয়া, পাবনা, ঐ
৫৬.	শহীদ বলরাম বসাক	মৃত-অনীল বসাক	ছোট শালগারীয়া, পাবনা,ঐ
৫৭.	শহীদ অশোক কুমার বসাক	মৃত-খিরধ কুমার বসাক	ছোট, শালগারীয়া, পাবনা, ঐ
৫৮.	শহীদ গোপাল বসাক	মৃত-অনীল বসাক	ছোট শালগারীয়া, পাবনা, ঐ
৫৯.	শহীদ সুরেশ চন্দ্র সাহা	মৃত-জাদর চন্দ্র সাহা	ছোট শালগারীয়া, পাবনা, ঐ
৬০.	শহীদ কালিদাস সাহা	মৃত-বংশীধর	ছোট শালগারীয়া পাবনা, ঐ
৬১.	শহীদ জগদিশ	মৃত- বংশীধর	ছোট শালগারীয়া পাবনা, ঐ
৬২.	শহীদ মাখন চন্দ্র সাহা	মৃত- ঝাড়া চন্দ্র সাহা	জোড়, বাংলা,পাবনা ঐ
৬৩.	শহীদ রাখবল্লভসাহা (প্রাক্তন কমিশনার, পাবনা)	মৃত- জগবন্ধু সাহা	ছোট শালগারীয়া পাবনা, ঐ
৬৪.	শহীদ মধুসূধন দত্ত	মৃত-রাখারাথ দত্ত	ছোট শালগারীয়া, পাবনা, ঐ

৬৫.	শহীদ খিরধ কুমার বসাক	মৃত-নিধর কুমার সাহা	ছোট শালগারীয়া, পাবনা, ঐ	৩৫
৬৬.	শহীদ খিরধ কুমার বসাক	মৃত- নিধর কুমার সাহা	ছোট শালগারীয়া, পাবনা ঐ	৪৫
৬৭.	সুরেন্দ্রনাথ সাহা	মৃত- রাধামাধন সাহা	দিলালপুর, পাবনা, ঐ	৫৫
৬৮.	শহীদ মনিন্দ্রনাথ সাহা	মৃত- রাধামাধন সাহা	গোপালপুর, পাবনা, ঐ	৬৫
৬৯.	শহীদ জ্যোজিময় চন্দ্র	মৃত- নিত্যানান্দ চন্দ্র সাহা	গোপালপুর,পাবনা, ঐ	৭৫
৭০.	শহীদ সুরেশ সাহা	মৃত- নিত্যানান্দ সাহা	জয়কালী বাড়ী, পাবনা, ঐ	৪৫
৭১.	শহীদ শ্যাম মোহন চক্রবর্তী	মৃত- রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	শালগারীয়া, পাবনা, ঐ	৪৫
৭২.	শহীদ রবিন্দ্রনাথ সাহা**	মৃত- নিত্যানন্দ সাহা	দিলালপুর, পাবনা, ঐ	৩৫
৭৩.	শহীদ রায়-চরণ হালদার	মৃত-ত্রৈলোক্যনাথ	গোপালনগর, ফরিদপুর, পাবনা, ঐ	৫৫
৭৪.	শহীদ বজ্রেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	মৃত-রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	শালগারীয়া, পাবনা, ঐ	৫৫
৭৫.	শহীদ লক্ষীকান্ত সরকার	শৈলশ্বর সরকার	হাদল, ফরিদপুর, পাবনা, ঐ	৩৫
৭৬.	শহীদ কমলা হালদার	মৃত-তুষ্টলাল হালদার	হাদল, ফরিদপুর, পাবনা, ঐ	৪৫
৭৭.	শহীদ ভবেশ চক্রবর্তী	মৃত- অনাদিবন্ধু চক্রবর্তী	শালগারীয়া, পাবনা, ঐ	৫৫
৭৮.	শহীদ যতিনময় সাহা	মৃত-বাবু নিতাই চন্দ্র সাহা	দিলাপুর, পাবনা, ঐ	৬৫
৭৯.	শহীদ পলাল সাহা	অজ্ঞাত	সজনাই, পার্শ্বডাঙ্গা, পাবনা, ঐ	৫৫
৮০.	শহীদ লিখিলচন্দ্র সাহা	মৃত-নিবারনচন্দ্র সাহা	পার্শ্বডাঙ্গা, পাবনা, ঐ	৬৫
৮১.	শহীদ অশোক কুমার চক্রবর্তী	মৃত- শ্যামমোহন চক্রবর্তী	শালগারীয়া, পাবনা, ঐ	৫৫
৮২.	শহীদ কালিপদ সাহা	মৃত- ললিতমোহন সাহা	শালগারীয়া, পাবনা, ঐ	০৪
৮৩.	শহীদ মনিবসাক	মৃত-অনীল বসাক	শালগারীয়া, পাবনা, ঐ	৫৪
৮৪.	শহীদ প্রাণকৃষ্ণ সাহা **	অজ্ঞাত	শালগারীয়া, পাবনা, ঐ	২৪
৮৫.	শহীদ গোপাল সাহা	মৃত- সুধীর কুমার সাহা	শালগারীয়া পাবনা, ঐ	৩৪
৮৬.	শহীদ জগন্নাথ সাহা	শ্রী সুধীরকুমার সাহা	শালগারীয়া, পাবনা, ঐ	৪৪
৮৭.	শহীদ বাবু চন্দ্র সাহা **	শ্রী সুধীরকুমার সাহা	শালগারীয়া, পাবনা, ঐ	৯৪
৮৮.	শহীদ বৈদ্যনাথ সাহা	অজ্ঞাত	পাথরতলা, দিলালপুর, পাবনা, ঐ	৬৪
৮৯.	শহীদ গোবিন্দ্র চন্দ্র সাহা **	মৃত-রাধা চন্দ্র সাহা	হাদল, ফরিদপুর, পাবনা ঐ	৮৪
৯০.	শহীদ অজিত কুমার সাহা	মৃত- রজনীকান্ত সাহা	গোপালপুর, পাবনা, ঐ	৭৪
৯১.	শহীদ যুধিষ্ঠির সাহা	মৃত- শ্যামমোহন	শালগারীয়া, পাবনা, ঐ	৫৪
৯২.	শহীদ তপতী রাণী চক্রবর্তী	মৃত শ্যামমোহন চক্রবর্তী	শালগারীয়া, পাবনা, ঐ	০৭
৯৩.	শহীদ নারানচন্দ্র সাহা	অজ্ঞাত	শালগারীয়া, পাবনা, ঐ	২৭
৯৪.	শহীদ প্রাণগোপাল সাহা	মৃত- নিত্যগোপাল সাহা	গোপালপুর, পাবনা, ঐ	২৭
৯৫.	শহীদ ভবতশ সাহা	মৃত-নিবারণ চন্দ্র সাহা	গোপালপুর, পাবনা, ঐ	৩৭
৯৬.	শহীদ কোমলকৃষ্ণ সাহা	শ্রী নিধর মোহনসাহা	গোপালপুর, পাবনা, ঐ	৪৭
৯৭.	শহীদ নিশীতোষ সাহা	মৃত- নিবারনচন্দ্র সাহা	পাথরতলা, দিলালপুর, পাবনা, ঐ	৭৭
৯৮.	শহীদ নির্মল কুমার সাহা	শ্রী পরিমলকুমার	পাথল তলা, দিলালপুর, পাবনা,ঐ	৬৭
৯৯.	শহীদ নীলমনি সাহা	মৃত-রামচরমসাহা	পাথরতলা, দিলালপুর, পাবনা, ঐ	৫৭
১০০.	শহীদ নারানচন্দ্র রায়	মৃত-চন্দ্রনাথ রায়	রায়পাড়া ঐ	৪৭
১০১.	শহীদ ভোলানাথ সাহা	মৃত-পঞ্চানন সাহা	পাথার তলা ঐ	৫৭
১০২.	শহীদ নিপেন্দ্রনাথ সাহা	মৃত- জগবন্ধু সাহা	দ:রাঘবপুর, পাবনা, ঐ	৩৭
১০৩.	শহীদ আনন্দগোপাল সাহা	মৃত- নিপেন্দ্রনাথ	দ:রাঘবপুর, পাবনা, ঐ	২৭
১০৪.	শহীদ মধুচরণ সাহা	মৃত- কেষ্টগোপাল	ছোট শারগারীয়া, পাবনা ঐ	৯৭
১০৫.	শহীদ মধুচরণ সাহা	মৃত- কেষ্টগোপাল	ছোট শারগারীয়া, পাবনা ঐ	৩৭
১০৬.	শহীদ জয় দূর্গাদেবী	মৃত- রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	ছোট শালগারীয়া, পাবনা, ঐ	
১০৭.	শহীদ বিশ্বনাথ সরকার	মৃত-সুখনাথ সরকার	হাদল, ফরিদপুর, পাবনা, ঐ	৪৭

১০৮.	শহীদ রণজিৎ সাহা	অজ্ঞাত	পাবনা, ঐ
১০৯.	শহীদ মুকুলচন্দ্র সাহা	মৃত- গণেশচন্দ্র সাহা	গয়েশপুর, পাবনা, ঐ
১১০.	শহীদ আবুলকাশেম প্রাং	মৃত- রিয়াজউদ্দিন প্রাং	হাদল, ফরিদপুর, পাবনা, ঐ
১১১.	শহীদ বাবলু সাহা	মৃত-সীতানাথ সাহা	কালিকাপুর, পাবনা, ঐ
১১২.	শহীদ জয়দেব চন্দ্র সাহা	অজ্ঞাত	রাধানগর, পাবনা, ঐ
১১৩.	শহীদ রেজাউল করিম	অজ্ঞাত	হাদল, ফরিদপুর, পাবনা, ঐ
১১৪.	শহীদ সুবলচন্দ্র সাহা	মৃত-সত্যচরণ সাহা	হাদল, ফরিদপুর, পাবনা, ঐ
১১৫.	শহীদ সুজিৎকুমার সাহা	অজ্ঞাত	উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ, ঐ
১১৬.	শহীদ জয়বেদ সাহা	অজ্ঞাত	উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ, ঐ
১১৭.	শহীদ কুমারী জয়ন্তীরাণী সাহা (ধর্ষিতা)	অজ্ঞাত	শালগারীয়া, পাবনা, ঐ
১১৮.	শহীদ কুমুদনাথ রায়	মৃত- কেদারনাথ রায়	রাধানগর, পাবনা, ঐ
১১৯.	শহীদ সুরেশবাবু	অজ্ঞাত	কালাচাঁদপাড়া, পাবনা, ঐ
১২০.	শহীদ নবকুমার সাহা	অজ্ঞাত	দাশুড়িয়া, পাবনা, ঐ
১২১.	শহীদ দুহী খান	মৃত ছবুখান	হাদল, ফরিদপুর, পাবনা, ঐ
১২২.	শহীদ কুমারী শুক্লা সাহা (নির্যার্তিতা)	অজ্ঞাত	কালিকাপুর, পাবনা, ঐ
১২৩.	শহীদ টোপনরাণী সাহা	স্বামী হেমন্ত কুমার সাহা	দিলালপুর, পাবনা, ঐ
১২৪.	শহীদ সংকরনাথ সাহা	অজ্ঞাত	শ্রীপুর, পাবনা, ঐ
১২৫.	শহীদ কালিপদ সাহা	অজ্ঞাত	ফৈলজানা, পাবনা, ঐ
১২৬.	শহীদ নদনাথ সাহা	অজ্ঞাত	দাশুড়িয়া, পাবনা, ঐ
১২৭.	শহীদ বুদ্ধিশ্বর হালদার	মৃত- রামচাঁদ হালদার	হাদল, ফরিদপুর, পাবনা, ঐ
১২৮.	শহীদ দীনেশচন্দ্র সাহা	শ্রী ক্ষীতিস চন্দ্র সাহা	আলোকদিয়া, পাবনা, ঐ
১২৯.	শহীদ রাজকুমার সাহা	অজ্ঞাত	শ্রীপুর, পাবনা, ঐ
১৩০.	শহীদ সুধিষ্ঠির চন্দ্র রায়	মৃত-কানছিরাম রায়	হাদল, ফরিদপুর, পাবনা ঐ
১৩১.	শহীদ নরেনচন্দ্র সাহা (নাট্যকার)	মৃত- পরেশ চন্দ্র সাহা	শালগারীয়া, পাবনা, ঐ

বধ্যভূমি ও গণকবর

ক) বধ্যভূমি: অবরুদ্ধ হাদল-কালিকাপুর এলাকায় পাক-হানাদার বাহিনী ও তার স্থানীয় সহযোগীরা যে স্থানগুলোকে বধ্যভূমিতে পরিণত করেছে তার মধ্যে থেকে মাত্র তিনটি বধ্যভূমির কথা এখানে আলোচিত হলো।

(১) হাদল ইউনিয়নের কালিকাপুর গ্রামের সাহাপাড়াতে ১৯৭১ সালে ৯ জ্যৈষ্ঠ সকাল বেলাতে ১০/১৫ জন নিরিহ লোককে এক লাইনে দাঁড় করিয়ে পাক-হানাদার বাহিনী তাদের গুলি করে হত্যা করে। এবং তার পরের দিন তাদের লাশ কুমড়াগড়া শ্মশানে (নদীর পাড়ে) কালিকাপুরের লোকেরা সমাহিত করে।

(২) হাদল ইউনিয়নের হাদল গ্রামের হিন্দুপাড়াতে ৯ই জৈষ্ঠ্য ভোর বেলাতে এক বীভৎস গণহত্যার ফলে পরিণত হয় বধ্যভূমিতে।

(৩) গণকবর: ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৯৭১ সালে রোজ সোমবার এ দিন হাদল-কালিকাপুর গ্রামে যে হত্যাযজ্ঞ হয় যার ফলে গ্রামের অসংখ্যা স্থানে পরিচিত ও অপরিচিত লাশ সমাহিত করা হয় তার মধ্যে মাত্র ৯টি গণকবরের কথা উল্লেখ করা হলো।

(১) হাদল ইউনিয়নের কালিকাপুর গ্রামের নিতাই মাস্টারের বাড়ির পশ্চিম পার্শ্বে নদীর ধারে একই কবরে সমাহিত হয়েছেন ৪ জন শহীদ। এ সময়ে যাঁরা বেঁচে গেছেন, তাঁরা হলেন:

ক) মৃত নিত্যানন্দ সাহা মাষ্টার, কালিকাপুর।
খ) নিমাই চন্দ্র সাহা (বর্তমানে ভারতে)।
গ) স্বপন কুমার সাহা (পলান) কালিকাপুর।

(২) হাদল ইউনিয়নের কালিকাপুর গ্রামে বাইদারভিটা নামে পরিচিত স্থানে একই কবরে ৭ জনকে সমাহিত করা হয়। এ সময়ে যাঁরা বেঁচে গেছেন, তাঁরা হলেন:
ক) শ্রী বিশ্বনাথ সাহা (বর্তমানে ভারত)
খ) শ্রী বিমল চন্দ্র সাহা (বর্তমানে ভারত)

(৩) হাদল ইউনিয়নের হাদল গ্রামের হারান চন্দ্র সাহার বাড়ির উপর সমাহিত করা হয় তিন জন শহীদকে । এ সময়ে যাঁরা বেঁচে গেছেন, তাঁরা হলেন:
ক) শ্রী সুধীর চন্দ্র সাহা (হাদল)
খ) শ্রী আশ্বিনী কুমার সাহা (হাদল)

(৪) হাদল ইউনিয়নের কালিকাপুর গ্রামে প্রোশেন ববুর বাগান বাড়িতে নদীর পাড়ে পাশাপাশি ১০ জনকে সমাহিত করা হয়। এ সময়ে যাঁরা বেঁচে গেছেন, তাঁরা হলেন:
ক) শ্রী প্রোশন বাবু (বর্তমানে পরলোকগত)
খ) শ্রী বৈদ্যনাথ সাহা ডাক্তার (বর্তমানে মির্জাপুর)

(৫) হাদল ইউনিয়নের হাদল গ্রামের মধু সাহার বাড়িতে মধু সাহাসহ আরও দুই জনকে সমাহিত করা হয়। এ সময়ে যাঁরা বেঁচে গেছেন, তাঁরা হলেন:
ক) শ্রী অশ্বিনী (হাদল)
খ) শ্রী আনন্দ সাহা (বর্তমানে চাটমোহর)

(৬) হাদল ইউনিয়নের কালিকাপুর গ্রামের ডা. বৈদ্যনাথ সাহার বাড়ির পশ্চিমে পাশাপাশি ৫ জনকে সমাহিত করা হয়। এ সময়ে যাঁরা বেঁচে গেছেন, তাঁরা হলেন:
ক) শ্রী বৈদ্যনাথ সাহা (বর্তমান মির্জাপুর, চাটমোহর)
খ) শ্রী কার্তিক সাহা (বর্তমানে ভারত)

(৭) পার্শ্বডাঙ্গা ইউনিয়নের মনশ্বর মৌজা অর্থাৎ চিকনাই নদীর দক্ষিণ পাড়ে (কুমড়াগাড়া শশ্মানের দক্ষিণে ২ জন শহীদ হয় এবং তাদের ঐ স্থানেই সমাহিত করা হয়।

(৮) হাদল ইউনিয়নের কালিকাপুর গ্রামের গোয়াল গাঁ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫০০ গজ পূর্ব দিকে খামারিয়া ধরের পূর্বে বধ্যভূমিতে সমাহিত হয়েছেন ৮ জন শহীদ। এ সময়ে যাঁরা বেঁচে গেছেন, তাঁরা হলেন:
ক) শ্রী সুধীর সরকার (কালিকাপুর)
খ) শ্রী গোপাল হালদার (কালিকাপুর)

(৯) হত্যাযজ্ঞের অবশিষ্ট সব লাশগুলো ৯ই ও ১০ই জ্যৈষ্ঠ পাশাপাশি কবরে সমাহিত করা হয় এবং এটাই সবচেয়ে বড় বধ্যভূমি হিসেবে পরিচিত।

উপসংহার

বাংলাদেশে পাকিস্তানি বর্বর সেনাদের ও বাঙালি রাজাকার, আল বদর, আল শামস এবং এদের সমর্থকদের গণহত্যার ব্যাপকতা, বীভৎসতা, নিষ্ঠুরতা ও পৈশাচিকতার বর্ণনা সম্ভব নয়। শুধু এটুকু স্মরণে রাখলেই এই গণহত্যা সর্ম্পকে ধারণা গড়ে তোলা সম্ভব যে, বাংলাদেশের প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের স্থানীয় সহযোগীদের নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছিল ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণী, নির্বিশেষে হাদল-কালিকাপুর এলাকার নিরীহ অগণিত মানুষ। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ১৯৭১-এ এত বড় একটা হত্যাযজ্ঞের স্মৃতি রক্ষার্থে হাদল-কালিকাপুর এলাকায় কোনো স্মৃতিসৌধ নির্মাণের ব্যবস্থা করা হয়নি।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, সপ্তদশ সংখ্যা ১৪১৬

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কার্যকারিতা (১৯৭২-১৯৯০)

এম. আমিনুর রহমান*

Abstract : Democracy is the best form of government in the modern world. But there are different opinions regarding the definitions of democracy. Some definitions have been discussed in this study. It is not so easy to implement the democratic system though it is the best form of government. In this study the pre-conditions for the success of democracy have been discussed. Democratic system has been introduced in the constitution of Bangladesh. But this system has not been executed for many reasons. In this study the effectiveness of the democratic system specially, the functions of the first and second parliaments have been analysed. Lastly the causes of failure of democracy in Bangladesh have also been identified.

ভূমিকা

বর্তমানকালে গণতন্ত্রকেই শ্রেষ্ঠ সরকারব্যবস্থা হিসেবে অভিহিত করা হয়। তবে পৃথিবীর বিখ্যাত বহু রাজনীতিবিদ ও লেখক বিভিন্নভাবে গণতন্ত্রকে ব্যাখ্যা করেছেন। অধ্যাপক ম্যাকাইভার বলেন, "গণতন্ত্র বলতে সংখ্যাগরিষ্ঠের বা অন্য কারো দ্বারা শাসনকার্য পরিচালিত হওয়ার পদ্ধতিকে বুঝায় না, বরং প্রধানত তা কে বা কারা পরিচালনা করবে এবং ব্যাপকভাবে কোনো উদ্দেশ্যে শাসন করবে তা নির্ণয় করার উপায় বিশেষ।"[১] জন স্টুয়ার্ট মিল-এর মতে, "রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতায় সকলের প্রবেশাধিকার হল গণতন্ত্র।"[২] অধ্যাপক ডাইসির মতে, "গণতন্ত্র এমন শাসনব্যবস্থা যেখানে শাসকবর্গ তুলনামূলকভাবে জনসংখ্যার একটি অংশ হয়ে থাকেন।"[৩] তবে ১৮৬৩ সালের ১৯ নভেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন কর্তৃক প্রদত্ত সংজ্ঞাটিকেই অধিকাংশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অভ্রান্ত সংজ্ঞা হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁর মতে, "Democracy is a government, of the people, by the people and for the people."[৪]

---

* ড. এম. আমিনুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

[১] Robert M. MacIver, *The Web of Government* (New York: The Free Press, 1965), p.148.

[২] J.S. Mill, *Representative Government* (London: Unwin Paperback, 1963), p.132.

[৩] Cited in A.V. Dicey, *An Introduction to the study of the Law of the Constitution* (London: McMillan and Co., 1939), p.324.

[৪] Cited in A.C. Kapur, *Principles of Political Science* (New Delhi: Chand and Company Limited, 1993), p. 74.

গণতন্ত্র সম্পর্কে বিভিন্ন লেখক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, গণতন্ত্র হচ্ছে এমন এক ধরনের সরকার ব্যবস্থা যেখানে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং জনগণই হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উৎস। জনগণ প্রত্যক্ষ অথবা তাদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সরকার পরিচালনার অংশগ্রহণ করে থাকে।

গণতন্ত্র উত্তম সরকার ব্যবস্থা হলেও এর বাস্তবায়ন অত্যন্ত কঠিন ও জটিল। এ্যাডমাণ্ড বার্ক-এর মতে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে গেলে অনুশীলন দরকার।[৫] ম্যাকাইভার বলেন যে, এরজন্য শত বর্ষ আবশ্যক হতে পারে।[৬] হেনরী মেহন ঠিকই বলেছেন, "সকল প্রকার শাসনের মধ্যে গণতন্ত্র অত্যন্ত দুরূহ। কারণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে গেলে এর জন্য অত্যাবশ্যকীয় শর্তাবলী পূরণ করতে হবে।[৭]

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সফলতার জন্য প্রয়োজন গণতান্ত্রিক জনগণের। শিক্ষার ব্যাপক বিস্তারকে গণতন্ত্রের সফলতার একটি অন্যতম শর্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। গণতন্ত্রকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে সকল শ্রেণীর মানুষ ও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সহিষ্ণুতা থাকা অপরিহার্য। এছাড়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার উপর। এস.এম. লিপসেটের মতে, "গণতন্ত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে জড়িত। যে জাতি যত স্বচ্ছল তাদের কাছে গণতান্ত্রিক চর্চা তত সহজ।"[৮] গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সফল করতে হলে অবশ্যই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। অন্যদিকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য রাষ্ট্রের মৌলিক বিষয়দি সম্পর্কে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর ঐক্যমত প্রয়োজন। গণতন্ত্রের সফলতার আর একটি শর্ত হচ্ছে সৎ, দক্ষ ও নিরপেক্ষ সরকারি কর্মচারী। গণতন্ত্রকে সফল করার জন্য সেনাবাহিনীর নিরপেক্ষ ভূমিকাও কম অর্থবহ নয়। বি.ই. ব্রাউন-এর মতে, সামরিক বাহিনী কর্তৃক বেসামরিক সরকারকে উৎখাত করার প্রবণতাই হল গণতন্ত্রের প্রধানতম সমস্যা।[৯]
১৯৭২-১৯৮২ সালের মধ্যে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কতটুকু কার্যকর হয়েছিল এবং গণতন্ত্রের সফলতার পথে কি কি প্রতিবন্ধকতা কাজ করেছে তা অনুসন্ধান করাই আলোচ্য প্রবন্ধটির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

এ প্রবন্ধটি সম্পাদনের জন্য মূলত দুটি গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। যথা: (১) পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি ও (২) ঐতিহাসিক পদ্ধতি। এখানে মূলত প্রাথমিক ও মাধ্যমে উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই গবেষণা কর্মের জন্য অধ্যাদেশ, বিজ্ঞপ্তি, গেজেট বিবরণী, বাংলাদেশের সংবিধান, দৈনিক পত্রিকা, বাংলাদেশের রাজনীতির ওপর প্রকাশিত প্রবন্ধ ও গ্রন্থসমূহের সাহায্য নেয়া হয়েছে।

---

[৫] Cited in R.C. Agorwal, *Political Theory* (New Delhi: S. Chand and Company Ltd., 1991), p. 27.
[৬] Robert M. MacIver, *op.cit.*, p.132.
[৭] Cited in Allen R. Ball, *Modern Politics and Government* (2nd Edition), London: The Mcmillan Press Ltd., 1977), p.
[৮] Seymour Martin Lipset, *Political Man: The Social Bases of Politics* (New York: Garden City, 1960), p.50.
[৯] B.E. Brown, *New Direction of Comparative Politics* (New York: Asian Publishing House, 1962), p.180.

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কার্যকারিতা

১৯৭২ সালে গৃহীত সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদে বলা হয়, বাংলাদেশ হবে একটি প্রজাতন্ত্র। এর রাজনৈতিক ব্যবস্থা হবে গণতান্ত্রিক। মূল সংবিধানে সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। এই লক্ষ্যে ব্রিটেন, কানাডা বা ভারতের ন্যায় বাংলাদেশকে পার্লামেন্টকে যথেষ্ট ক্ষমতা দেয়া হয়। শাসন বিভাগ পার্লামেন্টের নিকট সম্পূর্ণভাবে দায়ী ছিল। রাষ্ট্রপতির কোনো ভেটো ক্ষমতা ছিল না। পার্লামেন্টের অনুমোদন ছাড়া কোনো কর বা লেভী ধার্য করা যেত না।[১০]

সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কেন্দ্র হিসেবে বাংলাদেশ পার্লামেন্টকে যথেষ্ট ক্ষমতা দেয়া হলেও বাস্তবে তা কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পেরেছে সেটিই বিবেচ্য বিষয়। এই উদ্দেশ্যে পার্লামেন্টের কার্যকারিতা অনুসন্ধান করা হবে।

প্রথম জাতীয় সংসদ

১৯৭২ সালে গৃহীত সংবিধানের অধীনে বাংলাদেশে ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ প্রথম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। শাসক দল আওয়ামী লীগসহ ছোট-বড় মোট ১৪টি দল বা সংগঠন এতে অংশগ্রহণ করে। আওয়ামী লীগ ৭৩.২০% ভোট পেয়ে ২৮৯টি আসনের মধ্যে ২৮২টি লাভ করে। জাসদ ২৩৭টি প্রার্থী দিয়ে ভোট পায় ৬.৫২% ও আসন পায় মাত্র একটি। বাংলাদেশ জাতীয় লীগের ৮ জন প্রার্থীর মধ্যে একজন জয়ী হন। অবশিষ্ট ৫টি আসন পান স্বতন্ত্র প্রার্থীরা।[১১]

প্রথম জাতীয় সংসদের কার্যকলাপ

বাংলাদেশের প্রথম পার্লামেন্ট ১৯৭৫ সালের ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত সংসদীয় শাসনব্যবস্থার অধীনে কর্মরত ছিল। এ সময়কালে প্রথম জাতীয় সংসদ সাতটি অধিবেশনে মিলিত হয় এবং ১১৪টি কর্মদিবসে ৪০৭ ঘণ্টা ব্যয় করে।

ক. আইন প্রণয়ন

সংসদীয় আমলে সরকারি উদ্যোগে ১০৭টি বিল উত্থাপিত হয়; এর মধ্যে ১০০টি বিল পাস হয়। বেসরকারি সদস্যরা বিল উত্থাপনের জন্য কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। গৃহীত ১০০টি বিলের মধ্যে ৫৫টি (৫৫%) ছিল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পূর্বাহ্নে জারিকৃত অধ্যাদেশ, যেগুলো অনুমোদনের জন্য বিল আকারে পেশ করা হবে। অধ্যাদেশ জারি করার ক্ষমতা নিয়ে জরুরি নয় এমন কিছু আইনও সংসদকে পাস কাটিয়ে জারি করা হয়। প্রথম পার্লামেন্টে গৃহীত মোট ১০০টি বিলের মধ্যে ৫৬টির ওপর আলোচনা হলেও ১৪টির ওপর সংসদে পর্যাপ্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এ সংসদে গৃহীত ১০০টি বিলের মধ্যে ২৯টি সংসশোধনীসহ এবং ৭১টি বিল যেভাবে উত্থাপিত হয় সেভাবেই গৃহীত হয়। তবে যেসব বিল সংশোধনীসহ পাস হয় সেগুলোর সংশোধনী ছিল সম্পাদকীয় ধরনের, এসব সংশোধনীর দ্বারা বিলের তেমন মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়নি।

---

[১০] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৪৪।

[১১] *The Wave* (Weekly), 31 March 1973.

প্রথম পার্লামেন্টের সংসদীয় আমলে গৃহীত ১০০টি বিলের মধ্যে মাত্র তিনটি বিল বাছাই কমিটিতে পাঠানো হয় এবং কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে সংসদে গৃহীত হয়। (দেখুন সারণি-১) অতএব অধিকাংশ বিলই সরকার যে আকারে সংসদে পেশ করে সে আকারেই গৃহীত হয়। সংসদে গৃহীত সংশোধনীগুলোর অধিকাংশই ছিল সরকারি দলের এবং গুরুত্বহীন বিরোধী দলীয় সংসদ-সদস্যদের প্রস্তাবিত সংশোধনী কদাচিৎ গৃহীত হয়। এভাবে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদ সরকারের 'রাবার স্ট্যাম্প' হিসেবে কাজ করে।

সারণি ১ : সংসদীয় আমলে প্রথম পার্লামেন্টের আইন প্রণয়নমূলক কাজের খতিয়ান

১.	বিলের নোটিশের সংখ্যা	-	১২৩
২.	সংসদে উত্থাপিত বিলের সংখ্যা	-	১০৭
৩.	সংসদে গৃহীত মোট বিলের সংখ্যা	-	১০০
	(ক) মৌলিক বিল	-	৪৫ (৪৫%)
	(খ) অধ্যাদেশ	-	৫৫ (৫৫%)
	(গ) আলোচনাসহ গৃহীত বিল	-	৫৬ (৫৬%)
	(ঘ) আলোচনা ছাড়া গৃহীত বিল	-	৪৪ (৪৪%)
	(ঙ) সংশোধনীসহ গৃহীত বিল	-	২৯ (২৯%)
	(চ) সংশোধনী ছাড়া গৃহীত বিল	-	৭১ (৭১%)

সূত্র: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, জাতীয় সংসদের কার্যবাহের সারাংশ

খ. বাজেট অনুমোদন

প্রথম পার্লামেন্টের সংসদীয় আমলে দু'টি বাজেট পাস হয়। ১৯৭৩ সালের ১৪ জুন প্রথম বাজেটটি সংসদে উত্থাপিত হয়। মোট ৬৪ জন সংসদ-সদস্য বাজেট আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে ৫৭ জন সরকার দলীয় এবং সাতজন বিরোধী দলের সদস্য ছিলেন। সরকারি দলের সদস্যরা ১১টি এবং বিরোধী দলীয় সদস্যরা মোট ১৫টি বিষয়ের ওপর ধার্য কর প্রত্যাহার করার জন্য দাবি জানান। এসব দাবির প্রেক্ষিতে সরকার তিনটি বিষয়ের ওপর থেকে কর প্রত্যাহার করে নেয়। ১৯৭৩-৭৪ সালের বাজেটে প্রস্তাবিত মোট ৭৮টি মঞ্জুরী দাবির মধ্যে ১২টির ওপর বিরোধী দলের সংসদ-সদস্যরা ২২টি ছাঁটাই প্রস্তাব সংসদে উত্থাপন করেন এবং সবগুলোর ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। তবে ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো সংসদে কণ্ঠভোটে নাকচ হয়ে যায়। উল্লেখিত ৭৮টি মঞ্জুরি দাবির মধ্যে ৬৬টির ওপর সময়াভাবে গিলেটিন প্রয়োগ করা হয়। ফলে এ দাবিগুলো কোনোরকম আলোচনা ছাড়াই পাস হয়।

প্রথম জাতীয় সংসদে দ্বিতীয় বাজেটটি ১৯৭৪ সালের ১৯ জুন সংসদে উত্থাপিত হয়। এ বাজেটের ওপর সংসদে আট দিন সাধারণ আলোচনা হয় এবং ৬২ জন সংসদ-সদস্য তাতে অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে ৫৫ জন সরকার দলীয় এবং সাতজন বিরোধী দলীয় সদস্য ছিলেন। সরকার দলের সদস্যরা সাতটি এবং বিরোধী দলের সদস্যরা ১২টি আইটেমের ওপর কর প্রত্যাহার করার দাবি জানান। কিন্তু তাদের দাবি অনুযায়ী কোনো কর প্রত্যাহার করা হয়নি। এ বাজেটের ৯০টি মঞ্জুরি দাবির মধ্যে ১টির ওপর বিরোধী দলের সদস্যরা ৩৮টি ছাঁটাই প্রস্তাব আনেন। তন্মধ্যে ২৫টি ছাঁটাই প্রস্তাবের ওপর তাঁরা আলোচনা করেন। বাজেটের ৯০টি মঞ্জুরি

দাবির মধ্যে ৭৯টির ওপর গিলেটিন প্রদান করা হয়। ফলে এগুলো সম্পর্কে পার্লামেন্টে কোনো রকম আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়নি।[১২]

এ বাজেটকে কোনো দিক থেকেই সংসদ প্রভাবিত করতে পারেনি। এটি সংসদে যেভাবে উত্থাপিত হয় সেভাবেই পাস হয়।

গ. সংবিধান সংশোধন

১৯৭৩-৭৫ সময়কালে প্রথম পার্লামেন্টে সংবিধানের চারটি সংশোধনী গৃহীত হয়। প্রথম সংশোধনীটি পাকিস্তানী যুদ্ধ অপরাধীদের বিচারের জন্য সরকারকে যথোপযুক্ত ক্ষমতা প্রদান এবং তৃতীয় সংশোধনীটি ১৯৭৪ সালের ১৬ মে তারিখে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে স্বাক্ষরিত সীমানা চুক্তি বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে গৃহীত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় ও চতুর্থ সংশোধনীর দ্বারা সরকারের কাঠামো, ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্যের মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়। প্রথম তিনটি সংশোধনী বিলের ওপর সংসদে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়। কিন্তু চতুর্থ সংশোধনী বিলটি (যার দ্বারা সরকারব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়) কোনোরূপ আলোচনা ছাড়াই যেদিন সংসদে উত্থাপিত হয় সেদিনই পাস হয়।

পার্লামেন্টে সংবিধান সংশোধনী বিল উত্থাপন এবং গ্রহণের তারিখ ও সময়

সংশোধনী	গ্রহণের তারিখ ও সময়	বিল পাসের তারিখ	বিল পাসের জন্য ব্যয়কৃত সময়
প্রথম সংশোধনী	১২.৭.১৯৭৩	১৪.৭.১৯৭৩	তিন ঘণ্টা
দ্বিতীয় সংশোধনী	১৮.৯.১৯৭৩	২০.৯.৭৩	দু'ঘণ্টা
তৃতীয় সংশোধনী	২১.১১.৭৪	২৩.১১.৭৪	পাঁচ ঘণ্টা
চুতর্থ সংশোধনী	২৫.০১.৭৫	২৫.১.৭৫	৭০ মিনিট

ঘ. শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ

আইনসভা কর্তৃক শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণের যে সব পদ্ধতি রয়েছে, বাংলাদেশের সংবিধানেও সংসদের কার্যপ্রণালী বিধিতে সেগুলো স্বীকৃত হয়। জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধিতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা এবং অনাস্থা প্রস্তাব, মুলতবী প্রস্তাব, মনোযোগ আকর্ষণী প্রস্তাব, সিদ্ধান্ত প্রস্তাব প্রভৃতি উত্থাপনের মাধ্যমে পার্লামেন্ট কর্তৃক শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণের যাবতীয় ব্যবস্থা ছিল। প্রথম সংসদে একটিও অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপিত হয়নি।

প্রথম সংসদে সদস্যরা মোট ৭৫৭৬টি তারকাচিহ্নিত প্রশ্নের নোটিশ দেন। তার মধ্যে ৫৪১৩টি, অর্থাৎ ৭১% প্রশ্ন স্পিকার কর্তৃক বিধিসম্মত হলে গৃহীত হয়। কিন্তু ৪৬৭৪টি অর্থাৎ ৮৬% প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়। সংসদে মন্ত্রীরা বিভিন্ন অজুহাতে কিছু প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যান এবং কিছু প্রশ্ন সময় অভাবে তামাদি হয়ে যায়। প্রথম পার্লামেন্টে মূল প্রশ্নগুলোর ওপর ৪৩২৫টি সম্পূরক প্রশ্ন উত্থাপিত হয় এবং ৩৩৫৩টি অর্থাৎ ৭৮% প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়। মন্ত্রীরা বিভিন্ন

[১২] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যবাহের সারাংশ*, ১৯৭৩-১৯৭৫ (৭ খণ্ড)।

অজুহাতে ৯৭২টি প্রশ্নের অর্থাৎ ২২% সম্পূরক প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যান। এ সংসদে সদস্যরা ৩০টি তারকাচিহ্নিবিহীন প্রশ্নের নোটিশ দেন। এর মধ্যে ২৬টি স্পিকার কর্তৃক গৃহীত হয়। কিন্তু সংসদে মাত্র চারটির ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া সদস্যরা ১০৮টি স্বল্পকালীন প্রশ্নের নোটিশ জমা দেন। তন্মধ্যে সংসদে আলোচনা ও উত্তর দানের জন্য স্পিকার কর্তৃক ৫০টি প্রশ্ন গৃহীত হয়। তবে সংসদে ২৫টি প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়। প্রথম পার্লামেন্টে ১৬টি মূলতবী প্রস্তাবের নোটিশ পাওয়া যায়, যার মধ্যে স্পিকার মাত্র একটি প্রস্তাব বিধিসম্মত বলে গ্রহণ করেন। কিন্তু সরকার দলীয় সদস্য সেটি প্রত্যাহার করায় সংসদে কোনো মূলতবী প্রস্তাব আলোচিত হয়নি। এ সংসদে মোট ২২৯টি মনোযোগ আকর্ষণী প্রস্তাবের নোটিশ দেয়া হয়। তার মধ্যে ৫১টি গৃহীত হয় কিন্তু এর মধ্যে ২৮টি সংসদে উত্থাপিত হয় এবং সেগুলো সম্পর্কে মন্ত্রীরা বিবৃতি প্রদান করেন। এ সংসদে ১৯টি "সংক্ষিপ্ত আলোচনা" প্রস্তাবের নোটিশ দেয়া হয়। তবে আলোচনার জন্য পাঁচটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। তার মধ্যে চারটি সংসদে আলোচিত হয়। (সারণি ২)

সারণি-২

শাসন বিভাগের ওপর প্রথম পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যকলাপের খতিয়ান

প্রশ্ন/প্রস্তাব	প্রদত্ত নোটিশের সংখ্যা	স্পিকার কর্তৃক গৃহীত	সংসদে উত্থাপিত ও আলোচিত	সংসদে গৃহীত
তারকাচিহ্নিত প্রশ্ন	৭৫৭৬	৫৪১৩	৪৬৭৪	-
সম্পূরক	-	৪৩২৫	৩৩৫৩	-
তারকাচিহ্নবিহীন প্রশ্ন	৩০	২৬	৪	-
স্বল্পকালীন নোটিশের প্রশ্ন	১০৮	৫০	২৫	-
মূলতবী প্রস্তাব	১৬	১	শূন্য	শূন্য
মনোযোগ আকর্ষণী প্রস্তাব	২২৯	৫১	২৮	-
সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রস্তাব	১৯	৫	৪	-
বেসারকারি সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব	৩৪৩	১৭২	৬	-
অনাস্থা প্রস্তাব	১	-	শূন্য	শূন্য

সূত্রঃ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, জাতীয় সংসদের কার্যবাহের সারাংশ, ১৯৭৩-১৯৭৫ (৭ খণ্ড), বিতর্ক, ৭ খণ্ড।

ঙ. কমিটি

প্রথম সংসদ তার মেয়াদকালে সংসদের সাধারণ কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য ১১টি স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু এ সংসদে মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়নি। কেবল তিনটি বিল পরীক্ষা করার জন্য তিনটি বাছাই কমিটি গঠন করা হয়। ফলে প্রথম পার্লামেন্টে কমিটির তেমন ভূমিকা ছিল না।

প্রথম পার্লামেন্টের কার্যকলাপ বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশ সংসদ আইন প্রণয়ন, বাজেট প্রণয়ন, শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ, সংবিধান সংশোধন প্রভৃতি ক্ষেত্রে যথাযথ

ভূমিকা পালন করতে পারেনি। এর প্রধান কারণ ছিল সংসদে বিরোধী দলীয় সদস্যদের সংখ্যাল্পতা। এ সংসদে বিরোধী সদস্যদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৯ জন। এ কারণে বিরোধী দলীয় সংসদ-সদস্যরা সংসদীয় পদ্ধতিগুলো প্রয়োগ করতে পারেননি। সরকার তাদের বিরোধী দল বা গ্রুপ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে। ফলে সরকারের নীতি ও কর্মসূচিকে প্রভাবিত করতে না পারার কারণে তারা হতাশ হয় এবং সংসদ বহির্ভূত সহিংস আন্দোলনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ১৯৭৩-৭৫ সময়কালে রাজনৈতিক দলসমসূহের দৃষ্টিভঙ্গী ও কার্যকলাপ গণতন্ত্রের জন্য অনুকূল ছিল না। অধিকাংশ বিরোধী দল নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাস করত না। চীনপন্থী বলে কথিত বাম রাজনৈতিক দলগুলো প্রধান লক্ষ্য ছিল ব্যাপক গণআন্দোলনের মাধ্যমে সরকারকে উৎখাত করে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করা। এইসব দল সেই লক্ষ্যে অবিরাম বিক্ষোভ, মিছিল, হরতাল, ঘেরাও প্রভৃতি কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ সরকারকে উৎখাতকল্পে সশস্ত্র কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়। ফলে একদিকে রাজনৈতিক অস্থির এবং অন্যদিকে দেশে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটে। এ অবস্থায় সরকার ১৯৭৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে সকল রাজনৈতিক তৎপরতা ও মৌলিক অধিকার স্থগিত করে এবং ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর দ্বারা দেশে একদলীয় রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। ফলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।[১৩]

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ তাঁর পরিবারের সদস্যদের হত্যাকরে কতিপয় বিপথগামী সামরিক অফিসার। ফলে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাচ্যুত হয় এবং রাজনীতিতে পরিবর্তন সূচিত হয়। একদলীয় ব্যবস্থা রহিত করা হলেও রাষ্ট্রপতিক পদ্ধতি বহাল থাকে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন জেনারেল জিয়াউর রহমান। তিনি তাঁর শাসনকে বৈধ করার উদ্দেশ্যে পর্যায়ক্রমে বেসামরিকীকরণ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।[১৪] এসব পদক্ষেপের মধ্যে ছিল রাজনৈতিক তৎপরতা পুনর্বহাল, গণভোট, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, দল গঠন ও সংসদ নির্বাচন।

দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ

১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সংসদ নির্বাচনে জিয়ার বিএনপি ৩০০টি আসনের মধ্যে ২০৭টি আসন লাভ করে। আওয়ামী লীগ আসন পায় ৩৯টি। মুসলিম লীগ ও ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ যৌথভাবে ২০টি আসন লাভ করে। জাসদ ৮টি আসন পায়। এছাড়া আওয়ামী লীগ (মিজান) ২টি, ন্যাপ (মোজাফফর) ১টি, বাংলাদেশ গণফ্রন্ট ২টি, জাতীয় লীগ ২টি, সাম্যবাদী দল ১টি, জাতীয় একতা পার্টি ১টি, গণতান্ত্রিক আন্দোলন ১টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ১৬টি আসন লাভ করে।[১৫]

---

[১৩] Talukder Maniruzzaman, "Bangladesh in 1975: The Fall of the Mujib Regime and Its Aftermath", *Asian Survey*, Vol.XVI, No.2, February 1976, p.119.

[১৪] Mahfuzul H. Chowdhury, *Democratization in South Asia: Lessons from American Institutions* (Burlington: Ashgate Publishing Company, 2003), p.65.

[১৫] বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, *Report on Parliamentary Election*, 1979, p. 43।

জাতীয় সংসদের কার্যকলাপ

১. আইন প্রণয়ন: দ্বিতীয় পার্লামেন্টে উত্থাপিত ৮৭টি বিলের মধ্যে মোট ৪৯টি বিল সংসদে গৃহীত হয়। এর দুটি ছিল বেসরকারি বিল ও ৪৭টি ছিল সরকারি বিল। সংসদে গৃহীত বিলগুলোর মধ্যে একটি ছাড়া সবগুলোই আইনে পরিণত হয়। এছাড়া দ্বিতীয় পার্লামেন্টে আরো ১৭টি বিল গৃহীত হয়। এর মধ্যে ১৫টি অর্থ সংক্রান্ত ও দু'টি সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বিল। সংসদে গৃহীত ৪৯টি বিলের ৩২টি (৬৫%) ছিল মৌলিক এবং ১৭টি অধ্যাদেশ। গৃহীত ৪৯টি বিলের মধ্যে ৩১টির ওপর সংসদে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং বাকী ১৮টি বিল কোনোরকম আলোচনা ছাড়াই পাস হয়। তবে পার্লামেন্টে আলোচিত ৩১টি বিলের মধ্যে ১৫টির ওপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। দ্বিতীয় পার্লামেন্টে পাসকৃত ৪৯টি বিলের মধ্যে ১৩টি বিল (২৭%) সংশোধনীসহ পাস হয় এবং বাকী ৩৬টি (৭৩%) যে আকারে সংসদে উত্থাপিত হয় সে আকারেই গৃহীত হয়। ১৩টি বিলের ওপর গৃহীত সংশোধনীগুলোর অধিকাংশই ছিল ভাষাগত। (সারণি-৩)

সারণি ৩ : দ্বিতীয় পার্লামেন্টের আইন প্রণয়নমূলক কাজের খতিয়ান

১.	সাধারণ বিলের সংখ্যা	-	১৪৬
২.	সংসদে উত্থাপিত বিলের সংখ্যা	-	৮৭
৩.	সংসদে গৃহীত মোট বিলের সংখ্যা	-	৪৯
	(ক) মৌলিক বিল	-	৩২ (৬৫%)
	(খ) অধ্যাদেশ আকারে পূর্বাহ্নে জারিকৃত বিল	-	১৭ (৩৫%)
	(গ) আলোচনাসহ গৃহীত বিল	-	৩১ (৬৩%)
	(ঘ) আলোচনা ছাড়া গৃহীত বিল	-	১৮ (৩৭%)
	(ঙ) সংশোধনীসহ গৃহীত বিল	-	১৩ (২৭%)
	(চ) সংশোধনী ছাড়া গৃহীত বিল	-	৩৬ (৭৩%)

উৎস: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যবাহের সারাংশ ১৯৭৯-১৯৮২ (৮খণ্ড)।

২. বাজেট অনুমোদন: দ্বিতীয় সংসদে মোট তিনটি বাজেট পাস হয়। প্রথম বাজেটের ওপর ২০৬ জন সংসদ-সদস্য আলোচনা করেন। এর মধ্যে ১৪২জন সরকার দলীয় এবং ৬৪ জন বিরোধী দলের সদস্য ছিলেন। বাজেটের ৮৮টি মঞ্জুরি দাবির মধ্যে ১৮টির ওপর সংসদ-সদস্যরা আলোচনার সুযোগ পান এবং ৭০টি দাবির ওপর গিলেটিন প্রদান করা হয়। কোনো ছাঁটাই প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। সরকারি ও বিরোধী দলীয় সদস্যরা ১৪টি আইটেমের ওপর থেকে ধার্য কর প্রত্যাহারের জন্য প্রস্তাব করলেও মাত্র দুটির ওপর থেকে কর প্রত্যাহার করা হয়।

১৯৮০-৮১ সালের বাজেটের ওপর ২১৬ জন সংসদ-সদস্য আলোচনা করেন। তন্মধ্যে ১৪৪ জন সরকার দলীয় এবং ৭২ জন বিরোধী দলীয় সদস্য ছিলেন। এ বাজেটের ৯৯টি মঞ্জুরি দাবির মধ্যে ১৮টির ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বাকী ৮১টির ওপর গিলেটিন প্রদান করা হয়।

কোনো ছাঁটাই প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। এ বাজেটে ৫৩টি আইটেমের ওপর নতুন কর আরোপের প্রস্তাব করা হয়। বিরোধী দলের সদস্যরা ২৬টি দ্রব্যের ওপর প্রস্তাবিত কর প্রত্যাহারের দাবি জানান। কিন্তু তাদের দুটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

দ্বিতীয় সংসদের তৃতীয় বাজেটের ওপর ১২৬ জন সংসদ-সদস্য বক্তব্য রাখেন। তন্মধ্যে ক্ষমতাসীন দলের ৭১ জন এবং বিরোধী দলের ৫৫ জন সদস্য ছিলেন। বাজেটের ৯৯টি মঞ্জুরি দাবির মধ্যে ১৩টির ওপর সংসদে আলোচনা হয় এবং ৮৬টির ওপর গিলেটিনে দেয়া হয়। ফলে সংসদ সদস্যরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলোচনার সুযোগ পাননি। বিরোধী দলের সংসদ-সদস্যরা ১৮টি আইটেমের ওপর থেকে প্রস্তাবিত কর প্রত্যাহার করার জন্য দাবি জানান। তবে সরকার দু'টি আইটেমের ওপর থেকে আংশিক কর প্রত্যাহার করে।[১৬]

৩. সংবিধান সংশোধন: দ্বিতীয় পার্লামেন্টে সংবিধানের দু'টি সংশোধনী পাস হয়। রাষ্ট্রপতি জিয়া সামরিক ঘোষণার দ্বারা যেসব পরিবর্তন করেছিলেন সেগুলোকে ভূতাপেক্ষ (Retrospective) অনুমোদন দেয়ার জন্য পঞ্চম সংশোধনী পাস হয়। এ সংশোধনীর দ্বারা সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পরিবর্তন সাধিত হয়। পঞ্চম সংশোধনী বিলটি সম্পর্কে বিরোধী দলের সদস্যদের আনীত কোনো প্রস্তাব গৃহীত না হওয়ায় তারা সংসদ থেকে ওয়াক আউট করেন। ফলে বিরোধী দলীয় সদস্যদের অনুস্থিতিতে সংশোধনীটি পাস হয়।

জিয়ার মৃত্যুর পর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের সুযোগ করে দেয়ার জন্যই দ্বিতীয় সংসদে সংবিধানের ষষ্ঠ সংশোধনী পাস করা হয়। বিরোধী দলের সদস্যদের প্রস্তাব গৃহীত না হওয়ায় তারা সংসদ থেকে ওয়াক আউট করেন এবং তাদের অনুপস্থিতিতে কোনোরকম বিতর্ক ছাড়াই বিলটি ২০ মিনিটে পাস হয়।

৪. শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ: দ্বিতীয় সংসদে বহুদলীয় রাষ্ট্রপতিক পদ্ধতি প্রচলিত থাকায় সংবিধান অনুযায়ী মন্ত্রিপরিষদ জাতীয় সংসদের নিকট দায়ী ছিল না; মন্ত্রীরা রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টি অনুযায়ী স্বপদে বহাল থাকতেন। তবে মন্ত্রীরা সংসদে উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশগ্রহণ ও নিজ নিজ দপ্তর সম্পর্কে উত্থাপিত বিভিন্ন অভিযোগ বা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতেন।

দ্বিতীয় সংসদে উত্থাপিত ৭২৯৪টি প্রশ্নের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা ৭২৫৯টির উত্তর প্রদান করেন এবং বাকী ৩৫টি প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যান। তথ্য সংগ্রহ কিংবা জাতীয় স্বার্থের অজুহাত দেখিয়ে অনেক সহজ প্রশ্নও মন্ত্রীরা এড়িয়ে গেছেন। তাছাড়া দ্বিতীয় পার্লামেন্টে উত্থাপিত মূল প্রশ্নগুলোর অধিকাংশই ছিল তথ্যমূলক। সরকারের দোষ-ত্রুটি বা দুর্বলতা প্রকাশ পায় এমন ধরনের মূল প্রশ্নের সংখ্যা ছিল কম। এ সংসদে ৪৪৯৭টি সম্পূরক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। তন্মধ্যে সরকারি দলের সদস্যরা ১৫৯৫টি এবং বিরোধী দলের সদস্যরা ২৯০২টি সম্পূরক প্রশ্ন উত্থাপন করেন। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা বিভিন্ন অজুহাতে ১৩৩০টি সম্পূরক প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যান। এ সংসদে ১২টি স্বল্পকালীন নোটিশের প্রশ্ন উত্থাপিত হয় এবং ১১টির উত্তর প্রদান করা হয়। তবে এগুলোর ওপর সংসদে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়নি। দ্বিতীয় পার্লামেন্টে ৭১৭টি মুলতবী প্রস্তাবের নোটিশ পাওয়া যায়।

---

[১৬] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যবাহের সারাংশ*, ১৯৭৯-১৯৮২ (৭ খণ্ড), বিতর্ক, ৮ খণ্ড।

তন্মধ্যে সরকারি দলীয় সদস্যদের চারটি এবং বিরোধী দলীয় সদস্যদের ৭১৩টি প্রস্তাব ছিল। এর মধ্যে বিরোধী দলীয় সদস্যদের গৃহীত ৫২টি প্রস্তাবের মধ্যে ২২টির ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এগুলোর মধ্যে একটি মুলতবী প্রস্তাব গৃহীত হয়। তবে প্রস্তাবটি কোনো জাতীয় বিষয় সম্পর্কিত ছিল না। এটি ছিল ঢাকা শাহী কলেজের ম্যাগাজিনের বিষয়ের ওপর। এ সংসদে জরুরি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণের মোট ১৬২৫টি নোটিশ জমা পড়ে। তন্মধ্যে স্পিকার কর্তৃক ২৭৯টি গৃহীত হয়। তবে গৃহীত প্রস্তাবের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা ২৪২টির বিধি মোতাবেক বিবৃতি প্রদান করেন। এ ২৪২টি মনোযোগ আকর্ষণী প্রস্তাবের মধ্যে সরকার দলীয় সদস্যদের ছিল ১১৫টি এবং বিরোধী দলের সদস্যদের ছিল ১২৭টি। দ্বিতীয় সংসদে প্রদত্ত ৬৯২৮টি বেসরকারি সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের মধ্যে পার্লামেন্টে উত্থাপনের জন্য ২৭৪৩টি প্রস্তাব স্পিকার কর্তৃক গৃহীত হয়। তবে সংসদে মাত্র ৩৪টি উত্থাপিত হয়। তবে এ সংসদে কোনো বেসরকারি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। (সারণি ৪)

সারণি ৪ : দ্বিতীয় পার্লামেন্টে শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যকলাপের খতিয়ান

প্রশ্ন/প্রস্তাব	প্রদত্ত নোটিশের সংখ্যা	স্পিকার কর্তৃক গৃহীত	সংসদে উত্থাপিত ও আলোচিত	সংসদে গৃহীত
তারকাচিহ্নিত প্রশ্ন	২০৯০৪	৭২৯৪	৭২৯৪	-
সম্পূরক	-	৪৪৯৭	৩১৬৭	-
তারকাচিহ্নবিহীন প্রশ্ন	৯৮০	৮৫৬	৮৩০	-
স্বল্পকালীন নোটিশের প্রশ্ন	১০৮	২৩	১২	-
মূলতবী প্রস্তাব	৭১৭	৫২	২২	১
মনোযোগ আকর্ষণী প্রস্তাব	১৬২৫	২৭৯	৪২৪	-
সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রস্তাব	১৯০	২৭	১০	-
অর্ধ-ঘণ্টা আলোচনার প্রস্তাব	৫৬	১২	১	-
বেসারকারি সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব	৬৯২৮	২২৪৩	৩৪	শূন্য

উৎস: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যবাহের সারাংশ, ১৯৭৯-১৯৮২ (৭ খণ্ড), বিতর্ক, ৮ খণ্ড।

কমিটি ব্যবস্থা: দ্বিতীয় সংসদে ১৩টি সংসদীয় কমিটি ও ৩৬টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। দ্বিতীয় সংসদে গৃহীত ৪৯টি সাধারণ বিলের মধ্যে ১৬টি বিল মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে গৃহীত হয়। মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিগুলোর মধ্যে মাত্র একটি কমিটি (জনশক্তি উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ সম্পর্কিত কমিটি) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অনিয়ম সম্পর্কে তদন্ত করে সংসদে রিপোর্ট পেশ করে। তবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী কমিটির সভাপতি থাকায়

মন্ত্রণালয়ের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে খোলামেলা আলোচনা হয়নি। দ্বিতীয় সংসদে তিনটি বিল বাছাই কমিটিতে প্রেরিত হয়। তার মধ্যে একটি কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে গৃহীত হয়।

দ্বিতীয় পার্লামেন্টের সময় দেশে রাষ্ট্রপতিক পদ্ধতি প্রচলিত থাকায় শাসন বিভাগের কর্তৃত্বই প্রতিষ্ঠিত ছিল। সাংবিধানিকভাবেই জাতীয় সংসদের প্রাধান্য ছিল না। তাছাড়া জিয়াউর রহমান ১৯৭৯ সালে সামরিক আইন প্রত্যাহার করলেও তার সরকার সামরিক বাহিনীর প্রভাব হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেনি।

১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রামে একদল বিদ্রোহী সামরিক অফিসার কর্তৃক রাষ্ট্রপতি জিয়া নিহত হন। জেনারেল জিয়া নিহত হওয়ার পর উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার দেশের রাষ্ট্রপতি হন। কিন্তু ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ সেনাবাহিনী প্রধান হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদের নেতৃত্বে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি সাত্তার ক্ষমতাচ্যুত হন। সারাদেশে সামরিক আইন জারি এবং সংবিধান স্থগিত করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ ও সংসদ ভেঙ্গে দেয়া হয়।[১৭] ফলে গণতন্ত্রের যাত্রা ব্যাহত হয়। এরশাদের আমলে তৃতীয় ও চতুর্থ সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু সুষ্ঠু নির্বাচন না হওয়ায় এবং প্রধান দলগুলো অংশ না নেয়ায় সংসদ দু'টির বৈধতা ছিল না। তিনি স্বৈরাচারী কায়দায় দেশ শাসন করেছেন। ১৯৯০ সালের এক সফল অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে তার পতন ঘটে।

উপসংহার

সার্বিক আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়নি। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সফলতার অপরিহার্য শর্তগুলোর অধিকাংশই বাংলাদেশে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়নি। দেশে ব্যাপক জনগোষ্ঠী এখনও শিক্ষার সুযোগ হতে বঞ্চিত। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সহিষ্ণুতার অভ্যাস গড়ে উঠেনি। অধিকাংশ জনগণের আর্থিক নিরাপত্তা নেই। রাষ্ট্রের মৌলিক বিষয় নিয়েও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। দেশে সৎ, দক্ষ ও নিরপেক্ষ কর্মকর্তা-কর্মচারী গড়ে উঠেনি। স্বাধীন নির্বাচন কমিশন গঠন করা সম্ভব হয়নি। এমনকি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। তবে এ সব কারণ ছাড়াও বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকর না হওয়ার পেছনে নিবর্বর্ণিত কারণগুলোকে সরাসরি দায়ী করা যায়।

---

[১৭] Ataur Rahman, *Democratization in South Asia: Bangladesh Perspective* (Dhaka: Bangladesh Political Science Association, 2000), p.29.

(১) বাংলাদেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক দলেরই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি জোরালো অঙ্গীকার ছিল না।

(২) বাংলাদেশে গণতন্ত্রের চর্চার সময়কালটা ছিল খুবই অল্প। দেশে দীর্ঘ দিন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সামরিক শাসন চালু ছিল।

(৩) সরকারি ও বিরোধী দল উভয়ের মধ্যেই পার্লামেন্টকে এড়িয়ে চলার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

(৪) বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতন্ত্রের চর্চা বিরল।

(৫) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যৌথ নেতৃত্ব গড়ে উঠেনি। গোটা রাজনৈতিক পদ্ধতিই ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে।

(৬) বাংলাদেশে যে দল পরাজিত হয় সে দলই নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ তুলে এর রায় অস্বীকার করে এবং আন্দোলনের মাধ্যমে সে সরকার উৎখাতের আন্দোলন শুরু করে।

(৭) সুস্থ ও স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ গণতন্ত্রের সফলতার জন্য অপরিহার্য। কিন্তু বাংলাদেশে এ ধরনের পরিবেশ ছিল না।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, সপ্তদশ সংখ্যা ১৪১৬

সুরা মসজিদ : স্থাপত্যিক উৎস পর্যালোচনা

এ. টি. এম. রফিকুল ইসলাম*

Abstract: After the conquest of Bengal in 1204 A.D Bakhtyar Khilji built mosques. madrashah and khanqahs to create a new Muslim society in the newly conquered country. In later there are many buildings built by his successors. They brought with them many traits and characteristics of their own which were reflected on every aspect of their life as well as on the then architecture of this country. The rulers were naturally followed by many artisans' craftsmen and skilled manpower on every aspect of art to immigrate here for better living and livelihood. Under the rule of Muslim. Bengal architecture did not develop to that extent as was developed in the centre like Sura Masjid. The aim of the present article is to bring out to enlist some of the indigenous and extraneous elements of Bengal architecture. These elements are found in plan and ornamentation of the buildings as well as in the method of their construction.

ভূমিকা

সুলতানি বাংলার রাজধানী শহরেই কেবলমাত্র উল্লেখযোগ্য ইমারত গড়ে উঠে নি বরং এ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও নির্মিত হয়েছিল অসংখ্য স্থাপত্যকীর্তি। সে ধরনের একটি স্থাপত্যকীর্তি হলো সুরা মসজিদ। মসজিদটি দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট থানার উসমানপুর বাজার থেকে ৩ কি.মি. পশ্চিমে ঘোড়াঘাট-হিলি পাঁকা রাস্তা সংলগ্ন উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত। ঐতিহাসিক ঘোড়াঘাট দুর্গ থেকে এ মসজিদের দুরত্ব পশ্চিমে ৭ কি.মি.। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা একটি বৃহৎ দীঘির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মসজিদটি অবস্থিত। বর্তমানে মসজিদটি সুরক্ষিত অবস্থায় দণ্ডায়মান এবং বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের একটি সংরক্ষিত ইমারত।

ভূমি নকশা ও গঠনশৈলী (ভূমি নকশা ১ ও আলোকচিত্র ১)

মসজিদটি ১.৫২ মি. উচ্চতা বিশিষ্ট একটি বেদির উপর প্রতিষ্ঠিত। বেদিটির পরিমাপ উত্তর-দক্ষিণে ২১.৯০ মি. এবং পূর্ব-পশ্চিমে ২৮.৭০ মি.। পূর্ব দিকে একটি সিড়ি পথ বয়ে এ বেদিতে উঠতে হয়। একদা বেদির চতুর্দিকে ইষ্টক নির্মিত প্রশস্ত প্রাচীর ছিল এবং এ আবেষ্টনী প্রাচীরের পূর্ব দেয়ালে

* প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

একটি প্রবেশ তোরণ অদ্যাবধি অক্ষত অবস্থায় দণ্ডায়মান (আলোকচিত্র- ২)। বর্গাকার পকিল্পনায় নির্মিত এ মসজিদের নামাজগৃহের প্রতি বাহুর অভ্যন্তরীণ পরিমাপ ৪.৯০ মি.। নামাজগৃহটি আবার ইষ্টক নির্মিত সুবিশাল গম্বুজ দ্বারা পরিবৃত্ত যার আকৃতি অনেকটা উল্টানো চাঁড়ি বা বাটির ন্যায়। গম্বুজের ভার বহনের জন্য প্রতি দেয়ালে দুটি করে মোট আটটি প্রস্তর স্তম্ভ এবং কোণাগুলোতে স্কুইঞ্চ পদ্ধতির ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। এ মসজিদের নামাজগৃহের সম্মুখে একটি প্রশস্ত বারান্দা সন্নিবেশিত যার দৈর্ঘ্য ৪.৯০ মি. ও প্রস্থ ১.৮২ মি. এবং বারান্দার উপর তিনটি উল্টানো চাঁড়ি বা বাটি সদৃশ গম্বুজ (Hemispherical Dome) সরাসরি ছাদের উপর সংস্থাপিত। মসজিদের অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য বারান্দায় দ্বি-কেন্দ্রিক খিলানযুক্ত তিনটি প্রবেশপথ রয়েছে যার মধ্যবর্তীটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। এ প্রবেশপথগুলো বরাবর নামাজগৃহের পূর্ব দেয়ালে অনুরূপ খিলানযুক্ত তিনটি প্রবেশপথ বিদ্যমান। প্রবেশপথ বরাবর কিবলা দেয়ালে রয়েছে প্রস্তর নির্মিত তিনটি অবতল মিহরাব। তাছাড়া নামজগৃহের উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে একটি করে খিলানযুক্ত দরজা রয়েছে যা বর্তমানে জানালা হিসেবে ব্যবহৃত। অনুরূপভাবে বারান্দার উত্তর ও দক্ষিণ দিকেও একটি করে খিলান পথ বিদ্যমান।

মসজিদের নামাজগৃহের চার কোণায় চারটি এবং বারান্দার উভয় কোণায় দুটি মোট ছয়টি অষ্টাভুজাকৃতির বুরুজ রয়েছে যেগুলো ব্যান্ড দ্বারা বিভক্ত এবং মসজিদের কার্নিশ বরাবর উত্থিত। কোণস্থিত বুরুজগুলো একদা প্রস্তর আস্তরণে আবৃত ছিল যার চিহ্ন এখনও লক্ষ্য করা যায়। মসজিদের কার্নিশ বক্রাকার এবং প্রবেশপথের স্থলে বিযুক্ত একটি আনুভূমিক প্রস্তর বন্ধন (Stone string course) মসজিদের বহির্গাত্রকে মোটামুটি দুটি অংশে বিভক্ত করেছে।

অলঙ্করণ

মসজিদের আবেষ্টনী প্রাচীরের প্রধান প্রবেশপথের উভয় পার্শ্বে পোড়ামাটির ফলক নকশা বিদ্যমান। এর খিলান পার্শ্বস্থ ত্রিকোণাকার ভূমি পদ্ম ফুলের নকশায় সুশোভিত। কোণস্থিত বুরুজগুলো ব্যান্ড নকশায় অলঙ্কৃত। মসজিদের নামাজগৃহের উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালের বহির্গাত্রে প্যানেল আকৃতির পোড়ামাটির ফলক নকশা পরিলক্ষিত হয় যেগুলো বিভিন্ন ফুল, লতা-পাতার অলঙ্করণ সমৃদ্ধ (আলোকচিত্র-৩)। মসজিদের কার্নিশের নিচে আনুভূমিক মোল্ডিং এর নীচে এবং উপরে এক ধরণের অ্যাবাকাস (abacus) নকশা সমগ্র দেয়ালের দৈর্ঘ্য বরাবর রচিত। এর উপরিভাগ দিয়ে এক ধরণের সর্পফনা নকশা বিদ্যমান। মসজিদের অভ্যন্তরে মিহরাবের আলঙ্কারিক কোণ দণ্ড বিশেষ আকর্ষণীয়। মিহরাবের ত্রিকোণাকার ভূমিতে নানা ধরনের গাছপালার নকশা পরিদৃশ্যমান। আয়তাকার প্যানেলের অভ্যন্তরে রোজেট নকশা এবং এর উপরে ও পার্শ্বে তারা ফুলের নকশা বিদ্যমান। প্যানেলের উপরে আর এক সারি তারা ফুল সম্বলিত পাড় নকশা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। এ প্যানেল নকশার উভয় পার্শ্বে তিনটি করে প্রস্তর প্যানেল নকশা খোদিত যার অভ্যন্তরে শিকল-ঘন্টা নকশা উৎকীর্ণ । আবার প্যানেলের উপরে যে খিলান নকশা খোদিত তাও কৌণিক ও সন্মুখভাগ বহু খাঁজ বিশিষ্ট (আলোকচিত্র ৪)।

নির্মাণ তারিখ

এ মসজিদের কোন শিলালিপি পাওয়া যায় নি অথবা সমসাময়িক সাক্ষ্য থেকে এর সঠিক কোন নির্মাণ তারিখ পাওয়া যায় না। তবে ভূমি নকশা ও গঠনশৈলী যেমন- বর্গাকৃতির ভূমি নকশা ও বারান্দার সংযোজন, বক্রাকার কার্নিশ, কার্নিশ বরাবর উত্থিত অষ্টভুজাকৃতির কোণ বুরুজ, পোড়ামাটির ফলক

নকশার ব্যবহার, কোণ বুরুজে ব্যবহৃত প্রস্তর আস্তরণ ও প্রস্তর নির্মিত মিহরাব প্রভৃতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যাবলী বাংলার স্থাপত্যে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত যেমন- পান্ডুয়ার একলাখী সমাধি (পঞ্চদশ শতাব্দী), গৌড়ের খানিয়াদীঘি মসজিদ (১৪৬৫ খ্রি.), দরাসবাড়ী মসজিদ (১৪৭৯ খ্রি.), ছোটসোনা মসজিদ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.), রাজশাহীর বাঘা মসজিদ (১৫২৩ খ্রি.), নওগাঁর কুসম্বা মসজিদ (১৫৫৮ খ্রি.) প্রভৃতি ইমারতসমূহে ব্যাপক ভাবে অনুসৃত হয়েছে। সুতরাং আলোচ্য মসজিদে ব্যবহৃত উক্ত বৈশিষ্ট্যাবলীর আলোকে অনুমিত হয় যে, মসজিদটি পঞ্চদশ অথবা ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত। অবশ্য পোড়ামাটির ফলক নকশার ব্যবহার ও প্রস্তর মিহরাবের সুক্ষ্ম কারুকার্য দেখে অনুমিত হয় যে, এটি হোসেনশাহী আমলে (১৪৯৩-১৫৩৮ খ্রি.) নির্মিত একটি স্থাপত্যকীর্তি।[১]

পর্যালোচনা

বাংলার মুসলিম স্থাপত্যশিল্পের ইতিহাসে বারান্দা বিশিষ্ট এক গম্বুজ মসজিদ নির্মাণের রীতি এক নতুন সংযোজন। সুরা মসজিদ এ রীতির এক অনন্য উদাহরণ। এ মসজিদ সম্পর্কে হুইলার বলেন, মসজিদের নামাজ গৃহের সম্মুখে বারান্দা এবং বারান্দার উভয় কোণে দুটি অতিরিক্ত বুরুজ সংযোজনের ফলে বড়সোনা মসজিদের (১৫২৬ খ্রি.) ন্যায় সুরা মসজিদ বাংলার স্থাপত্যে এক নতুন রীতির সুচনা করেছে।[২] এ. এইচ. দানী সুরা মসজিদের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, মসজিদটি ইটের তৈরি ও বেশ কিছুটা উচ্চতা পর্যন্ত প্রস্তর আস্তরণে আচ্ছাদিত এবং এর প্রস্তর খোদিত অলঙ্করণসমূহ গৌড়ের ছোটসোনা মসজিদে (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.) ব্যবহৃত অলঙ্করণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।[৩] কিন্তু বর্তমানে সুরা মসজিদের দেয়ালগাত্রে কোন প্রস্তরাবরণ নেই বরং এর দেয়ালগাত্র পোড়ামাটির ফলক নকশায় সুশোভিত (আলোকচিত্র-৩)। এ ধরনের কারুকার্য রাজশাহী জেলার বাঘা মসজিদে (১৫২৩ খ্রি.) লক্ষ্য করা যায়।[৪] এ মসজিদের কোণ বুরুজে ব্যবহৃত প্রস্তর আস্তরণ এবং প্রস্তর নির্মিত মিহরাব (আলোকচিত্র-৪) বর্তমান নওগাঁ জেলার মান্দা থানায় অবস্থিত কুসম্বা মসজিদের (১৫৫৮ খ্রি.) সঙ্গে যথেষ্ঠ সাদৃশ্যপূর্ণ।[৫] কেউ কেউ মসজিদটিকে ভূমি নকশা ও গঠনশৈলীর দিক থেকে গৌড়ের লট্টন মসজিদের (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.) সঙ্গে তুলনা করেছেন।[৬] ভূমি নকশার দিক থেকে উভয় মসজিদর মধ্যে যথেষ্ঠ সাদৃশ্য থাকলেও গঠনশৈলীর দিক থেকে উভয় মসজিদের মধ্যে এক বিশেষ বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। লট্টন মসজিদের বারান্দার মধ্যভাগে বাংলার চৌচালা রীতির ছাদ ও উভয় পার্শ্বে দুটি

---

[১] এ. এইচ. দানী, *মুসলিম আর্কিটেকচার ইন বেঙ্গল* (ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান, ১৯৬১), পৃ. ১৬১।

[২] আর. ই. এম. হুইলার, *ফাইভ থাউজেন্ড ইয়ার্স অব পাকিস্তান* (লন্ডন : রয়েল ইন্ডিয়া এন্ড পাকিস্তান সোসাইটি, ১৯৫০), পৃ. ১১৭।

[৩] এ. এইচ. দানী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬১।

[৪] এম. হাফিজুল্লাহ খান, *টেরাকোটা অরনামেন্টাশন ইন মুসলিম আর্কিটেকচার অব বেঙ্গল* (ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৮৮), পৃ. ১৮৭।

[৫] জি. মিচেল (সম্পা.), *দি ইসলামিক হেরিটেজ অব বেঙ্গল*, (প্যারিস : ইউনেস্কো, ১৯৮৪), পৃ. ১৩৪।

[৬] এ. এইচ. দানী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬১; এম. হাফিজুল্লাহ খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮৬।

অর্ধ-বৃত্তাকৃতির গম্বুজ বিদ্যমান।[৭] অথচ এ মসজিদের বারান্দার উপর তিনটি অর্ধ-বৃত্তাকৃতির গম্বুজ সংস্থাপিত (আলোকচিত্র-১)। এ ধরনের স্থাপত্য উদাহরণ গৌড়ের খানিয়াদীঘি মসজিদ (১৪৩৭-৮৭ খ্রি.) ও বারোবাজারের গোড়ার মসজিদে (পঞ্চদশ শতাব্দী) লক্ষ্য করা যায়।[৮] বাংলার স্থাপত্যে এ ধরণের বারান্দাযুক্ত এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের প্রথম জ্ঞাত উদাহরণ হলো দিনাজপুর জেলার গোপালগঞ্জ মসজিদ (১৪৬০ খ্রি.)।[৯] সুরা মসজিদ গোপালগঞ্জ মসজিদেরই প্রতিচ্ছবি বলে মনে হয়। তাছাড়া মসজিদটি যে উচু বেদির উপর প্রতিষ্ঠিত একদা তার চতুর্দিকে বলিষ্ট প্রাচীর বেষ্টিত ছিল। মসজিদকে বাইরের কোলাহল থেকে মুক্ত করার নিমিত্তে এ আবেষ্টনী প্রাচীর নির্মিত হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়। এ ধরনের আবেষ্টনী প্রাচীর অনেকটা আব্বাসীয় আমলে নির্মিত সামাররা মসজিদ (৮৪৮-৫২ খ্রি.), আবু দুলাফ মসজিদ (৮৫৯-৬১ খ্রি.) ও ইবনে তুলনের মসজিদের (৮৭২-৮৬ খ্রি.) যিয়াদার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।[১০] সুরা মসজিদের অনুরূপ ভূমি পরিকল্পনা বর্তমান নওগাঁ জেলার মান্দা থানায় অবস্থিত কুসম্বা মসজিদেও দেখা যায়।[১১]

বাংলার স্থাপত্যে বারান্দাযুক্ত এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ নির্মাণের রীতি কোন নতুন উদাহরণ নয় বরং এর উৎপত্তি আরও অনেক গভীরে। জানা যায় যে সেলযুক ও প্রথম উসমানীয় শাসনামলে তুরস্কের আনাতোলিয়াতে উক্ত রীতিতে মসজিদ নির্মাণ যথেষ্ঠ জনপ্রিয় ছিল।[১২] সন্মুখে স্বল্প পরিসরে বারান্দাযুক্ত বর্গাকৃতির মসজিদগুলোর মধ্যে কারামানের বাইলিক দাবগাডোস মসজিদ, ব্রুসার আলাউদ্দীনের মসজিদ (১৩২৬ খ্রি.), হাজী উজবেকের মসজিদ (১৩৩৩ খ্রি.), ইজনিকের গ্রীন মসজিদ (১৩৭৫ খ্রি.), ইস্তাম্বলের ফিরূজ আগা মসজিদ (১৪৯০ খ্রি.) ও মুদারানের ইলদ্রিন বাইজিদ মসজিদ (১৩৮২ খ্রি.) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।[১৩] তুর্কী স্থাপত্যের এ নির্মাণ রীতিটি পরবর্তীতে ভারতবর্ষে

---

[৭] এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, *আসপেক্টস অব সোসাইটি এন্ড কালচার অব দি বরেন্দ্র* (রাজশাহী : এম. সাজ্জাদুর রহিম, শ্যালিমার ভিলা, ১৯৯৮), পৃ. ২৮৬; এম. এ. বারী, "খলিফাতাবাদ ঃ এ ষ্টাডি অব ইটস হিষ্ট্রি এন্ড মুনমেন্টস", অপ্রকাশিত এম. ফিল. থিসিস, আই. বি. এস., রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮০), পৃ. ২১৮, পাদটীকা-৩; জি. মিচেল (সম্পা.), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৭।

[৮]এইচ. দানী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১২; জি. মিচেল (সম্পা.), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮১; সাদ আহম্মদ, *বারোবাজারের ইতিহস ও ঐতিহ্য* (অপ্রকাশিত এম. ফিল. অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১), পৃ. ৯৭।

[৯] এস. এম. হাসান, *মস্কস আর্কিটেকচার অব প্রি-মুঘল বেঙ্গল* (ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭৯), পৃ. ১১৪।

[১০]কে. এ. সি. ক্রেসওয়েল, *এ শর্ট একাউন্ট অব আরলী মুসলিম আর্কিটেকচার* (নিউইয়র্ক : পেঙ্গুইন বুকস, ১৯৫৮), পৃ. ২৭৭, ২৮৪ ও ৩০৬; এ. বি. এম. হোসেন, *আরব স্থাপত্য* (ঢাকা : শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৭৯), পৃ. ২১৩, ২২১ ও ২৪৭।

[১১]এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮৬, রেখাচিত্র-৬।

[১২] এম. এ. বারী, "মুঘল মস্কস টাইপস ইন বাংলাদেশ ঃ অরিজিন এন্ড ডেভলপমেন্ট", অপ্রকাশিত পিএইচ. ডি থিসিস, আই. বি. এস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৯, পৃ. ৩৪৪।

[১৩]বি. উস্গাল, *টার্কিশ ইসলামিক আর্কিটেকচার* (লন্ডন : অ্যালেক টাইরেনটি, ১৯৫৯), পৃ. ১৯-২০, প্লান-৩ ডি ও পৃ. ২০-২২, প্লান-৪ ডি ই এফ; এ. কুরান, *দি মস্কস ইন আরলী অটোমান আর্কিটেকচার* (শিকাগো : ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৮), পৃ. ৩১-৪৯।

অনুসৃত হয় এবং আহমদাবাদের দারিয়া খানের সমাধি (১৪৫৩ খ্রি.) এর অন্যতম উদাহরণ।[১৪] ভারতীয় এ নির্মাণ রীতিটি পরবর্তীতে বাংলার স্থাপত্যে অনুপ্রবেশ করে। উদাহরণস্বরূপ দিনাজপুরের গোপালগঞ্জ মসজিদ (১৪৬০ খ্রি.), পটুয়াখালীর মসজিদবাড়ী মসজিদ (১৪৬৫ খ্রি.), গৌড়ের চামকাটি মসজিদ (১৪৭৯ খ্রি.), খানিয়াদীঘি মসজিদ (১৪৩৭-৮৭ খ্রি.), লট্টন মসজিদ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.), সিলেটের শঙ্করপাশা মসজিদ (পঞ্চদশ শতাব্দী), মুর্শিদাবাদের খেরুয়াল মসজিদ (১৪৯৪-৯৫ খ্রি.), বারোবাজারের গোড়ার মসজিদ (পঞ্চদশ শতাব্দী), সিংদহ আউলিয়া মসজিদ (পঞ্চদশ শতাব্দী), দেবকোটের রোকনখান মসজিদ (১৫৫২ খ্রি.) এমন কি আলোচ্য মসজিদের কথা বলা যেতে পারে। বলা বাহুল্য বাংলার মসজিদ স্থাপত্যের ইতিহাসে বারান্দা বিশিষ্ট এক গম্বুজ মসজিদ নির্মাণ রীতির প্রয়োগ সুলতানি আমলে যতটা প্রসার ঘটেছিল মোগল আমলে ততটা দেখা যায় না। অবশ্য সমগ্র মোগল স্থাপত্যে উক্ত রীতিতে নির্মিত দু-একটি ইমারতের পরিচয় পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ টাঙ্গাইলের আতিয়া মসজিদের (১৬০৯ খ্রি.) কথা বলা যেতে পারে।[১৫]

সুরা মসজিদের গম্বুজসমূহ সরাসরি ছাদের উপর উল্টানো চাঁড়ি সদৃশ বা বাটির আকারে নির্মিত। উল্টানো চাঁড়ি বা বাটি সদৃশ গম্বুজ আকারের অবকাঠামো খ্রিষ্ট পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে নির্মিত অজান্তা, ইলোরা প্রভৃতি গুহার স্তূপায় দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ অজান্তার চৈতি হলের স্তূপারোপিত গম্বুজাকৃতির অবকাঠামোর কথা বলা যায়।[১৬] প্রসঙ্গক্রমে এস. এম. হাসান উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "Buddhist votive stones and the solid dome canopy over the standing Buddha figures in the *Ajanta Caves* no doubt betray earliest forms of domical construction"।[১৭] গম্বুজের এ ধরণের আকৃতি একমাত্র বাংলার মুসলিম স্থাপত্য ছাড়া মুসলমানদের অন্য কোন অঞ্চলের ইমারতে পরিলক্ষিত হয় না। এটি স্থানীয় নির্মাণ রীতি না হলেও বাংলার স্থপতিদের নিজস্ব উদ্ভাবন বলা যেতে পারে।

আবার গম্বুজ নির্মাণের ক্ষেত্রে বর্গ থেকে গম্বুজের বৃত্তাকার নিম্নাংশে পৌছানোর জন্য অবস্থান্তর পর্যায় কৌশলগত দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ মসজিদে উক্ত পর্যায়ে স্কুইঞ্চ খিলানের ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয় (রেখাচিত্র-১) যা বাংলার মুসলিম স্থাপত্যের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অবস্থান্তর পর্যায়ে স্কুইঞ্চ খিলানের ব্যবহার সুপরিচিত একটি পারসিক প্রথা যা আকিমেনীয়দের সময় হতে পারসিক স্থাপত্যে সুচারুরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।[১৮] এ রীতির উৎপত্তি সাসানীয় স্থাপত্যে এবং খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী থেকে সাসানীয় স্থাপত্যে যে এর প্রয়োগ দেখা যায় তার উদাহরণ হলো সার্বিস্থানের সাসানীয় প্রাসাদ।[১৯]

---

[১৪]সুলতান আহমদ, "আর্কিওলজি অব দি মুসলিম টাউনস অব গুজরাট উইথ স্পেশাল রেফারেন্স টু দেয়ার মুনমেন্টস", অপ্রকাশিত পিএইচ. ডি থিসিস, বরোদা, ভারত, ১৯৮০), পৃ. ১৪০-৪৩।

[১৫]এম. এ. বারী, *মুঘল মস্কস, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৪৩ ff.

[১৬]পি. ব্রাউন, *ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার* (হিন্দু এণ্ড বুদ্ধিষ্ট পিরিয়ড), বোম্বে, ১৯৭৮, প্লেট-এল,আলোকচিত্র-১।

[১৭]এস. এম. হাসান, *মস্কস আর্কিটেকচার, পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭৪।

[১৮]এ. বি. এম. হোসেন, *আরব স্থাপত্য, পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬২।

[১৯]ডি. এন. উইলবার, *দি আর্কিটেকচার অব দি ইসলামিক ইরান* (নিউজার্সী : প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৫৫), পৃ. ৭২; বি. ফ্লেচার, *এ হিষ্ট্রি অব আর্কিটেকচার* (লন্ডন : দি অ্যাথলনি প্রেস, ১৯৯৬), পৃ.

ইসলামি স্থাপত্যে সর্বপ্রথম স্কুইঞ্চ খিলানের ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয় দামেস্ক জামে মসজিদে (অষ্টম শতাব্দী)।[২০] পরবর্তীতে স্কুইঞ্চ খিলানের ব্যবহার পারসিক স্থাপত্যে চরম উৎকর্ষতা লাভ করে। উদাহরণস্বরূপ ইস্পাহান জামি (১০৮০-৮৮ খ্রি.), ইয়াজদের জামি (১০৩৭ খ্রি.), কাজভীনের জামি (১১১৩ খ্রি.), গুলপাইগানের জামি (১১০৪-১৮ খ্রি.), আরদিস্থানের জামি (১১৫৫ খ্রি.) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যে এ রীতির প্রয়োগ সর্বপ্রথম দিল্লীর ইলতুৎমিসের সমাধিতে (১২৩৫ খ্রি.) লক্ষ্য করা যায় যা আলাই দরজাতে (১২১১-৩৬ খ্রি.) পরিপূর্ণতা লাভ করে।[২১]

নির্মাণ উপকরণ হিসেবে এ মসজিদে ব্যবহৃত হয়েছে পোড়ান ইট। পাথরের অপ্রতুলতা থাকায় পলি মাটি দ্বারা তৈরি ইট এ অঞ্চলের স্থাপত্য গড়ায় মূখ্য ভুমিকা পালন করে। প্রস্তর নির্মিত ইমারত কেবল বাংলার পশ্চিমাংশে অর্থাৎ বাঁকুরা বীরভূম ও বর্ধমান জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কেননা এসব জেলায় রাজমহল ও বিহার থেকে প্রস্তর আমদানী করা যতটা সহজ ছিল বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে ততটা সহজ ছিল না। তবে কোন কোন ইটের তৈরি ইমারতে সামান্য কিছু প্রস্তরের ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। প্রবেশপথের চৌকাঠ, দেয়ালগাত্রের আর্দ্রতা নিধোরক এবং স্তম্ভ, মিহরাব ও সর্দল হিসেবে প্রস্তরের ব্যবহার দেখা যায়। সুতরাং মোগল আমলে পোড়ান ইটের বহুল ব্যবহার হয়। তার পূর্বে অর্থাৎ সুলতানি আমলে তা না হওয়ায় সম্পূরক হিসেবে পাথর বেশী ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ ছোটসোনা মসজিদ, গুন্মান্ত মসজিদ, বড়সোনা মসজিদ, কুসম্বা মসজিদ ও আলোচ্য মসজিদের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সাধারণত সুলতানি আমলের মসজিদে ব্যবহৃত কালো প্রস্তর রাজমহল হতে এবং বেলে প্রস্তর ও গ্রানাইট বিহার হতে আমদানী করা হতো।[২২] তবে স্থানীয় অমুসলিম ইমারতের ধ্বংসাবশেষ থেকে সংগৃহীত পাথর যে একেবারে ব্যবহৃত হয়নি একথা জোর দিয়ে বলা যায় না। বাংলার ইট নির্মিত এসব মসজিদের স্থায়ীত্ব মোটেও কম নয়। কারণ এ সময়ের ইট আকারে ক্ষুদ্র ও পাতলা করা হতো এবং ইট পোড়ান হতো অত্যন্ত ভালো করে। ফলে এসব শক্ত ইটে নির্মিত আলোচ্য মসজিদটি এখনও কালের স্বাক্ষী হিসেবে দাঁড়িয়ে থেকে অতীত কীর্তি বহন করছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে একলাখী সমাধি (পঞ্চদশ শতাব্দী) বাংলার ইট নির্মিত মুসলিম স্থাপত্যের সম্ভবত সর্বপ্রথম উদাহরণ হিসেবে বিবেচ্য[২৩] এবং এরপর থেকেই বাংলায় ইট দ্বারা ইমারত নির্মাণ সাধারণ রীতি হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। শুধু বাংলাতেই নয় ভারত উপমহাদেশে মুলতান, গুজরাট, ঢোলকা এবং দক্ষিণাত্যের বিদর ও গুলবর্গায় কতিপয় ইটের তৈরি মসজিদ, মাদ্রাসা ও মাজারের অস্তিত্ব দেখা

৫৭৫; এ. এউ. পোপ, *পারসিয়ান আর্কিটেকচার* (নিউইয়র্ক : জর্জ ব্রাজিলার, ১৯৬৫), পৃ. ৫৯, আলোকচিত্র-৫৪।

[২০]এস. এম. হাসান, *গ্লিম্পস অব মুসলিম আর্ট এন্ড আর্কিটেকচার* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩), পৃ. ২২৩।

[২১]আর. নাথ, *হিষ্ট্রি অব সুলতানাত আর্কিটেকচার* (নিউ দিল্লী : অভিনব পাবলিকেশন্স, ১৯৭৮), পৃ. ৩৯, রেখাচিত্র-১৮। অবস্থান্তর পর্যায়ে স্কুইঞ্চ খিলান ব্যবহারের মাধ্যমে আলাই দরজার গম্বুজকে একটি অষ্টভূজী পিপার উপর স্থাপন করা হয়েছে, দেখুন- এম. মোখলেছুর রহমান, *সুলতানী আমলে মুসলিম স্থাপত্যের বিকাশ* (রাজশাহী : প্রেস প্রকাশনা ও জনসংযোগ দপ্তর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬), পৃ. ৭৫।

[২২]এ. এইচ. দানী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০।

[২৩]*তদেব*, পৃ.৭৫।

যায়।[২৪] তবে একথা অনস্বীকার্য যে, নির্মাণ উপাদান ও আলঙ্কারিক উপকরণ হিসেবে ইটের ব্যবহার আব্বাসীয় ও পারসিক স্থাপত্যে[২৫] যতটা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল বাংলার বাইরে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে পাথরের পর্যাপ্ততা থাকায় ইট বা অলঙ্করণ সমৃদ্ধ ইট ব্যবহারের প্রয়োজন হয়নি। একই কারণে বাংলায় তা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। অনুরূপভাবে বাংলার বৌদ্ধ স্থাপত্যে ইটের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। তবে প্রাক মুসলিম ইমারতের ইটগুলো ছিল বৃহদাকৃতির (পরিমাপ : ১৮″ × ১২″ অথবা $১৫\frac{১}{২}'' \times ১০\frac{৭}{৮}''$), অথচ মুসলিম স্থাপত্যে ব্যবহৃত ইটগুলো ছিল ক্ষুদ্রাকৃতির।[২৬] বর্তমানকালের ন্যায় প্রাচীনকালেও বাংলার মন্দির স্থাপত্যের প্রথম ও প্রধান নির্মাণ উপকরণ ইট এবং দ্বিতীয় স্থানে ছিল প্রস্তর যার কারণ পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।[২৭]

সুরা মসজিদের কার্নিশ বক্রাকার। বাংলায় প্রচলিত বাঁশের বেড়ার ঘরের পরিকল্পনা হতে (রেখাচিত্র-২) সম্ভবত বক্র কার্নিশের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। বাংলার এ আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত মুসলিম স্থাপত্যের প্রাচীনতম উদাহরণ হলো হযরত পান্ডুয়ার একলাখী সমাধি।[২৮] সুলতানি আমলে নির্মিত বাংলার অসংখ্য মসজিদে বক্র কার্নিশের পরিচয় মিলে যা স্থানীয় শিল্পীদের অবদান। বাংলার এ স্থানীয় নির্মাণ রীতিটি পরবর্তীতে দিল্লীর মোগল স্থাপত্যে ব্যাপকভাবে অনুসৃত হতে দেখা যায়।[২৯] বাংলার দেশজ উপাদান হতে গৃহীত এ নির্মাণশৈলী মোগল প্রভাবিত রাজপুত স্থাপত্যের পাশাপাশি বাংলার মন্দির স্থাপত্যকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করে।[৩০]

আলোচ্য মসজিদে ব্যবহৃত কোণ বুরুজগুলো অষ্টকোণাকৃতির ও ব্যান্ড দ্বারা বিভক্ত। বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে সম্ভবত একলাখী সমাধিতে সর্বপ্রথম এ ধরনের বুরুজের ব্যবহার দেখা যায়। এটি

---

[২৪]সাদ আহম্মদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২০।

[২৫]Brick was an accepted building material throughout the whole ancient Near-East, for the handmolded plano-convex brick had been invented in Persia by the third millennium B.C., দেখুন- এ. ইউ. পোপ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৯।

[২৬]খোন্দকার আলমগীর, "ইন্ডিজেনাস এন্ড এক্সট্রানিয়াস এলিমেন্টস অব সুলতানাত আর্কিটেকচার অব বেঙ্গল", অপ্রকাশিত পিএইচ. ডি থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২, পৃ. ৩৭; এস. এম. হাসান, *মস্কস আর্কিটেকচার*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬৭।

[২৭]কাজী মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, "বাংলার মন্দির স্থাপত্যে মুসলিম প্রভাব," *গবেষণা পত্রিকা* (কলা অনুষদ),৩য় সংখ্যা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৭-৯৮, পৃ. ১৭২। অবশ্য আদিম যুগে ইটের ব্যবহারও যখন প্রচলিত ছিল না তখন বাংলার দেবালয়গুলো কাঠ, খড় ও বাঁশের উপকরণে নির্মিত হতো, দেখুন- অমিয় কুমার বন্দোপাধ্যায়, *বাঁকুড়ার মন্দির* (কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, বাংলা ১৩৭১), পৃ. ৯৯।

[২৮]জি. মিচেল (সম্পা.), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৩।

[২৯]In the 17th century buildings to Delhi and Lahore have curved roofs and eaves, i.e. Moti Masjid (1662) at Delhi Fort and Naulakha Pavilion (1640) at Lahore Fort, দেখুন-এ. এইচ. দানী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩, পাদটীকা-৩; পি. ব্রাউন, *ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার ইসলামিক পিরিয়ড*, (দিল্লী : তারাপুরভ্যালা এন্ড সন্স কো. লি., ১৯৭৬), পৃ. ১১২, আলোকচিত্র- ফ্রন্টপেজ; ই. কোচ, *মুঘল আর্কিটেকচার ঃ অ্যান আউটলাইন হিষ্ট্রি*, (ভিয়েনা : প্রিষ্টাল, ১৯৯১), পৃ. ১১৫, আলোকচিত্র-১৩৬।

[৩০]কাজী মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, "বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে দেশজ উপাদান," *রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ*, ভলিয়্যম-৩৩, পার্ট-এ, ২০০৫, পৃ.৬৪।

বাংলার মুসলিম স্থাপত্যের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বাংলার স্থাপত্যে অষ্টকোণাকৃতির বুরুজ সংযোজনের ধারণা এ দেশের গ্রামঞ্চলের বাঁশ, খড় বা ছনে নির্মিত কুঁড়েঘরের চারকোণে স্থাপিত চারটি বাঁশের খুঁটির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে হয়। দোচালা কিংবা চৌচালা কুঁড়েঘরের অবকাঠামো মূলত চার কোণার চারটি খুঁটি এবং তদুপরে চতুর্ভুজাকারে সংযুক্ত বাঁশের কাঠামোর উপর দণ্ডায়মান থাকে। কোণের চারটি খুঁটি সমগ্র কাঠামোকে শক্ত করে ধরে রাখে। বাংলার কুঁড়েঘর নির্মাণের এ রীতিটি মুসলিম স্থাপত্যে চারকোণের চারটি বুরুজ হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ শাহের রাজত্বকালে (১৪১৫-৩২ খ্রি.) এ ধরণের নির্মাণ রীতির বিকাশ ঘটে।[৩১] যদিও উমাইয়া ও আব্বাসীয় আমলে নির্মিত যেমন- কুসাইর আমরা (৭৪৪ খ্রি.), কাসর আল-হাইর আল-গারবী (৭২৭ খ্রি.), কাসর আল-হাইর আস-শরকী (৭২৮-২৯ খ্রি.), মাসাত্তা (৭৪৩-৪৪ খ্রি.), বাগদাদ (৭৬২-৬৬ খ্রি.), রাক্কা (৭৭২ খ্রি.), উখাইদির (৭৭৮ খ্রি.), সামাররা (৮৩৬ খ্রি.) প্রভৃতি প্রাসাদ ও দুর্গ নগরীতে এবং পরবর্তীতে ভারতবর্ষের তুঘলক স্থাপত্যে[৩২] ইমারত সুদৃঢ়করণে বুরুজের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় তথাপি ঐ সব বুরুজের চেয়ে বাংলার স্থাপত্যের চারকোণায় ব্যবহৃত বুরুজগুলো ভিন্নতর ও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।[৩৩] সুতরাং এ কথা অনুমেয় যে, বাংলার দোচালা কিংবা চৌচালা কুঁড়েঘরের চারকোণার বাঁশের খুঁটির অনুকরণেই ইমারতে কোণস্থিত বুরুজগুলো নির্মিত হয়েছিল।

দ্বি-কেন্দ্রিক খিলানের (রেখাচিত্র-৩) ব্যবহার সুলতানি বাংলার স্থাপত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যার অন্যতম উদাহরণ হলো সুরা মসজিদ (আলোকচিত্র-২)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, দ্বি-কেন্দ্রিক কৌণিক খিলানের ব্যবহার বাংলার স্থাপত্যের বহু পূর্বেই বহির্বিশ্বের মুসলিম স্থাপত্যে পরিদৃষ্ট হয়। এস. এম. হাসানের মতে, "The earliest example of the two centred variety of true pointed arch appeared the *Qasr ibn Wardan* in syria, dated A. D. 561-64".[৩৪] পরবর্তীকালে উমাইয়া আমলে দ্বি-কেন্দ্রিক খিলান নির্মাণের ধারা ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়েছে। যাহোক উমাইয়া আমলে ঈষৎ কৌণিক খিলান ব্যবহৃত হলেও মূলত: আব্বাসীয় আমলেই দ্বি-কেন্দ্রিক কৌণিক খিলান নির্মাণের রীতি ব্যাপক প্রসার লাভ করে। উখাইদিরের ভন্ট সামান্য কৌণিক হলেও ক্রেসওয়েলের মতে, রামালার চৌবাচ্চায় সর্বপ্রথম কৌণিক খিলান ব্যবহৃত হয়।[৩৫] পরবর্তীতে পারস্যের দামগান (অষ্টম শতাব্দী) ও নায়িন মসজিদে (নবম শতাব্দী) দ্বি-কেন্দ্রিক কৌণিক খিলানের ব্যবহার দেখা যায় যা ইবনে তুলনের মসজিদে (৮৭২-৮৬ খ্রি.) বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও সার্বজনীন উপাদানে

---

[৩১]এ. এইচ. দানী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪; কাজী মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, "বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে দেশজ উপাদান," *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬১।

[৩২]তুঘলক স্থাপত্যের বুরুজগুলো ছিল গোলাকৃতির ও অবনমন সম্বলিত, দেখুন- এ. এইচ. দানী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৬; এস. হ্রোভার, *দি আর্কিটেকচার অব ইন্ডিয়া ইসলামিক ৭২৭-১৭০৯* (দিল্লী : বিকাশ পাবলিশিং হাউস লি., ১৯৮১), পৃ. ৪৩, আলোকচিত্র- ২.১৮।

[৩৩]বাংলার মুসলিম স্থাপত্যের কোণ বুরুজগুলো কখনো গোলায়িত আবার কখনো অষ্টভূজাকার বা বহুভূজাকার ও বাঁশের গিটের ন্যায় (ব্যান্ড দ্বারা বিভক্ত) বিভন্ন স্তরে নির্মিত।

[৩৪]এস. এম. হাসান, *মস্কস আর্কিটেকচার*,*পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭২।

[৩৫]কে. এ. সি. ক্রেসওয়েল, *এ শর্ট একাউন্ট*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯৫; এ. বি. এম. হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯৮।

পরিণত হয়।[৩৬] দ্বি-কেন্দ্রিক কৌণিক খিলান নির্মাণের রীতিটি ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যেও অনুসৃত হয়েছিল যা ১১৯৯ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত আজমীরের আড়াই দিনকা ঝোপড়া মসজিদের খিলান থেকে প্রতীয়মান হয়।[৩৭] বাংলার সুলতানি স্থাপত্যেও দ্বি-কেন্দ্রিক কৌণিক খিলানের ব্যবহার সর্বজনীনভাবে অনুসৃত হয়েছে; যেমন- ছোটসোনা মসজিদ, ষাট গম্বুজ মসজিদ, দরাসবাড়ী মসজিদ, সাতগাছিয়া আদিনা মসজিদ এমনকি আলোচ্য মসজিদ।

দ্বি-কেন্দ্রিক খিলানগুলো আবার ভূসোঁয়া পদ্ধতিতে নির্মিত (রেখাচিত্র-৪)। ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যে সর্বপ্রথম ভূঁসোয়া পদ্ধতিতে নির্মিত খিলানের ব্যবহার দেখা যায় গিয়াস উদ্দীন বলবনের সমাধিতে (১২৮০ খ্রি.)।[৩৮] কিন্তু পারভিন হাসানের মতে, "It is possible, therefore, that the form and technology of the true arch were known in Bengal in pre-Islamic times, but after the Muslim conquest they were widely used".[৩৯] বিদ্যমান উদাহরণ অভাবে তাঁর এ মত কতটা যুক্তিপূর্ণ তা বলা মুশকিল। তবে প্রাক-মুসলিম স্থাপত্যে যে কর্বেল খিলানের ব্যবহার দেখা যায় তার উদাহরণ হলো অষ্টম শতাব্দীতে নির্মিত ময়নামতির ইটা খোলা মুড়া ও পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহার।[৪০] যাহোক প্রাচীন সভ্যতায় সর্বপ্রথম কোথায় ভূঁসোয়া ব্যবহৃত হয়েছিল তা সঠিক করে বলা যায় না। তবে ইন্সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার বিবরণ থেকে জানা যায় যে, খ্রিষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীতে নির্মিত উত্তর সিরীয়ার টেলহাফ নগরীর সমাধি সৌধ (Tombs at Tell Halaf, North Syria) নির্মাণে সর্ব প্রথম ভূঁসোয়া পদ্ধতির ন্যায় ইটগুলো সজ্জিতকরণের প্রমাণ পাওয়া যায়।[৪১] পরবর্তীতে সাসানীয় স্থাপত্যে ভূঁসোয়া খিলানের ব্যবহার দেখা যায় যার উদাহরণ হলে ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্মিত হাজিয়া সুফিয়া ও হাজিয়া ইরিনা প্রাসাদ।[৪২] কিন্তু সপ্তম শতাব্দীতে আরবগণ কর্তৃক সিরিয়া ও পারস্য দখলের মধ্য দিয়ে ভূঁসোয়া পদ্ধতিতে খিলান নির্মাণের ধারা মুসলিম স্থাপত্যে অনুপ্রবেশ করে।

আলঙ্কারিক উপকরণ হিসেবে পোড়ামাটির ফলক নকশার ব্যবহার আলোচ্য মসজিদের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এটি বাংলার একান্তই নিজস্ব সম্পদ। সুলতানি আমলে নির্মিত প্রায় প্রতিটি ইমারতেই

---

[৩৬]এস. এম. হাসান,"সাম ইন্টাররিলেশন বিটুইন পারসিয়ান ইসলামিক এন্ড প্রি-মুঘল বেঙ্গল আর্কিটেকচার", *বাংলাদেশ শিল্পকল একাডেমি পত্রিকা*, ভলিয়্যুম-১, ১৯৭৮, পৃ. ৪১; এ. বি. এম. হোসেন, *আরব স্থাপত্য, পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯৯; এস. লেনপুল, *দি আর্ট অব দি সেরাসেন্স ইন ইজিপ্ট* (লন্ডন : চ্যাপম্যান এন্ড হল, ১৮৮৮), পৃ. ৫৯, আলোকচিত্র-৫; কে. এ. সি. ক্রেসওয়েল, *এ শর্ট একাউন্ট, পূর্বোক্ত*, আলোকচিত্র- ৬৯।

[৩৭]পি. ব্রাউন, *পূর্বোক্ত*, প্লেট-৬, আলোকচিত্র-১; আর. নাথ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭, আলোকচিত্র- ১৯।

[৩৮]এম. মোখলেছুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫০, আলোকচিত্র-২৫। পি. ব্রাউনের মতে, "For in this building for the first times in India we met with the true arch produced by means of radiating voussoirs", দেখুন- পি. ব্রাউন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫।

[৩৯]পারভীন হাসান, "সুলতানাত মস্কস এন্ড কন্টিনিউয়িটি ইন বেঙ্গল আর্কিটেকচার", *মুকার্নাস*, ভলিয়্যুম-৬, ১৯৮৯, পৃ. ৬৯।

[৪০]খোন্দকার আলমগীর,*পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৪; নাজিমুদ্দিন আহমেদ, *মহাস্থান ময়নামতি পাহাড়পুর* (ঢাকা : প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, ১৯৯৭), পৃ. ১০৪।

[৪১]*ইন্সাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা*, ভলিয়্যুম-২ (লন্ডন : উইলিয়াম বেন্টন পাবলিশার্স, ১৯৭৩), পৃ. ২৮৬।

[৪২]*তদেব*, পৃ. ২৮৭।

এ রীতির অলঙ্করণ পরিলক্ষিত হয়। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে পোড়ামাটির ফলক সমৃদ্ধ অলঙ্করণ সুলতানি বাংলার স্থাপত্যের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলেও মোগল আমলে নির্মিত কোন কোন ইমারতে যেমন- পাবনার চাটমোহর মসজিদ (১৫৮২ খ্রি.), টাঙ্গাইলের আতিয়া মসজিদ (১৬০৯ খ্রি.), এগারসিন্ধুর সাদীর মসজিদ (১৬৫২ খ্রি.), ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল মসজিদ (১৬৫২ খ্রি.), দিনাজপুরের নবগ্রাম মসজিদ (১৭৫৯-৮৮ খ্রি.) প্রভৃতির গাত্রালঙ্কারে পোড়ামাটির ফলক নকশার ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়।[৪৩] তবে এযুগে ইমারতের গাত্রালঙ্করণ হিসেবে পোড়ামাটির ফলক প্রাধান্য না পেলেও এ আমলে বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায় কর্তৃক নির্মিত মন্দিরসমূহে পোড়ামাটির ফলক অলঙ্করণ ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। যেমন- দিনাজপুরের কান্তজীর মন্দির, পুঠিয়ার পঞ্চরত্ন বড় গোবিন্দ ও চৌচালা ছোট গোবিন্দ মন্দির এবং বড় ও ছোট অহ্নিক মন্দিরের বহির্গাত্র রক্তিম বর্ণের অপূর্ব পোড়ামাটির ফলকে সজ্জিত।[৪৪] তবে ইমারত গাত্রালঙ্কারে পোড়ামাটির ফলক নকশার ব্যবহার এদেশে বহু পূর্ব হতেই প্রচলিত ছিল।[৪৫] উদাহরণস্বরূপ প্রত্নতাত্ত্বিক খননের মাধ্যমে আবিস্কৃত বগুড়ার মহাস্থানগড়, কুমিল্লার ময়নামতি ও নওগাঁর পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহারের পোড়ামাটির ফলক অলঙ্করণের কথা বলা যায়।[৪৬] কিন্তু এসব স্থাপত্যের পোড়ামাটির ফলক মূখ্যত: প্রতিমা ও বিগ্রহ এবং গৌণত গাছ-পালা, লতা-পাতা ও বস্তু নিরপেক্ষ বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হয়েছে। অথচ মুসলিম কারিগরগণ আলঙ্কারিক বিষয়বস্তুতে পরিবর্তন এনে জীবন্ত প্রতীক ও ভাস্কর্যের স্থলে বিমূর্ত প্রতীক, লতা-পাতা, লিপিকলা ও জ্যামিতিক নকশার প্রচলন করে। তাছাড়া মুসলিম কারিগরদের হাতে এদেশের সনাতন পোড়ামাটির ফলক নকশার আড়ষ্টতা দুরীভূত হয়ে বিশেষ সুক্ষ্মতার বহি: প্রকাশ ঘটে। এ. এইচ. দানীর ভাষায় বলা যায় যে, জেরুজালেম ও দামেস্ক যেমন মুসলিম স্থাপত্যকে উপহার দিয়েছে সবুজ ও সোনালী রঙের অপূর্ব মোজাইক অলঙ্করণ, পারস্য দিয়েছে অনুপম রঙ্গিন টালি অলঙ্করণ, স্পেন দিয়েছে বিস্ময়কর কাল্পনিক নকশা তেমনি এদের বিপরীতে বাংলা দিয়েছে মুসলিম স্থাপত্য অলঙ্করণে জ্যামিতিক নকশা সমৃদ্ধ পোড়ামাটির ফলক নকশা।[৪৭]

সুরা মসজিদে প্রস্তর খোদাই নকশার ব্যবহারও পরিদৃষ্ট হয় যা বাংলার মুসলিম স্থাপত্যের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বলা বাহুল্য প্রস্তর খোদাই নকশার ব্যবহার বাংলার স্থাপত্যের বহু পূর্বেই বহির্বিশ্বের মুসলিম স্থাপত্যে লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য এ. এইচ. দানী এ বিষয়ে কিছুটা ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, "The art of stone carving has been derived from the *hieratic art*, traces of which still survive in the pre-Muslim sites in

---

[৪৩]জি. মিচেল (সম্পা.), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪০; এ. এইচ. দানী, " মুঘল মস্কস এ্যাট এগারসিন্ধুরচ, *বরেন্দ্র রিচার্স সোসাইটি মনোগ্রাফ* নং- ৮, ১৯৫০,পৃ. ৩৪-৩৫; এম. এ. বারী, *মুঘল মস্কস*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৩, ১৩৩ ও ২৪৪।

[৪৪]জুলেখা হক, *টেরাকোটা ডেকোরেশন অব লেট মিডায়ভ্যাল বেঙ্গল প্রটিয়েট অব এ সোসাইটি* (ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৮০), প্লেট-১৪৬; কাজী মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, "বাংলার মন্দির স্থাপত্যে মুসলিম প্রভাব," *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭৯।

[৪৫]Terracotta art is very old in Bengal and appears to have been begun from the 4th century B. C., দেখুন- এম. এ. বারী, *খলিফাতাবাদ*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৮, পাদটীকা-২।

[৪৬]নাজিমুদ্দিন আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৪, ৭৬ ও ১১০।

[৪৭]এ. এইচ. দানী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭; কাজী মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, "বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে দেশজ উপাদান," *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৩।

Bengal"।[৪৮] তবে সমগ্র মুসলিম স্থাপত্যে প্রস্তর খোদাই নকশার প্রাচীনতম নিদর্শন হলো জেরুজালেমের কুব্বাত-আস-সাখরা (৬৯১-৯২ খ্রি.)।[৪৯] অনুরূপভাবে দামেস্ক মসজিদ, সিরিয়ার মাসাত্তা প্রাসাদ (৭৪৩-৪৪ খ্রি.), কাসর আত-তুবা (৭৪৩-খ্রি.) ও নিবাত-ই-আমান প্রাসাদ এবং জর্ডানের খিরবাত আল-মাফজার প্রাসাদে প্রস্তর খোদাই নকশার ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়।[৫০] তাছাড়া প্রত্নতাত্ত্বিক খননের মাধ্যমে আবিস্কৃত গজনীর সুলতান তৃতীয় মাসুদের প্রাসাদ কমপ্লেক্সে (১০৯৯-১১১৪ খ্রি.) প্রস্তর খোদাই অলঙ্করণের প্রমাণ পাওয়া যায়।[৫১] সেলযুগ স্থাপত্যেও প্রস্তর খোদাই নকশার ব্যবহার প্রচলিত ছিল যার উদাহরণ হলো কাজভীনের জামি (১১১৩ খ্রি.) ও নূর-উদ-দীনের জামি মসজিদ (১১৪৮ খ্রি.)।[৫২] স্পেনের উমাইয়া স্থাপত্যে প্রস্তর খোদাই নকশার যে নুমনা পাওয়া যায় তার অন্যতম উদাহরণ হলো মদীনাত আল-যোহরা প্রাসাদ (দশম শতাব্দী)।[৫৩] মিশরীয় স্থাপত্যে ইবনে তুলনের মসজিদ, আস-শাফির সমাধি (১২১১ খ্রি.), বাইবার্সের মসজিদ (১২৬০-৭০ খ্রি.), সুলতান আল-নাসিরের মাদ্রাসা (১২২৯ খ্রি.) প্রভৃতি ইমারত প্রস্তর খোদাই অলঙ্করণের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।[৫৪] পরবর্তীতে প্রস্তর খোদাই অলঙ্করণ ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যে যেমন- দিল্লীর কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদ (১১৯৫ খ্রি.), আড়াই দিনকা ঝোপড়া মসজিদ(১১৯৯ খ্রি.), কুতুব মিনার (১১৯৯ খ্রি. শুরু এবং ১২৩০ খ্রি. সমাপ্ত), সুলতান ইলতুৎমিসের সমাধি (১২৩৬ খ্রি.)[৫৫], ফতেপুর সিক্রির সেলিম চিশ্‌তির সমাধি (১৫৭২ খ্রি.), আগ্রার তাজমহল (১৫৩২-৫৪ খ্রি.), দিল্লীর দিওয়ান-ই-খাস[৫৬] প্রভৃতি ইমারতে ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়েছে। এমনি ধারাবাহিকতায় আলঙ্কারিক উপকরণ হিসেবে বাংলাতেও প্রস্তর খোদাই নকশার প্রচলন ঘটেছিল।

আলঙ্কারিক বিষয়বস্তু হিসেবে খাঁজ খিলান নকশার ব্যবহার সুরা মসজিদের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এটি বাংলার মুসলিম স্থাপত্যের এক জনপ্রিয় রীতি। তবে বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে খাঁজ খিলান নকশার ব্যবহার নতুন কোন উদাহরণ নয়। ইমারতে ব্যবহৃত এ ধরনের খাঁজ খিলান নকশা

---

[৪৮]এ. এইচ. দানী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯; এস. এম. হাসান, *মস্কস আর্কিটেকচার*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮২।

[৪৯]এ. বি. এম. হোসেন, *আরব স্থাপত্য*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৪-৪৫।

[৫০]এম. আশরাফ আলী, "অ্যান অরনামেন্টাশন ইন দি মুসলিম আর্কিটেকচার অব বেঙ্গল ঃ ফ্রম দি কনকুইষ্ট টু মিড সিক্সটিন্থ সেঞ্চুরী", অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি থিসিস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৮, পৃ. ৭২; এ. বি. এম. হোসেন, *আরব স্থাপত্য*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪০-৪২।

[৫১]ও. আসলানাপা, *টার্কিশ আর্ট এন্ড আর্কিটেকচার* (লন্ডন : ফেবার এন্ড ফেবার লি., ১৯৬৪), পৃ. ২৬০।

[৫২]এস. এম. ডিমান্ড, *এ হ্যান্ড বুক অব মহামেডান আর্ট* (নিউইয়র্ক : মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম প্রেস, ১৯৫৮),পৃ. ৯৬।

[৫৩]*তদেব*, পৃ. ১০৪।

[৫৪]ডি. টি. রাইস, *ইসলামিক আর্ট* (লন্ডন : থামস্ এন্ড হাডসন, ১৯৬৫),পৃ. ৮৮ ও ১৪৫।

[৫৫]এম. আশরাফ আলী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৪; এম. মোখলেছুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৬ ও ৪৯।

[৫৬]এ. বি. এম. হোসেন, *ফতেপুর সিক্রি এন্ড ইটস আর্কিটেকচার* (ঢাকা : ব্যুরো অব ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশন, ১৯৭০), পৃ. ১১৯, আলোকচিত্র-৩৩ ও ৩৪; জি. মিচেল (সম্পা.), *আর্কিটেকচার অব দি ইসলামিক ওয়ার্ল্ড* (লন্ডন : থামস এন্ড হাডসন), পৃ. ২৬৬; ই. কোচ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৭।

বৌদ্ধ স্থাপত্যের ত্রি-খাঁজ খিলান থেকে উদ্ভূত বলে মনে করা হয়।[৫৭] আবার ধারণা করা হয় যে, রোমান স্থাপত্যের শঙ্খ খোসা অলঙ্করণের শিরালো খাঁজ নকশা থেকে এর উৎপত্তি যা পারস্যের সাসানীয় আমলে নির্মিত তাক-ই-কিসরা প্রাসাদের প্রধান ফটকের খিলানের সম্মুখস্থ খাঁজ সারি থেকে নীত হয়েছে।[৫৮] এ খাঁজ খিলান নকশা উত্তর আফ্রিকার কায়রাওয়ান মসজিদ থেকে আরম্ভ করে ফাতেমীয় আমলের অনেক ইমারতেই পরিদৃষ্ট হয়। ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যে এ খাঁজ খিলান নকশা ১১৯৯ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত আজমীরের আড়াই দিনকা ঝোপড়া মসজিদের খিলান পর্দার কেন্দ্রীয় খিলানে লক্ষ্য করা যায়।[৫৯] পরবর্তীকালে এ খাঁজখিলান নকশা মোগল স্থাপত্যে চরম উৎকর্ষতা লাভ করে যার উদাহরণ হলো দিল্লীর *দিওয়ান-ই-আম* ও *রংমহল*।[৬০] খাঁজ খিলান নকশা মোগল আমলের পরেও ভারত উপমাহাদেশে ব্যাপক সমাদৃত হয়েছে। সম্ভবত এটিই একমাত্র উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যিক অলঙ্করণ যা অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দু সম্প্রদায় কর্তৃক নির্মিত মন্দির স্থাপত্যেও অনুপ্রবেশ করেছিল। এ প্রসঙ্গে পুঠিয়ার পঞ্চরত্ন শিবমন্দির (১৮২৩-১৮৩০ খ্রি.), পঞ্চরত্ন গোবিন্দ মন্দির (অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে) ও দিনাজপুরের কান্ত জীর নবরত্ন মন্দিরের (১৭৫২খ্রি.) কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।[৬১] তাছাড়া আলঙ্কারিক বিষয়বস্তু হিসেবে আলোচ্য মসজিদে ব্যবহৃত পদ্মফুল নকশা, শিকল-ঘন্টা নকশা[৬২], লতা-পাতার নকশা, তারা ফুল নকশা প্রভৃতি বাংলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকেই বিধৃত করে। প্রাচীন বাংলার মন্দির স্থাপত্যে এগুলোর প্রচলন ছিল।

বিজয়ী বেশে মুসলমানরা বাংলায় আগমন করত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ থাকলেও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে সেরূপ সাংঘর্ষিক অবস্থা ছিল না বরং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উভয় রীতির সংমিশ্রণে বাংলায় এক নতুন স্থাপত্যরীতি গড়ে উঠে যার অন্যতম উদাহরণ হলো সুরা মসজিদ। উভয় রীতির সংমিশ্রণের কারণ হিসেবে বলা যায় যে, মন্দির নির্মাণে অভ্যস্ত ধর্মান্তরিত কারিগরদের মসজিদ নির্মাণের কাজে ব্যবহার করা। সুতরাং একথা সুস্পষ্ট যে, রাজনৈতিক বিরোধ বিভিন্ন স্থাপত্য রীতির মিলনে প্রতিবন্ধক হতে পারে না।

---

[৫৭]এম. আর. তরফদার, "ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যের অলংকরণ প্রসঙ্গ", *ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা*, ১ম-২য় সংখ্যা, ঢাকা, বাংলা ১৩৯৪, পৃ. ৮৫।

[৫৮]এ. বি. এম. হোসেন, "ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যের কতিপয় অলংকরণ ঃ উৎস ও ক্রমবিকাশ", *আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ* (ঢাকা : ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ১৯৯১), পৃ. ২৫৫।

[৫৯]এম. মোখলেছুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮, আলোকচিত্র-১০।

[৬০]পি. ব্রাউন, *পূর্বোক্ত*, প্লেট-৮৯, আলোকচিত্র-২ ও প্লেট-৮২, আলোকচিত্র-২।

[৬১]কাজী মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, "পুঠিয়ার পঞ্চরত্ন শিবমন্দির," *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, বিংশ খন্ড, প্রথম সংখ্যা, জুন-২০০২, পৃ. ১৪২; কাজী মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, "পুঠিয়ার পঞ্চরত্ন গোবিন্দ মন্দিরের স্থাপত্যশৈলী," *রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ*, ভলিয়্যম-৩২, পার্ট-এ, ২০০৪, পৃ. ২৩৬-৩৭ ও ২২৯।

[৬২]ভারতীয় উপমহাদেশের হিন্দু মন্দিরগুলোতে এ ধরনের শিকল-ঘন্টা নকসার ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। উদাহরণস্বরূপ ইলোরার কৈলাস মন্দিরের (আনু. ৭৫৭-৭৮৩ খ্রি.) নাম করা যেতে পারেঃ দেখুন- পি. ব্রাউন, *ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার (*হিন্দু এণ্ড বুদ্ধিষ্ট পিরিয়ড), পৃ. ।

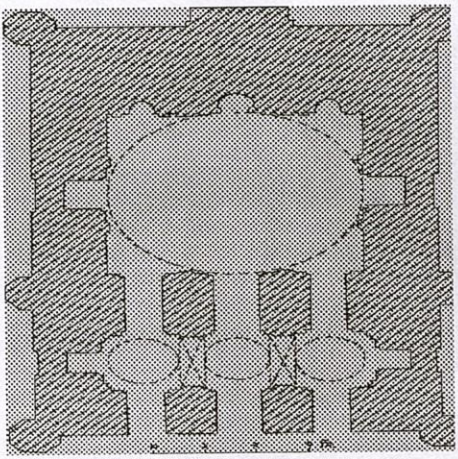

ভূমি নকশা ১:সুরা মসজিদ (ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর)

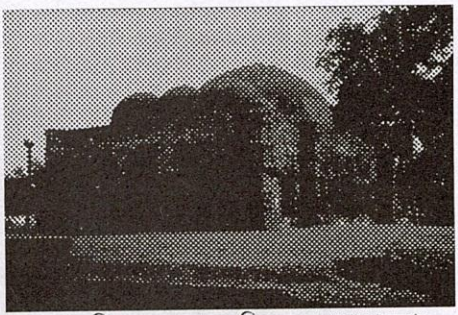

আলোকচিত্র-১ : সুরা মসজিদের সাধারণ দৃশ্য

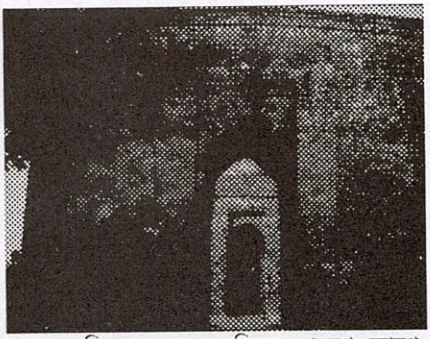

আলোকচিত্র-২ : সুরা মসজিদের প্রবেশ তোরণ

আলোকচিত্র-৩ : সুরা মসজিদের পোড়ামাটির ফলক নকশা

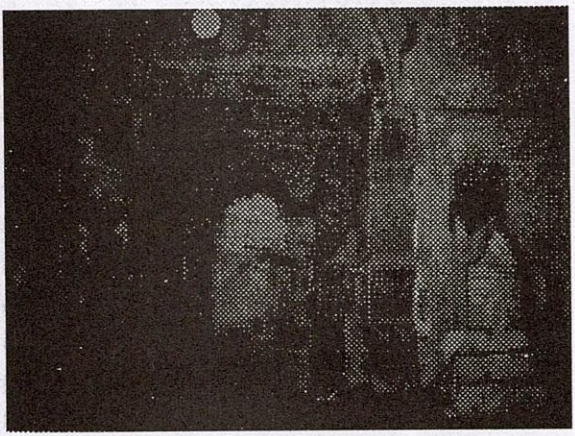

আলোকচিত্র-৪ : সুরা মসজিদের প্রস্তর মিহরাব

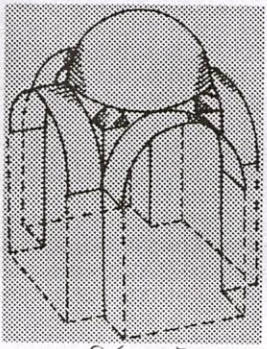

রেখাচিত্র-১ : গম্বুজ নির্মাণে স্কুইঞ্চের ব্যবহার

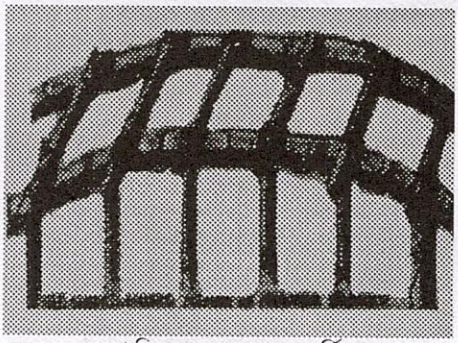

রেখাচিত্র-২ : বক্রাকার কার্নিস

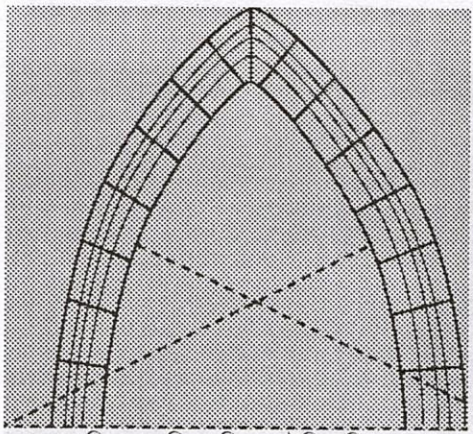

রেখাচিত্র-৩ : দ্বি-কেন্দ্রিক কৌণিক খিলান।

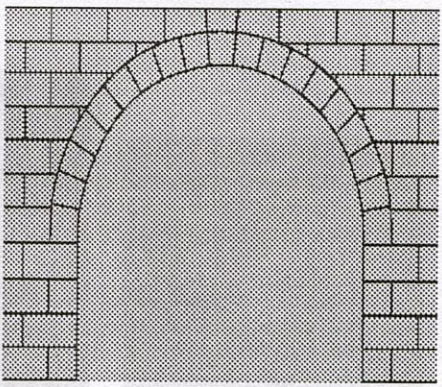

রেখাচিত্র-৪ : ভুঁসোয়া পদ্ধতিতে খিলান নির্মাণ

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, সপ্তদশ সংখ্যা ১৪১৬

তৃণমূল পর্যায়ের রাজনীতিতে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা : বগুড়া জেলার দুটি ইউনিয়নভিত্তিক সমীক্ষা

মোঃ হাবিবুল্লাহ্*

Abstract: Democracy is a governmental system, still preferred by the majority of world people and countries, where public opinion and desires can be reflected best. However, mass awareness and cautious participation are the conditions for the success of democracy as a ruling system. A true democracy can't be established through a centralized governing system. Practicing and nursing democracy at the grass root level can strengthen democracy properly. Bangladesh, as a whole, is not careful and attentive to nurture democratic norms and the two major entities which would shoulder the responsibility to nurture and develop democratic norms and practices at the local level. Who are the catalysts of political and democratic development, in spite of lack of care and nursing, at the grass root level in Bangladesh is addressed in this paper. This paper would explain the role of rural elites of Bangladesh who render their continuous efforts to develop democratic decentralizations, in spite of diversity in their target, in this respect.

ভূমিকা

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা হলো জনকল্যাণের নিমিত্ত পরিচালিত জনমতভিত্তিক জনপ্রিয় শাসন ব্যবস্থা যা জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত ও কার্যকরী অংশগ্রহণ এবং তাদের নির্বাচিত শাসকমণ্ডলী দ্বারা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে পরিচালিত হয়। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় রাজনীতি একটি বহুমাত্রিক ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে সুসংহত করতে তাই এ প্রক্রিয়ায় গণমানুষের সম্পৃক্ততা প্রয়োজন। গ্রামভিত্তিক বিপুল মানুষের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ছাড়া বাংলাদেশে কখনো গণতন্ত্র শক্তিশালী হতে পারে না বলে স্বীকার করা হয়। অতীতে গ্রামাঞ্চলে দলাদলি প্রবণ (factional) রাজনীতিতে ধনী ভূ-স্বামীদের একক প্রাধান্য ছিলো। তখন দেশের রাজনীতিতে গণ মানুষের অংশগ্রহণ ছিলো অত্যন্ত সীমিত। গ্রামীণ এই দলাদলি প্রবণ রাজনীতির ধারাবাহিকতায় অতীতে জাতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ গ্রামের অপেক্ষাকৃত অভিজাত(এলিট) শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো এবং প্রতিনিধিত্ব ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারসূত্র ছিলো অন্যতম উৎস। কিন্তু বর্তমানে সামাজিক উন্নয়নে শিক্ষা, রাজনৈতিক দলগুলোর গণমুখী প্রবণতা এবং

* ড. মোঃ হাবিবুল্লাহ, প্রভাষক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, রাজশাহী ক্যাম্পাস।

পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় বংশানুক্রমিক নেতৃত্বের ধারার পরিবর্তে তৃণমূল পর্যায়ে নেতৃত্বের ভিত্তি জনসমর্থন হওয়ায় গ্রামীণ এলিট শ্রেণীর রাজনীতিতে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ তৃণমূল পর্যায়ে রাজনীতির বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছে। এমনি একটি বাস্তবতায় তৃণমূল পর্যায়ের রাজনীতিতে গ্রামীণ এলিট শ্রেণীর ভূমিকাকে চিহ্নিত করার প্রয়াসে বর্তমান গবেষণাকর্মটি বগুড়া জেলার দু'টি ইউনিয়নের (বিশালপুর ও মির্জাপুর) নির্বাচিত ২০০জন গ্রামীণ এলিটের সাক্ষাৎকার এবং তাদের রাজনৈতিক ভূমিকা পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়েছে। চারটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গবেষণাকর্মটি পরিচালিত হয়েছে:

এক. তৃণমূল পর্যায়ে রাজনীতির স্বরূপ অনুসন্ধান করা;

দুই. তৃণমূল পর্যায়ে রাজনীতিতে গ্রামীণ এলিটদের অংশগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করা;

তিন. তৃণমূল পর্যায়ে রাজনীতিতে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা;

চার. তৃণমূল পর্যায়ে রাজনীতির বিকাশ ধারা অবলোকন করা;

বর্তমান গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করার জন্য মূলত জরিপ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এ পদ্ধতির আওতায় লক্ষ্যভিত্তিক নমুনায়ন প্রক্রিয়ায় সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও নির্দিষ্ট প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া গৌণ উৎস হিসেবে সংশ্লিষ্ট বই-পুস্তক, গবেষণাকর্ম, পত্র-পত্রিকা, জার্নাল, সাময়িকী থেকে তথ্য-উপাত্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

এলিট ও গ্রামীণ এলিট-এর তত্ত্ব ও প্রত্যয়

সতের শতকে কোনো পণ্যের বিশেষ উৎকর্ষতাকে বিশেষায়িত করার জন্য 'এলিট' শব্দটি ব্যবহার করা হতো। পরবর্তীতে কোনো উচ্চ সামাজিক গোষ্ঠীকে বোঝানোর জন্য এ প্রত্যয়টি ব্যবহার করা হয়েছে ।[১] ১৯৩০-৩৫-এ ইতালীয় সমাজবিজ্ঞানী ভিলফ্রেডো প্যারেটোর সমাজতাত্ত্বিক রচনার মধ্যে দিয়ে তা বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।[২] কোনো সমাজের উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন অধিকতর প্রভাবশালী কোনো গোষ্ঠীকে বোঝাতে প্যারেটো এলিট শব্দটি ব্যবহার করেছেন। প্যারেটো যখন এলিট শব্দটি ব্যবহার করেন তখন সম্ভবত এলিটের বহুমাত্রিকতা তার মনে এসেছিলো।[৩] একটি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্যারেটো তাদেরকে এলিট বলে গণ্য করেছেন, যারা সরকারের ওপর প্রবল প্রভাব খাটাতে পারেন এবং শাসক এলিট এ বিশেষ গোষ্ঠীর লোকজনের সমন্বয়ে গঠিত। আর বাকি লোকজন নিয়ে গঠিত শাসক বহির্ভূত এলিট। Bottomore আরো দেখিয়েছেন যে, এলিটীয় তত্ত্ব মার্ক্সীয় শ্রেণী তত্ত্বের একটি বিপরীত পরিস্থিতি। ইতিহাসের নির্ণায়ক শক্তি হিসেবে কার্ল মার্কস রাজনীতির চেয়ে অর্থনীতির ওপর বেশি গুরুত্বারোপ করেন। মার্কসবাদীদের মতে শাসকগোষ্ঠী উৎপাদন শক্তির ওপর নিয়ন্ত্রণের কারণে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করতে পারে। Mills (১৯৫৬) তাদেরকে এলিট শ্রেণী হিসেবে বিবেচনা করেন, যারা সমাজের প্রধান প্রধান পদগুলো তাদের অধিকারে রাখেন এবং সে সাথে ক্ষমতা, সম্পদ ও জনপ্রিয়তা ভোগ করেন।[৪] তিনি আমেরিকান এলিটের একটি সমীক্ষা থেকে

---

[১] T. B. Bottomore, *Elites and Society,* London: C. A. Wates and Co., 1964.

[২] . Vilfredo Pareto, *The Mind and Society,* New York: Har Court and Brouches Co., Vol. 4, 1935.

[৩] Pareto, op. cit.

[৪] C. Wright Mills., *The Power Elite,* New York: McGraw Hill Book Company, 1956, P. 13

তার উপাত্ত সংগ্রহ করেন এবং দেখান যে, 'ক্ষমতা এলিট' (Power Elite) হলো তা, যা সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তির ঘনিষ্ঠ বন্ধনে গঠিত। তার মতে, ঐ ক্ষমতা এলিটেরা জনগণকে সিদ্ধান্ত দেবার অবস্থান গ্রহণ করেন। অন্যদিকে, Rose (১৯৬৭) সম্পূর্ণভাবে অর্থনৈতিক এলিটদের (Economic Elite) ক্ষমতা বিবেচনার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। Rose (1967) এর মতে, ব্যবসা ও সম্পদ নিয়ন্ত্রণকারীরা সমাজে একটি বিশেষ এলিট শ্রেণীর সৃষ্টি করে। আরেকজন খ্যাতিমান এলিট তাত্ত্বিক Dahl (1963) ক্ষমতা এলিট বলতে তাদেরকে বুঝিয়েছেন, যারা সমাজের উঁচু শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণ করে। Dahl সমাজের উঁচু শ্রেণী বলতে সেসব সদস্যদের ইঙ্গিত করেছেন, যারা সরকারের কেন্দ্রীয় পদের সাথে সংশিষ্ট এবং যারা সরকারের অধিকাংশ নীতি নির্ধারণ করে। তিনি দেখিয়েছেন যে, উঁচু শ্রেণীর লোকেরা সমাজে আধিপত্য প্রকাশে সমর্থ এবং তারা সর্বব্যাপী প্রভাবসম্পন্ন।[৫] এলিট তত্ত্বের আরেকদল সমাজবিজ্ঞানী (Cole, 1956; Lasswell, 1952; Kornhauser, 1965) আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন-যেমন সমাজ, সমাজ কাঠামো, সমাজ সংগঠন ইত্যাদি। Lasswell (1952) এর মতে, এলিটের সদস্যরা সমাজে উঁচু অবস্থানে থাকেন।[৬] প্রায় অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থক Cole (1956) এলিট বলতে সে গোষ্ঠীকে বোঝান, যারা সমাজের প্রতিটি পর্যায়কে প্রভাবিত করে। Kornhauser (1965) এলিট বলতে সামাজিক কাঠামোতে উঁচু অবস্থান ধারণকারীদের বুঝিয়েছেন।[৭] একই মতাবলম্বী বিজ্ঞানীদের আরো একজন অনুসারী Anthony Giddens (1973) এ বিষয়ে সামান্য একটু ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির প্রস্তাব করেছেন। তিনি বলেন, ' এলিট তারাই, যারা সামাজিক সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রধান পদ দখল করতে পারেন'।[৮]

ওপরে বর্ণিত এলিট সম্পর্কিত অনেক গুণাবলীই একজন গ্রামীণ এলিটের থাকতে পারে। ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানী Dube (1959) গ্রামীণ এলিট বলতে সেখানকার উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন গোষ্ঠী সদস্যদের কথা উল্লেখ করেন, যারা আর্থিক দিক থেকে সচ্ছল, মর্যাদাবান, শিক্ষিত এবং যাদের শহরের সাথে ভালো যোগাযোগ আছে।[৯] Sharma (1979) গ্রামীণ এলিট বলতে সেসব ব্যক্তিকে বুঝিয়েছেন, যারা গ্রাম পর্যায়ে নেতা ও গ্রামের মুখপাত্র ও প্রতিনিধি হিসেবে প্রভাব বিস্তার করেন এবং যারা গ্রামের বিভিন্ন সমস্যার গুরুত্বপূর্ণ সমাধান দেন।[১০]

---

[৫] Robert A Dahl., Who Governs, New Haren: Yale Univeristy Press, 1963

[৬] H. D. Lassewell., *et. al.* The Comparative study of Elites, Stanford: Hoover Institute, 1952

[৭] William Koranhauser, The Politics of Mass Society, London: Routledge & Kegen Pal, 1965

[৮] Anthony Giddens, *Elites in the British Class Structure, in P. Stansworth and Anthony Giddeas, Elites and Power in British Society*, London: Cambridge University Press, 1973,pp3-4.

[৯] S.C. Dube, *Indian Changing Village: Human Factors in Community Development*, Bombay: Allied Publishers Private Limited, 1967.

[১০] Surjan Singh Sharma., *Rural Elites in India*, New Delhi: Sterling Publishers (Pvt) Ltd, 1979.

গ্রামীণ এলিট সম্পর্কিত দক্ষিণ এশীয় সমীক্ষাগুলোতে সেসব লোককে এলিট বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, যারা বিভিন্ন গ্রামীণ প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনে রীতিসিদ্ধ অবস্থান দখল করে আছেন। Schulze এবং Blumberg (1957), Bonjean এবং Olson (1964) এবং Jennings (1964) এর অনুসরণে তারা নেতৃত্ব শনাক্তকরণে সামাজিক অবস্থানগত পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন।[১১] তারা ঐতিহ্যগত সুনামের (Reputational) অধিকারী এলিটবর্গকে তাদের গবেষণায় উল্লেখ করেননি। যদিও এটা সত্য যে, তাদের মধ্যে অনেকেই বর্তমানে তাদের ঐতিহ্যগত সুনাম অক্ষুন্ন রাখতে পারছেন না। কিন্তু এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, গ্রামীণ ক্ষমতার বেশ খানিকটাই এখনো তাদের নিয়ন্ত্রণে আছে। Karim (1979) বাংলাদেশে রাজশাহীর দু'টি গ্রামের ওপর এক গবেষণায় খ্যাতিবান নেতৃত্বকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করেছেন; কিন্তু তিনি সরকারি কর্মসূচির ফলে সৃষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের অবস্থানগত নেতাদের অন্তর্ভুক্ত করেননি (Karim,1979)।[১২] পরবর্তীতে অবশ্য Karim (1983) অন্য গবেষণায় তাদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[১৩] বাংলাদেশে গ্রামীণ এলিটদের রীতিসিদ্ধ ও অরীতিসিদ্ধ উভয় ধরনের এলিটই গ্রামীণ জীবনের বিভিন্ন কাজ-কর্মে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে প্রভাবশালী হয়েছেন। শ্রীলংকার বিকাশমান এলিটদের ওপর এক সমীক্ষায় Marshall Singer গ্রামীণ এলিট গোষ্ঠীর ভেতর বৌদ্ধ পুরোহিত, ঐতিহ্যগত প্রভাবশালী পরিবার ও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকদের অন্তর্ভুক্ত করেন। Singer আরো বলেন যে, প্রতিটি গ্রামের স্বতন্ত্র পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে আরো অনেক ব্যক্তিবর্গ বা গোষ্ঠীসমূহ গ্রামীণ এলিটের সদস্য হতে পারেন।[১৪] Singer-এর এ সংজ্ঞায় একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছে যে, পরিস্থিতির বহুমুখীনতার কারণে নেতৃত্ব গ্রহণের সম্ভাবনাও ব্যাপকভাবে বহুমুখী। বাংলাদেশে গ্রামীণ এলিট বলতে গ্রামের নেতৃত্বকে বোঝায়। দেশের বৃহত্তর জনসংখ্যা গ্রামীণ এলাকায় কৃষিনির্ভর অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। বাংলাদেশের এসব গ্রামে যারা গ্রামের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন তারাই গ্রামীণ এলিট। অবস্থানগত দিক থেকে তাদের কারো সম্মানজনক ভূমিকা থাকতে পারে।

---

[১১] R.O. Schulze, and L.U. Blumberg, The Determination of Local Power Elites. *The American Journal of Sociology*, 13 (3), 1959.

C.M Bonjen,. and D.M. Olson, Community Leadership: Directions for Research. *Administrative Science Quarterly*, Vol. IX. No. 3 December 1964.

M.K Jennings, *Community Influentials: The Elites of Atlanta*, London: The Free Press of Glencoe, 1964.

[১২] A.H.M. Zehadul Karim, *Socio-Economic Background of the Rural Elites: A Case Study of Two Selected Villages*, Dhaka: University Grants Commission, 1979.

[১৩] —, *Rural Elites and Their Power Structure in Bangladesh*, (Unpublished M.A. Thesis) of the Dpt. of Anthropology, Syracuse University, USA, 1983.

[১৪] Marshall Singer, *The Emerging Elite: A Study of Political Leadership in Ceylon*, Cambridge: The Press, 1964.

গ্রামীণ এলিট শনাক্তকরণ দৃষ্টিভঙ্গী

নেতৃত্ব বিশ্লেষণে নেতাদের শনাক্তকরণ একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। Schulze and Blumberg (1957) গ্রামীণ নেতৃত্ব ও ক্ষমতা কাঠামোয় দু'ধরনের পদ্ধতিতে নেতাদের শনাক্ত করেছেন: (১) অবস্থানগত দৃষ্টিভঙ্গী (২) সম্মানজনক দৃষ্টিভঙ্গী।[১৫]

(ক) অবস্থানগত দৃষ্টিভঙ্গী (Positional Approach)

১৯৫৩ সালে Floyd Hunter এর Atlanta City-র ওপর গবেষণার পূর্ব পর্যন্ত এলিটদের ক্ষমতা ও নেতৃত্ব শনাক্তকরণে অবস্থানগত পদ্ধতি একটি বহুল ব্যবহৃত দৃষ্টিভঙ্গী হিসেবে পরিচিত ছিলো।[১৬] অবস্থানগত এলিটবর্গ হলেন সেসব লোকজন, যারা একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন কার্যক্রম ও পেশাগত প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কর্তৃত্বে অবস্থানগত ভূমিকা রাখেন। বাংলাদেশের গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গ্রামীণ অবস্থানগত এলিটদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : (১)ইউ.পি.চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ; (২) সমবায় সমিতির সদস্যবৃন্দ; (৩) প্রাতিষ্ঠানিক এলিট (গ্রামীণ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও পরিচালনা বোর্ডের সদস্যবৃন্দ)। বর্তমান গবেষণা এলাকায় অবস্থানগত এলিটের মোট সংখ্যা ১২২; এর মধ্যে ইউপি চেয়ারম্যান ও মেম্বার ২৬জন, সমবায় সমিতি নেতা ২৩জন, প্রাতিষ্ঠানিক এলিট (বিদ্যালয়-মাদ্রাসার শিক্ষক ও পরিচালনা কমিটির সদস্য) ৫১জন, রাজনৈতিক দলের ইউপি পর্যায়ের নেতা ১২জন।

(খ) সম্মানসূচক দৃষ্টিভঙ্গী (Reputational Approach)

সম্মানসূচক দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী তারাই নেতা বলে বিবেচিত হয়ে থাকেন যাদের একটি নির্দিষ্ট এলাকায় যথেষ্ট সুনাম, প্রভাব ও প্রতিপত্তি রয়েছে। এ বিশেষ শ্রেণীর লোকেরা উক্ত এলাকায় বেশ পরিচিত এবং শ্রদ্ধাভাজন। তাই সহজেই এদেরকে চেনা যায়। সম্প্রদায়ের ক্ষমতা কাঠামোর প্রেক্ষাপটে Floyd Hunter (1953) প্রথম Regional city-তে গবেষণা করতে গিয়ে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করেন।[১৭] সম্মানসূচক দৃষ্টিভঙ্গীর অনেক বৈশিষ্ট্যই থাকতে পারে, কিন্তু অধিকতর কার্যকরী উপায় হচ্ছে ক্রমানুসারে এলিটদের নাম উল্লেখপূর্বক তাদের চিহ্নিত করা এবং এর মধ্যে যারা সবচেয়ে বেশি মূল্য বা Weightage পাবেন তারাই খ্যাতিমান নেতা বলে বিবেচিত হবেন। Karim (1990) পুঠিয়া উপজেলার দু'টি গ্রামের নেতাদের চিহ্নিত করতে[১৮] এবং Harjinder Singh (1976) তার পাঞ্জাবের দু'টি গ্রামে ক্ষমতা ও প্রভাব নির্ণয়ে[১৯] সম্মানসূচক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োগ করেছেন। মূলত এসব গ্রামপ্রধান, মাতব্বর, সর্দার অথবা প্রামাণিকেরা গ্রামীণ সম্প্রদায়কে অনানুষ্ঠানিকভাবে পরিচালিত করে থাকেন। বর্তমান গবেষণা এলাকায় সম্মানসূচক এলিটের সংখ্যা মোট ৮৮।

---

[১৫] R. C. Schulze, and L. U. Blumberg, op. cit, p. 282

[১৬] Floyd Hunter, *Community Power Structure: A Study of Decision Makers*, Chapel Hill: The University of Garden Press, 1953.

[১৭] Hunter, op. cit.

[১৮] A.H.M. Zehadul Karim, *The Pattern of Rural Leadership in an Agrarian Society*, New Delhi: Northern Book Centre, 1990

[১৯] Harjinder Sing., Authority and Influence in two Sikh Villages, 1976

(গ) বিষয়ভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক দৃষ্টিভঙ্গী (Issue Participation Approach):
নেতৃত্ব শনাক্তকরণে বিষয়ভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক দৃষ্টিভঙ্গীও একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। এ দৃষ্টিভঙ্গীকে অনেক সময় Event Analysis, Decision Making অথবা Case Study পদ্ধতি বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এ দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক পারিপার্শ্বিকতায় বিশেষ কোনো নির্দিষ্ট ইস্যুতে যারা মূল ভূমিকা পালন করে থাকেন তাদেরকে এলিট বলে ধরে নেয়া হয়। Singh (1976) পাঞ্জাবের দু'টি গ্রাম গবেষণায় প্রভাবশালীদের শনাক্ত করতে সম্মানজনক দৃষ্টিভঙ্গীর পাশাপাশি বিষয়ভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করেছেন।[২০] গ্রামের বিভিন্ন সমস্যাকে চিহ্নিত করে এর পক্ষে জনমত গড়ে তুলে সমস্যা সমাধানে যারা প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখেন তাদেরকে ঐ দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে গ্রামীণ এলিট বলা যায়। উল্লেখ্য বর্তমান গবেষণা এলাকায় বিষয়ভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তিতে গ্রামীণ এলিট শনাক্ত করা হয়নি।

গ্রামীণ এলিটদের শনাক্ত করার দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণের পর গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় গ্রামীণ এলিটদের নির্ণায়ক উপাদান হিসেবে ভূমি মালিকানা, সম্পদের মালিকানা, শিক্ষা, সনাতন ও আধুনিক সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব এবং রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ততা প্রভৃতিকে উল্লেখ করা যায় । তবে Karim দেখিয়েছেন, গ্রামীণ নেতৃত্বের মূল উপাদান এখনো জমির মালিকানার ওপর বেশি নির্ভরশীল।[২১] তাই বলা যায়, যারা উচ্চ বংশীয় ও সচ্ছল পরিবারের সন্তান ও শিক্ষিত এবং যাদের মধ্যে গ্রামের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়, তাদেরকেই গ্রামীণ এলিট বলা যায়। গ্রামীণ এসব এলিট নিয়মিত সংবাদপত্র পাঠ করে ও রেডিও-টেলিভিশন দেখে নিজেদের সচেতনতা বৃদ্ধি করেন। এ ছাড়াও তারা তাদের সন্তানদের রাজনীতিতে এবং বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করেন। গ্রামীণ এলিটেরা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে প্রায়শঃই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হন, যা গ্রামীণ উন্নয়নের একটি ইতিবাচক দিক বলে বিবেচিত হয়। বর্তমান গবেষণায় গ্রামীণ এলিট বলতে বাংলাদেশের গ্রাম এলাকার এমন ব্যক্তি (বর্গ) কে বোঝানো হয়েছে, যিনি বা যারা তুলনামূলকভাবে উচ্চবংশীয় মর্যাদা, কম-বেশি ভূমি মালিকানা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা, কম-বেশি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও গ্রামীণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্বীকৃত ভূমিকা পালন- এর এক, একাধিক বা সব ক'টি গুণসম্পন্ন ব্যক্তি(বর্গ)।

রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা

জনগণ সমাজ ও রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর এ বিশাল জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্যই বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়নে ও বাস্তবায়নে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ একান্ত জরুরি।[২২] জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়নের যে কৌশল অতি সম্প্রতি উন্নয়ন সাহিত্যে স্থান লাভ করেছে[২৩], তা কেবল আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না,

---

[২০] Sing, op. cit..

[২১] Karim, op. cit..1990 p. 38

[২২] রহিমা বেগম, *রাজনীতি, প্রশাসন ও উন্নয়ন: প্রেক্ষিত গ্রামীণ বাংলাদেশ*, (অপ্রকাশিত এম.ফিল. থিসিস), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩, পৃ: ৬৪।

[২৩] খুরশিদ আলম, বাংলাদেশের উন্নয়নে জন-অংশগ্রণ: একটি পর্যালোচনা, *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, চতুর্বিংশ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ঢাকা, ডিসেম্বর-২০০৬, পৃ: ২১৭।

বরং দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য রাজনৈতিক উন্নয়নও এতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। তাহলেই একটি সমাজ তথা রাষ্ট্র গণমানুষের উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষার শতভাগ বাস্তবায়ন ঘটাতে পারবে। যে কোনো সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তার রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। উন্নত রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিনির্মাণে রাজনীতিকে গণমানুষের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়ার দাবি করা হয়, যা কেবলমাত্র গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতিতেই সম্ভব কিন্তু গ্রামাঞ্চলের মানুষ তুলনামূলকভাবে কমশিক্ষিত এবং রাজনৈতিকভাবে অসচেতন হওয়ায় আরোপিত রাজনৈতিক দিক নির্দেশনা অনুসরণ করা তাদের জন্য সহজ নয়। এর জন্য প্রয়োজন গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে ব্যাপকমাত্রায় রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলা। কিন্তু শহরকেন্দ্রিক রাজনৈতিক দলসমূহ ও নেতৃবৃন্দের সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের কোনো সংযোগ থাকে না বলে অভিযোগ রয়েছে।[২৪] ঐতিহ্যগতভাবেই গ্রামীণ এলিটদের সাথে রাজনৈতিক দলগুলোর সুসম্পর্ক বিদ্যমান।[২৫] তাই রাজনৈতিক দলগুলো এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করেন গ্রামীণ এলিটেরা। মূলত গ্রামীণ এলিটদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসার কারণে গ্রামীণ জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহণের পথ উন্মুক্ত হয়েছে।[২৬] বর্তমানে গ্রামীণ নেতৃত্বের উল্লেখযোগ্য উপাদান হলো রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা।[২৭] আর রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার প্রভাবে গ্রামীণ এলিটদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধিত হওয়ায় গ্রামাঞ্চলে নিয়মিত স্থানীয় এবং জাতীয় সংবাদপত্র পাওয়া যায়। এসব সংবাদপত্র পাঠের মাধ্যমে তারা দেশের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারেন এবং রাজনৈতিক ইস্যুতে নিজস্ব মনোভাব তৈরী করতে পারেন। এ ছাড়াও তাদের রাজনৈতিক সচেতনতার প্রভাবে তাদের অনুসারীদের রাজনৈতিক সচেতনতাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তুলতে তারা বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখেন।

ক. রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সচেতন করার প্রক্রিয়া

গ্রামীণ হাট-বাজার-ক্লাব-সমিতি-চায়ের স্টলে সমবেত মানুষের মাঝে রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা অব্যাহতভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এসব আলোচনায় গ্রামীণ এলিটেরা রাজনৈতিক ইস্যুতে তাদের মনোভাব ব্যক্ত করতে উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকেন। কারণ রাজনৈতিক সচেতনতার বহিঃপ্রকাশকে গ্রামীণ সমাজে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা হয়। বর্তমান গবেষণাধীন নিরীক্ষিত ইউনিয়ন দুটির বিভিন্ন হাট-বাজার এবং ক্লাব-সমিতিতে উপস্থিত থেকে দেখা গেছে, রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনায় গ্রামীণ এলিটেরা তুলনামূলকভাবে বেশি আগ্রহী। কোনো শিক্ষিত অথবা রাজনীতিতে সক্রিয় যাদের শহরের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে এমন গ্রামীণ এলিটের আলোচনা গ্রামবাসীরা বেশি উপভোগ্য বিবেচনা করে রাজনৈতিক বিষয়ে নিজেদের সচেতন করে তুলতে চেষ্টা করেন। তবে রাজনৈতিক বিষয়ে জাতীয় ইস্যুর চেয়ে স্থানীয় ইস্যু (দলাদলি ও

---

[২৪] বেগম, প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৩।

[২৫] B.K. Jahangir, *Rural Society, Power Structure and Class Practice*, Dhaka: Centre for Social Studies, 1982, P. 47.

[২৬] মোঃ শামসূল হক, *বাংলাদেশের গ্রামীণ রাজনৈতিক এলিট: সারিয়াকান্দি উপজেলার উপর একটি সমীক্ষা বিশ্লেষণ* (অপ্রকাশিত এম.ফিল. থিসিস) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ১৯৯২, পৃ: ৮৭।

[২৭] আতিউর রহমান, *বাংলাদেশে উন্নয়নের সংগ্রাম*, ঢাকা: প্রবর্তক প্রকাশনী, ১৯৯১, পৃ: ৬৮।

গ্রুপিং) বেশি গুরুত্ব পায়। বিরোধী রাজনৈতিক দল কখনো হরতাল-অবরোধের মতো কর্মসূচি প্রদান করলে গ্রামীণ এলাকায় সর্বত্র তা প্রধান আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়। তবে রাজনৈতিক ইস্যুতে আলোচনার মধ্যে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি'র সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা বিশেষ করে দল দু'টির নেত্রী শেখ হাসিনা এবং খালেদা জিয়া সম্বন্ধে আলোচনা বেশি জনপ্রিয়। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে এ ধরনের আলাপ-আলোচনার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এ ছাড়াও জাতীয় নির্বাচনের ভোট রাজনীতিতে এ ধরনের খোলামেলা আলাপ-আলোচনার প্রভাব বিদ্যমান। অধিকন্তু দলীয় মনোভাব গঠনে এ ধরনের আলাপ-আলোচনার গুরুত্ব ব্যাপক।

খ. রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সচেতন করার প্রক্রিয়া

গ্রামীণ এলিটেরা নিজ নিজ রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অনুসারীদের অংশগ্রহণ করিয়ে তাদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির যে প্রচেষ্টা চালান তা রাজনৈতিক সমর্থন আদায়ের একটি জনপ্রিয় কৌশল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শুধুমাত্র নিজ অনুসারীদের নয়, অন্য গ্রামবাসীদেরও এসব রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণের মধ্যদিয়ে রাজনৈতিকভাবে নিজ দলের প্রতি আনুগত্যশীল করতে তারা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। এ ক্ষেত্রে তাদের মূল লক্ষ্য থাকে টার্গেট-ব্যক্তিকে নিজ দলীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত করে গ্রাম পর্যায়ে নিজের প্রভাব বৃদ্ধি করা। কিন্তু এতে যে ব্যক্তির রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিসীমা বিস্তৃত হয় তা উক্ত গ্রামীণ এলিটদের কাছে ক্ষেত্র বিশেষে অনাবিস্কৃতই থেকে যায়। তাছাড়া, রাজনৈতিক এসব কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের ব্যাপারে সাধারণ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যেও বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি হয়। ফলে দলীয় আনুগত্যের পরিবর্তে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা অনুধাবনে তারা ক্ষমতাসীন এবং বিরোধী উভয় রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিতেই অংশগ্রহণ করে থাকেন। এতে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং রাজনৈতিক ইস্যুতে নিজস্ব মনোভাবের বিকাশ হয়। এসব রাজনৈতিক কর্মসূচির মধ্যে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল যেমন সরকারের নীতি, আদর্শ এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বিবরণের মাধ্যমে জনগণের আস্থা অর্জন করতে চায়, তেমনিভাবে বিরোধী দলসমূহ সরকারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পাশাপাশি নিজেদের অতীত সাফল্য এবং ভবিষ্যৎ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিকল্পনা উপস্থাপন করে নিজেদের অনুকূলে জনসমর্থন আদায় করতে প্রচেষ্টা চালায়। এতে গ্রামীণ সাধারণ জনগোষ্ঠী দেশের সাম্প্রতিক আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারে এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে নিজেদের মনোভাব ব্যক্ত করতে পারে। আর এসব মনোভাব তৈরীতে গ্রামীণ এলিটদের প্রভাব প্রশ্নাতীত। কারণ গ্রামীণ এলিটদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারী গ্রামবাসীদের মাঝে অনুপ্রবিষ্ট হয়। তাই বলা যায়, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বিনির্মাণে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ।

২০০৬ সালের প্রথম দিক থেকে শুরু করে তৎকালীন চারদলীয় জোট সরকারের মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত সময়ে গবেষণা এলাকায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে বর্তমান গবেষকের গ্রামীণ এলিটদের এ সংশিষ্ট ভূমিকা পর্যবেক্ষণ সম্ভব হয়েছে। এসব কর্মসূচিতে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সরকারি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের প্রতি যেমন ইতিবাচক মনোভাব, তেমনি দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, আত্মীয়করণ, দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি, কৃষি উপকরণের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্মূল্যের প্রতি তাদের তীব্র নেতিবাচক মনোভাব লক্ষ্য করা গেছে। তেমনিভাবে বিরোধী রাজনৈতিক দলের ধ্বংসাত্মক কর্মসূচির (হরতাল, ধর্মঘট, জ্বালাও-পোড়াও) প্রতি তাদের নেতিবাচক মনোভাবের

বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা গেছে। এসব কর্মসূচিতে গ্রামীণ এলিটেরা নিজ অনুসারীদের সংগঠিত করার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বকে নিজ অনুকূলে আকর্ষণ করে থাকেন। ফলে গ্রামীণ এলিটেরা যেমন নিজ নিজ এলাকায় রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেন, তেমনি সাধারণ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীরও রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।

গ. রাজনৈতিক অধিকার অর্জনে সচেতন প্রক্রিয়া

গবেষণাধীন এলাকাটি বগুড়া জেলার (বগুড়া জেলা বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের জন্মস্থান) অধীন হওয়ায় এটি বিএনপি'র শক্ত ভিত্তি হিসেবে পরিচিত। ১৯৯১ সাল থেকে ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত প্রত্যেকটি জাতীয় নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর অনায়াশ বিজয় এ ধারণাটিকে আরো বদ্ধমূল করেছে। কিন্তু ২০০১ সালের ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর থেকে সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যের অতিমাত্রায় কেন্দ্রমুখী মনোভাব, স্থানীয় প্রভাবশালী নেতাদের সাথে প্রকাশ্যে বিরোধ এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগের অভাবে স্থানীয় রাজনীতির সাথে তাঁর স্পষ্টত দূরত্ব সৃষ্টি হয়। এর ফলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষার সঠিক প্রতিফলন না হওয়ায় তাঁর প্রতি অনেকটা বিরূপ মনোভাব তৈরী হয়। ফলে ২০০৭ সালের ২২ ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠিতব্য (স্থগিত এবং ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮-এ অনুষ্ঠিত) ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকেন্দ্রিক তৎপরতায় সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্য পুনর্বার নির্বাচিত হতে জনসমর্থন আদায়ে বেকায়দায় পড়ে যান। বিশেষত স্বীয় দলের বহিষ্কৃত প্রভাবশালী নেতা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘোষণা দিলে নিজ দলীয় নেতা-কর্মীদের বিভক্তি তার শক্ত সমর্থন ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়। এমতাবস্থায় স্থানীয় সংসদ সদস্য ব্যাপক মাত্রায় জনসংযোগ, মিটিং এবং শো-ডাউন অব্যাহত রাখলেও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জবাবদিহিতার মুখে তাকে বারবার বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়। বিশেষত পূর্বের নির্বাচনকালীন বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণে তাঁকে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আস্থা অর্জনে বেগ পেতে হয়। এ ক্ষেত্রে নিজ দলীয় বিদ্রোহী প্রতিদ্বন্দ্বী থাকায় সংশ্লিষ্ট দলীয় অনুসারী গ্রামীণ এলিটেরা নিজেদের সমর্থকগোষ্ঠী নিয়ে প্রার্থী সমর্থনে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েন। এ সময় স্থানীয় প্রভাবশালী গ্রামীণ এলিটদের সংগঠিত করতে সংসদ সদস্যকে তাদের প্রতি নমনীয় মনোভাব এবং প্রতিশ্রুতি পূরণে বারংবার অঙ্গীকার প্রদান করতে দেখা গেছে। ক্ষেত্র বিশেষে পূর্বের প্রতিশ্রুতি পূরণে স্থানীয় এ সংসদ সদস্যকে নিজের পকেটের পয়সা খরচ করতে হয়েছে। এভাবে গ্রামীণ এলিটেরা তাদের অনুসারীদের সংগঠিত করে তার রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করিয়েছেন। এসব অধিকার আদায়ের মধ্যে রাস্তা সংস্কার, ব্রীজ-কালভার্টের ব্যবস্থা, মসজিদ-মাদ্রাসা এবং ঈদগাহ ময়দান সংস্কার উল্লেখযোগ্য। সরকারি অনুদান লাভে এবং সংসদ সদস্যের পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়ার ক্ষেত্রে গ্রামীণ এলিটেরা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে জনমত গড়ে তোলেন এবং ক্ষমতাসীন নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে এসব অনুদান আদায়ে সক্ষম হয়ে থাকেন। এ ছাড়া , গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও প্রশাসনিক সমস্যা গ্রামীণ এলিটেরা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় সমাধান করে তাদেরকে নিজ রাজনৈতিক দলের প্রতি আস্থাশীল করে তোলেন। ফলে ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক নিজ স্বার্থে দলীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সুবাদে ঐসব গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি নিজ পরিবারের সদস্যদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণে গ্রামীণ এলিটেরা বেশ তৎপর। মূলত নিজের পরিবারের সদস্যদের রাজনৈতিক সচেতনতার সাথে সাথে স্থানীয় এলাকায় নিজেদের রাজনৈতিক প্রভাবের

ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখতে এবং তাদের মধ্যে ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের সোপান সৃষ্টি করার জন্য রাজনীতির প্রতি তাদের আগ্রহী করে তুলতে তারা সচেষ্ট হয়ে থাকেন। মোবাইল ফোনের সাহায্যে উপজেলা নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ রাজনৈতিক তৎপরতায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ফলে অতীতের তুলনায় বর্তমানে গ্রামীণ এলিটেরা রাজনৈতিকভাবে অধিক সচেতন এবং তাদের এ সচেতনতার প্রভাবে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতার মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। বলা যায়, গণমাধ্যমের সাথে সাথে মোবাইল ফোনও গ্রামীণ সব শ্রেণীর মানুষের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ একটি মাধ্যম হিসেবে ভূমিকা রাখছে।

স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনে গ্রামীণ এলিটদের অংশগ্রহণ এবং প্রভাব

গ্রামীণ রাজনীতির একটি বৈশিষ্ট্য হলো দলাদলি (Jaman, 1977)।[২৮] যে কোনো বিষয়কে কেন্দ্র করেই দলাদলি সৃষ্টি হতে পারে। এরূপ দলাদলির সাথে ব্যক্তি স্বার্থ, সামাজিক মর্যাদা এবং আধিপত্যের প্রশ্ন জড়িত থাকে। এ ধরনের দলাদলির পেছনে নানা কারণ ক্রিয়াশীল থাকতে পারে; এর মধ্যে সম্পত্তি সংক্রান্ত কোন্দল, গোষ্ঠীগত কোন্দল উল্লেখযোগ্য। সাম্প্রদায়িক স্বার্থও কখনো কখনো দলাদলির সৃষ্টি করে থাকে।[২৯] নির্বাচন নিয়ে (বিশেষ করে, ইউপি নির্বাচন) এ ধরনের দলাদলি নির্দিষ্ট গ্রামের গণ্ডি পেরিয়ে নির্দিষ্ট একটি এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। নির্বাচনের ব্যাপারে বাংলাদেশের মানুষের উৎসাহের ব্যাপারে শামসুল হুদা হারুনের মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ। Haroon (1975) লিখেছেন, 'Bangalis tend to be emotional as the elections warming up to fray, and nothing excites them more then elections which enable them to air their views on issues both explicit and smouldering'।[৩০] ভোটের ব্যাপারে বাংলাদেশের মানুষকে যতোটা আগ্রহী দেখা যায় আর কোনো ব্যাপারে তাদের এতোটা আগ্রহী হতে দেখা যায় না। কারণ ভোটদানকে তারা সরকার নির্বাচনে নিজেদের অংশগ্রহণ হিসেবে বিবেচনা করে।[৩১] সুতরাং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর রাজনীতি সংশিষ্ট আলোচনায় নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয় হওয়ার দাবি রাখে।

গ্রামীণ সমাজে নির্বাচন একটি উদ্দীপনা তথা উৎসবের অপর নাম। নির্বাচনকালীন সময়ে গ্রামীণ সমাজে যে উৎসবের আমেজ তৈরী হয়, অন্য কোনো সময়ে সে আমেজ সম্ভব নয়। অতীতে নির্বাচনে নারীদের আগ্রহের মাত্রা তুলনামূলকভাবে কম দেখা গেলেও ১৯৯৭ সাল থেকে ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) নির্বাচনে ৩ জন মহিলা সদস্য সরাসরি ভোটে নির্বাচনের বিধান শুরু হলে ইউপি নির্বাচনে মহিলাদের মধ্যেও ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা তৈরী হয়। নির্বাচনকেন্দ্রিক উদ্দীপনা এবং উৎসবের মাত্রার দিক থেকে জাতীয় নির্বাচনের চেয়ে ইউপি নির্বাচন বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

---

[২৮] M. Q Zaman,, *Social Conflict and Political Process in Rural Bangladesh,* (Unpublished M.Phil. Dissertation). Rajshahi University: IBS. 1977.

[২৯] মোহাম্মদ শহিদুলাহ, *গ্রামীণ রাজনৈতিক এলিট: কুমিলা জেলার উত্তর গৌহাটি ইউনিয়নের নেতৃত্ব ধারার বিশেষণ* (অপ্রকাশিত এম.ফিল. থিসিস), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ১৯৯২, পৃ: ৮৮।

[৩০] Shamsul Huda Haroon,, *Bangladesh: Voting Behaviour A Pse-Phological Study,* Dhaka University. 1986. P. V.

[৩১] শহিদুলাহ, প্রাগুক্ত, পৃ: ৯৩।

সারণি-১.১ জাতীয় নির্বাচন এবং ইউপি নির্বাচনে গ্রামীণ এলিটের গুরুত্ব প্রদানের নমুনা

গ্রামীণ এলিটদের মতামত	এলিটদের সংখ্যা	শতকরা হার
ইউপি নির্বাচনকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেন	১৩৭ জন	৬৮.৫%
জাতীয় নির্বাচনকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেন	৬৩ জন	৩১.৫%
মোট	২০০ জন	১০০%

সূত্র: মাঠ জরিপ

উপর্যুক্ত (১.১) সারণিতে লক্ষ্য করা যায়, উত্তরদাতা গ্রামীণ এলিটদের মধ্যে মোট ১৩৭ জন (৬৮.৫%) গ্রামীণ এলিট ইউপি নির্বাচনকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এ শ্রেণীর গ্রামীণ এলিটেরা জাতীয় ইস্যুর পরিবর্তে স্থানীয় ইস্যুতে বেশি আগ্রহী। অল্প শিক্ষিত, মধ্য শিক্ষিত এবং ঐতিহ্যগত গ্রামীণ এলিট এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। বাকী ৬৩ জন (৩১.৫%) গ্রামীণ এলিট জাতীয় নির্বাচনকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেন। এ শ্রেণীর গ্রামীণ এলিটেরা অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত ও সচেতন। এদের মধ্যে শিক্ষক, প্রভাষক, ইউপি চেয়ারম্যান-মেম্বার রয়েছেন। এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি লক্ষ্য করা গেছে তা হলো সব ক'জন গ্রামীণ এলিট সংশ্লিষ্ট বিষয়টিতে তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। এ থেকেই গ্রামীণ এলাকায় নির্বাচনকেন্দ্রিক উৎসাহের মাত্রা উপলব্ধি করা যায়।

সারণি-১.২ ইউপি নির্বাচনকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার নির্ধারিত কারণের ভিত্তিতে গ্রামীণ এলিটের অবস্থান

গ্রামীণ এলিটদের মতামত	গ্রামীণ এলিটদের সংখ্যা	শতকরা হার
কোড নং-১	৪৪ জন	২২%
কোড নং-২	৩২ জন	১৬%
কোড নং-৩	২৭ জন	১৩.৫%
কোড নং-৪	২২ জন	১১%
কোড নং-৫	১২ জন	৬%
মোট	১৩৭ জন	৬৮.৫%

সূত্র: মাঠ জরিপ

কোড পরিচিতি

১) ইউপি নির্বাচনের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে।
২) গ্রাম পর্যায়ে প্রভাব প্রতিপত্তির নির্ণায়ক ইউপি নির্বাচন।
৩) ইউপি নির্বাচনের ব্যাপারে সাধারণ মানুষ বেশি আগ্রহী।
৪) ইউপি নির্বাচন বৃহত্তর জাতীয় নির্বাচনে সরাসরি প্রভাব ফেলে।
৫) স্থানীয় পর্যায়ে এর মাধ্যমে যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি হয়।

সারণি-১.২ এ লক্ষ্য করা যায়, উত্তরদাতা গ্রামীণ এলিটদের মধ্যে ১৩৭ জন (৬৮.৫%) গ্রামীণ এলিট ইউপি নির্বাচনকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেন। ১৩৭ জন গ্রামীণ এলিটের মধ্যে ৪৪ জন (২২%) গ্রামীণ এলিট ইউপি নির্বাচনকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলার কারণ হিসেবে এর

মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে বলে মনে করেন। স্থানীয় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে চিহ্নিত করে সর্বনিম্ন এ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারটিকে আরো বেশি ক্ষমতা দেয়া উচিৎ বলে তারা মনে করেন। বিশেষ করে, স্থানীয় এলাকার উন্নয়নে যাবতীয় ক্ষমতা এ সংস্থাটিকে দেয়া উচিৎ বলেই এ শ্রেণীর গ্রামীণ এলিটেরা দাবি করেন। উত্তরদাতা গ্রামীণ এলিটদের মধ্যে মোট ৩২ জন (১৬%) গ্রামীণ এলিট গ্রাম পর্যায়ে প্রভাব প্রতিপত্তির নির্ণায়ক হিসেবে ইউপি নির্বাচনকে উল্লেখ করে ইউপি নির্বাচনের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেন। গ্রামীণ এলিটদের ক্ষমতা এবং প্রভাবের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পাওয়া যায় স্থানীয় সরকারের এ নির্বাচনে। ২৭ জন (১৩.৫%) গ্রামীণ এলিটের মতে, ইউপি নির্বাচনের ব্যাপারে সাধারণ মানুষ বেশি আগ্রহী হওয়ায় ইউপি নির্বাচনকে তারা বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেন। ফলে ইউপি নির্বাচন গ্রামীণ সমাজে যে আগ্রহের সূচনা করে নির্বাচনী ফলাফলের মাধ্যমে সে আগ্রহের আপাততঃ পরিসমাপ্তি ঘটালেও প্রতিপক্ষের নিকট পরাজিত হওয়ার দুঃখবোধ পরবর্তী নির্বাচনে নিজেদের প্রার্থীকে জয়ী করতে নিজেদেরকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে প্রেরণা জোগায়। ২২ জন (১১%) গ্রামীণ এলিট মনে করেন, ইউপি নির্বাচন জাতীয় নির্বাচনে সরাসরি প্রভাব ফেলে। এ শ্রেণীর গ্রামীণ এলিটেরা রাজনীতিতে সক্রিয় এবং জাতীয় নির্বাচনের ভোট রাজনীতিতে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হওয়ায় এমন মতামত প্রদান করেছেন। বিশেষ করে, ১৯৯১ সালে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে অনুষ্ঠিত প্রত্যেকটি জাতীয় নির্বাচনে ইউপি নির্বাচনের ফলাফলে প্রভাব ফেলায় এ ধারণা ক্রমান্বয়ে বদ্ধমূল হতে চলেছে। অদূর ভবিষ্যতে আনুষ্ঠানিকভাবে না হলেও অনানুষ্ঠানিকভাবে যে রাজনৈতিক দলের মনোনয়নের ভিত্তিতে ইউপি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা অংশগ্রহণ করবে সে সম্ভাবনাকে নাকচ করা যায় না। এ ক্ষেত্রে ১২ জন (৬%) গ্রামীণ এলিট মনে করেন, স্থানীয় পর্যায়ে যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টির জন্য ইউপি নির্বাচনের বিকল্প নেই। যোগ্য নেতৃত্ব বাছাইয়ের প্রধান শর্ত জনসমর্থন নিশ্চিত করা। ইউপি নির্বাচনে সে রকম নেতৃত্ব নির্বাচন করা সম্ভব হয়। তাই যোগ্য নেতৃত্ব বাছাইয়ের মাধ্যম হিসেবে ইউপি নির্বাচনকে এ শ্রেণীর গ্রামীণ এলিটেরা চিহ্নিত করেছেন।

ঘ. ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে গ্রামীণ এলিটদের অংশগ্রহণ ও প্রভাব

ইউপি নির্বাচনে গ্রামীণ এলিটদের অংশগ্রহণ একটি গতানুগতিক ঘটনা। মূলত ইউপি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের প্রাথমকি স্তর হওয়ায় গ্রামীণ এলাকায় উন্নয়নের কর্তৃপক্ষ ইউনিয়ন পরিষদ।[৩২] গ্রামীণ আনুষ্ঠানিক নেতৃত্বের অধিকারীও ইউনিয়ন পরিষদ। অনেক ধ্রুপদী গবেষকই ইউপি নির্বাচনে গ্রামীণ এলিটদের অংশগ্রহণ চিহ্নিত করতে সক্ষমতা দেখিয়েছেন।[৩৩] বর্তমান গবেষণা এলাকায় ইউপি নির্বাচনে গ্রামীণ এলিটদের অংশগ্রহণ চিহ্নিত করতে পূর্বতন (২০০৩ সালে অনুষ্ঠিত) নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী গ্রামীণ এলিটদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, অংশগ্রহণকারী প্রায় সব প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীই গ্রামীণ এলিটীয় মর্যাদার অধিকারী। এলিট নন এমন দু'একজন ব্যক্তি ইউপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলেও নির্বাচনী ফলাফলে যেমন তারা

---

[৩২] Muhammad Wahhab. The Rural Political Elite in Bangladesh: A Study of Leadership Pattern in Six Union Parishads of Rangpur District (Unpublished M.Phil. Dissertation), Rajshahi University: IBS. 1980, P. 18.

[৩৩] Wahhab. op. cit. p. 67; শহিদুলাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬।

কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, তেমনি গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয়ও কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনি।

ইউপি নির্বাচনে গ্রামীণ এলিটদের এ অংশগ্রহণকে দু'ভাবে চিহ্নিত করা যায়। প্রথমত, যারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন; দ্বিতীয়ত, যেসব গ্রামীণ এলিট সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর নির্বাচনী কর্মতৎপরতায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করে থাকেন। সাধারণত ইউপি নির্বাচনে একাধিক প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়। চেয়ারম্যান পদের নির্বাচনে দু'জন প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনী তৎপরতা নিয়ে গ্রামীণ এলিটেরা বিভক্ত হয়ে পড়েন। এ ধরনের বিভক্তিতে নানা কারণ বিদ্যমান থাকে। এ ক্ষেত্রে Wahhab (1980) দেখিয়েছেন, বহিরাগত এবং স্থানীয়দের মধ্যে দলাদলি, অঞ্চলভিত্তিক দলাদলি এবং অন্যান্য অসংগঠিত দলাদলি এ ধরনের বিভক্তিতে ক্রিয়াশীল থাকে।[৩৪] বর্তমান গবেষণা এলাকা হিসেবে নির্বাচিত দু'টি ইউনিয়নে ইউপি চেয়ারম্যান প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রেও এ ধরনের নানাকরম দলাদলিতে এর অস্তিত্ব বিদ্যমান। তবে অসংগঠিত এ দলাদলি নির্বাচনকালীন সময়ে সংগঠিত হলেও নির্বাচন পরবর্তী সময়ে এর অস্তিত্ব লক্ষ্যণীয় নয়। মির্জাপুর ইউনিয়নে বহিরাগমন বেশি ঘটায় ইউপি নির্বাচনে বিশেষত চেয়ারম্যান নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্থানীয় এবং বহিরাগতদের মধ্যে উপদলীয় দলাদলি তীব্র রূপ ধারণ করে। যার ফলে স্থানীয় লোকজন অধ্যুষিত এলাকায় যেমন স্থানীয় প্রার্থীরা অধিক ভোট পান, তেমনিভাবে বহিরাগত ভোটার অধ্যুষিত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত ভোটকেন্দ্রে বহিরাগত প্রার্থী সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট অর্জনে সমর্থ হয়েছেন। এসব উপদলীয় কোন্দলে নেতৃত্ব প্রদান করেন স্থানীয় গ্রামীণ এলিটেরা, যাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং তৎপরতায় নির্বাচনী তৎপরতা তীব্র মাত্রা লাভ করে। এ ক্ষেত্রে গ্রামীণ এসব এলিট নিজেদের প্রার্থীর পক্ষে প্রচারাভিযানসহ নিজেদের অনুসারী-সমর্থক গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে নানা কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন।

অন্যদিকে, বিশালপুর ইউনিয়নে অঞ্চলভিত্তিক উপদলীয় দলাদলি ইউপি নির্বাচনকে নতুন মাত্রা দেয়। খালের (স্থানীয় ভাষায় খারি) পূর্বাংশ এবং পশ্চিমাংশের মধ্যে এ উপদলীয় দলাদলি বিদ্যমান। সুদীর্ঘকালব্যাপী এ ধারা বিদ্যমান। নির্বাচনে পূর্বাংশের প্রার্থীরা যেমন পশ্চিমাংশের ভোট লাভে ব্যর্থ হয়ে থাকেন, তেমনিভাবে পশ্চিমাংশের প্রার্থীরা পূর্বাংশের ভোট পান না।

ইউপি নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থীর নির্বাচনী তৎপরতায় যে উত্তেজনা তৈরী হয় মেম্বার প্রার্থীর নির্বাচনী তৎপরতায় ততোটা উত্তেজনা না থাকলেও নিজ নিজ প্রার্থীদের বিজয়ী করতে গ্রামীণ এলিটেরা নিজ নিজ অনুসারীদের সংগঠিত করতে আত্মীয় এবং জ্ঞাতি-গোষ্ঠীদের ঐক্যবদ্ধ করতে চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। ফলে এলিটীয় মর্যাদার লড়াই হিসেবে স্থানীয় এলাকায় গ্রামীণ এলিটেরা নিজ নিজ প্রার্থীদের বিজয়ী করতে প্রকাশ্যে তৎপরতার পাশাপাশি নানারকম অপকৌশলের (বিড়ি-সিগারেট-নগদ অর্থ) আশ্রয় গ্রহণ করতেও দ্বিধাবোধ করেন না।

রাজনৈতিক দলীয় প্রার্থীর পক্ষে সংশ্লিষ্ট দলের সদস্য এবং সমর্থকদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ সাম্প্রতিক একটি প্রবণতা হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান প্রার্থীর দলীয় মনোনয়নের ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ দিন দিন জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। এ পর্যায়ে ইউপি নির্বাচনে গ্রামীণ এলিটেরা যে বিভিন্ন পদ্ধতিতে ভূমিকা রাখেন তা চিহ্নিত করা হবে।

---

[৩৪] Wahhab. op. cit. p. 59-72.

প্রার্থী মনোনয়নে ভূমিকা

ইউপি নির্বাচনের তফসিল ঘোষিত হওয়ার সাথে সাথে গ্রামীণ এলিটেরা নিজেদের প্রার্থী মনোনয়নে জোর তৎপরতা চালান। এ ক্ষেত্রে গোষ্ঠীগত ঐক্য ছাড়াও তারা আত্মীয়তার সূত্রে প্রার্থী মনোনয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তা ছাড়া, দলীয় (রাজনৈতিক) ঐক্যের মাধ্যমে প্রার্থী মনোনয়নের প্রবণতাও দেখা যায়। প্রার্থী মনোয়নের পর তা নিজ গ্রামে সাধারণ আলোচনায় আনার জন্য গ্রামের সবাইকে ডাকা হয় এবং কৌশলে সকলের সমর্থন আদায়ের প্রকাশ্য ঘোষণা নেয়া হয়। ইউপি নির্বাচনে গ্রামের সাধারণ মানুষের সমর্থন অপরিহার্য। এসব গ্রামীণ এলিট প্রার্থী মনোনয়ন প্রক্রিয়া শেষে হাট-বাজার এলাকায় নিজ নিজ প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে উপস্থিত লোকজনের সমর্থন আদায়ে সর্বাত্মক প্রয়াস চালান । পরবর্তীতে আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে গ্রামীণ এলিটেরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন।

ভোট প্রার্থনা

ইউপি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী চেয়ারম্যান প্রার্থী অথবা সমর্থক গ্রামীণ এলিটেরা প্রার্থীগণের নির্বাচনী প্রতীক নিয়ে ইউনিয়নব্যাপী সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর জন্য ভোট প্রার্থনা করে থাকেন। নির্বাচনের সময়ে অনেক দূরসম্পর্কীয় জ্ঞাতি আত্মীয়তা সম্পর্ক হঠাৎ সজীব হয়ে উঠে।[৩৫] গ্রামীণ এলিটেরা বিভিন্ন আত্মীয় সম্পর্ক ধরে তাদের নিকট ভোট প্রার্থনা করতে বাড়িতে উপস্থিত হয়ে যান। ভোট প্রার্থনায় যার নিকট যে ব্যক্তিকে পাঠালে নিজ প্রার্থীর অনুকূলে সমর্থন আদায় করা সম্ভব হবে, তার নিকট সে ব্যক্তিকে পাঠিয়ে নির্বাচনী সমর্থন আদায় নিশ্চিত করার কৌশল গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়া ভোট প্রার্থনায় কোনো ব্যক্তি বিশেষের বিশেষ চাহিদা পূরণের আশ্বাসের মাধ্যমেও সমর্থন আদায় করার চেষ্টা করা হয়। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী এবং তার সমর্থক গ্রামীণ এলিটেরা ভোটারদের নিকট নিজ নিজ প্রার্থীর নিশ্চিত বিজয়ের আশ্বাস প্রদান করেন, ভোটাররা যাতে বুঝতে পারে যে, প্রার্থী বেশ ভালো অবস্থানে রয়েছেন। শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নিজ নিজ প্রার্থীর পক্ষে তারা তাদের সমর্থন অব্যাহত রাখেন। এ ছাড়া, ভোট প্রার্থনার সময়ে কোনো ভোটার সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর বিপক্ষে কোনো অভিযোগ আনলে তার সমাধানের চেষ্টা করা হয়। ক্ষেত্র বিশেষে নিজেদের প্রার্থীদের পক্ষে ভোট প্রার্থনায় গ্রামীণ এলিটেরা তাদের পরিবারের মহিলা সদস্যদের ব্যবহার করে থাকেন। তবে বিশেষ কৌশলের অংশ হিসেবে প্রার্থীগণ রাতে বাড়ি বাড়ি ভোট প্রার্থনা করে থাকেন। এ ছাড়া, ভোট প্রার্থনায় অনেক সময় চেয়ারম্যান প্রার্থীকে ভোট প্রদানের আশ্বাসের বিনিময়ে মেম্বার প্রার্থীর জন্য ভোট আদায়ের আশ্বাস অনেকটা গোপনীয়ভাবেই আদায় হয়। কারণ এ ধরনের অলিখিত আশ্বাসের খবর ফাঁস হয়ে গেলে ভোটের ফলাফলে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণায় ভূমিকা

ইউপি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণায় গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা মুখ্য, যা নির্বাচনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। প্রচার-প্রচারণায় যে প্রার্থী যতো অভিনবত্ব এবং কৌশল প্রদর্শন করতে পারেন তার পক্ষে দ্রুত নির্বাচনী জোয়ার তৈরী হয়। এ ধরনের প্রচার কৌশলের মধ্যে প্রার্থীর পক্ষে মাইকিং, পোস্টারিং, গ্রামে গ্রামে শিশু-কিশোরদের দিয়ে সান্ধ্যকালীন মিছিল এবং অফিস স্থাপন উল্লেখযোগ্য। প্রচার-প্রচারণা ছাড়াও বিপক্ষ প্রার্থীদের নির্বাচনী কৌশল সংগ্রহের

---

[৩৫] শহিদুলাহ, প্রাগুক্ত, পৃ: ৯৩।

জন্য এলিটেরা সতর্ক থাকেন। প্রচার-প্রচারণায় নতুনত্ব এবং ব্যাপকতা নির্বাচনী ফলাফলে সফলতা নিয়ে আসে। প্রচারণা প্রার্থীদের সমর্থনের সীমা বাড়ায়।

সভা-সমাবেশ আয়োজনে ভূমিকা

ইউপি নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থীর পক্ষে হাট-বাজার এলাকায় সভা-সমাবেশের আয়োজন সাধারণ ভোটারদের আকৃষ্ট করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং সহযোগী গ্রামীণ এলিটেরা নির্বাচনী প্রতীক নিয়ে ইউনিয়নব্যাপী বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে সভা-সমাবেশের আয়োজন করে থাকেন। নির্বাচনের তারিখ যতোই ঘনিয়ে আসে এ ধরনের নির্বাচনী সভা-সমাবেশ ততোই বেড়ে যায়। স্থানীয় এলাকায় এ ধরনের সভা-সমাবেশকে প্রার্থীর পক্ষে শো-ডাউন হিসেবে উল্লেখ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে নির্বাচনকালীন সময়ে প্রদর্শিত প্রভাব আর শক্তিই গ্রাম্য নেতৃত্ব লাভের পথ সুগম করে দেয়। ইউপি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর চেয়ে প্রার্থীর সমর্থক গ্রামীণ এলিটেরা বেশি আগ্রহ নিয়ে নির্বাচনী তৎপরতা চালান।[৩৬] নির্বাচনী সভা-সমাবেশ এ ধরনের তৎপরতা প্রদর্শনের এবং প্রভাব ও শক্তি প্রদর্শনের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হয়। এসব সমাবেশে স্থানীয় গ্রামীণ এলিটেরা সংশিষ্ট প্রার্থীর পক্ষে স্থানীয় ভোটারদের সমর্থন আদায়ের জন্য স্বীয় এলাকার উন্নয়নে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া উপস্থাপন করে থাকেন এবং প্রার্থীদের নিকট থেকে অঙ্গীকার আদায় করেন। সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের নির্বাচনী মেনিফেস্টো হিসেবে বিবেচিত এসব সমাবেশে প্রতিপক্ষ প্রার্থীদের বিপক্ষে বিভিন্ন অভিযোগের পাশাপাশি নিজেদের বিপক্ষে উপস্থাপিত অভিযোগ খণ্ডন করা হয়। ইউপি নির্বাচনে এ ধরনের সভা-সমাবেশের ব্যাপক গুরুত্ব রয়েছে বলা যায়।

নির্বাচনী মিছিল আয়োজনে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা

ইউপি নির্বাচনে নিজ নিজ মনোনীত প্রার্থীদের সপক্ষে মিছিল আয়োজনে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। তারা সভা-সমাবেশ শেষে এ ধরনের মিছিলের আয়োজন করেন। প্রলোভন দেখিয়ে সাধারণ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে এ সব নির্বাচনী মিছিলে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা হয়। সুতরাং মিছিল যে কোনো প্রার্থীর নির্বাচনী অবস্থানের শক্তি-সামর্থ্য প্রদর্শনের হাতিয়ারস্বরূপ। বৃহৎ মিছিলের আয়োজন প্রতিপক্ষ শিবিরে ভয় ধরিয়ে দেয়। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর এ ধরনের মিছিলে ভোটারদের মধ্যে উৎসাহের সৃষ্টি হয়। তা ছাড়া, মিছিল শেষে কিছু হালকা নাস্তা-পানির (জিলাপী, মুড়ি, মুড়কী, বাতাসা) ব্যবস্থা করা হয়।

এ ছাড়াও, নির্বাচনের নির্দিষ্ট দিন-ক্ষণে ভোটারদের নিজ নিজ ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হতে গ্রামীণ এলিটেরা উৎসাহিত করে থাকেন। গ্রামীণ এসব এলিট মহিলা ভোটারদের নির্বাচন কেন্দ্রে নিয়ে আসার জন্য পরিবহন সুবিধা প্রদান করেন । এ ধরনের পরিবহনের মধ্যে অতীতে গরু-মহিষের গাড়ীর আধিক্য থাকলেও বর্তমানে তার স্থলে ভটভটি (গ্রাম বাংলার অটোভ্যান), পাওয়ার ট্রিলারের ট্রলি, ভ্যান প্রভৃতি ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে পৌঁছে দিতে ব্যবহার হয়। এ ছাড়া, তাদের উদ্যোগে ভোটারদের পান-বিড়ি-সিগারেট সরবরাহসহ ভোটারদের সন্তান-সন্তানাদিকে বাতাসা, জিলাপীসহ অন্যান্য মিষ্টান্ন কিনে দেয়ার ব্যবস্থা থাকে। ক্ষেত্র বিশেষে ভোটকেন্দ্রে কিছু সংখ্যক

---

[৩৬] শহিদুলাহ, প্রাগুক্ত, পৃ: ৯২।

নিরপেক্ষ ভোটারের ভোট নিজ নিজ প্রার্থীদের অনুকূলে আনার জন্য পকেটের পয়সা খরচ করে ভোট কিনতেও তারা দ্বিধাবোধ করেন না।

জাতীয় নির্বাচনে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা

জাতীয় নির্বাচনেও গ্রামীণ এলিটরা সমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। স্থানীয় এলাকায় নিজ দলীয় প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারণা, প্রার্থীর পক্ষে ভোট প্রার্থনা, সভা-সমাবেশসহ স্থানীয় এলাকায় মিছিলের আয়োজন করতে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা অপরিহার্য। তাদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ব্যতীত গ্রামীণ এলাকায় কোনো রাজনৈতিক দলেরই নির্বাচনী তৎপরতা সফলতা পেতে পারে না। তাই গ্রামীণ এলাকায় ভোট রাজনীতিতে সফল হতে রাজনৈতিক দলসমূহ এসব গ্রামীণ এলিটের ওপর আস্থা রাখে। সারণি-১.৩ এ দেখা যায়, মোট ৬৩ জন (৩১.৫%) গ্রামীণ এলিট জাতীয় নির্বাচনকে তুলনামূলভাবে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আখ্যায়িত করেছেন। তাদের মতে, স্থানীয় নির্বাচন স্থানীয় মানুষের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটাতে পারে সত্য, কিন্তু জাতীয় সরকার যদি জনকল্যাণকামী না হয় তাহলে স্থানীয় পর্যায়ে যতো যোগ্য নেতৃত্বই থাকুক না কেন তাতে স্থানীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ শ্রেণীর গ্রামীণ এলিটেরা রাজনীতিতে সক্রিয় এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী হওয়ায় তারা জাতীয় নির্বাচনকেন্দ্রিক তৎপরতায় ব্যাপক সক্রিয়তা প্রদর্শন করেন। এসব সক্রিয়তার মধ্যে নির্বাচনী অফিস স্থাপন, মিছিল-মিটিং এর আয়োজন, নির্বাচনী কৌশল নির্ধারণ উল্লেখযোগ্য। বর্তমান গবেষণার অবশিষ্ট যে ১৩৭ জন গ্রামীণ এলিট (সারণি-১.২) ইউপি নির্বাচনকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেন তারাও জাতীয় নির্বাচনে নিজ নিজ দলীয় প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনী কাজে অংশগ্রহণ করে থাকেন। জাতীয় নির্বাচনে গ্রামীণ এলিটেরা স্থানীয় এলাকায় রাজনৈতিক দলের সরাসরি প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। গ্রামীণ এসব এলিট স্থানীয় এলাকায় পোস্টারিং এর ব্যবস্থা করেন। সংশ্লিষ্ট প্রার্থী নিজ এলাকায় এলে তার সফরসঙ্গী হন এসব গ্রামীণ এলিট। এলাকায় বিভিন্ন সভা-সমাবেশের আয়োজন এবং স্থানীয় বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে উক্ত প্রার্থীর প্রতিশ্রুতি আদায়ে অঙ্গীকার আদায় করে থাকেন। এতে এলাকায় এসব গ্রামীণ এলিটের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়, যা গ্রামীণ সমাজে তাদের প্রভাবশালী হয়ে উঠতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নির্বাচনের নির্দিষ্ট দিনে এসব গ্রামীণ এলিট ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে যেতে উদ্বুদ্ধ করেন এবং মহিলা ভোটরদের পরিবহন সুবিধা প্রদান করেন। ভোট কেন্দ্রে নিজ নিজ প্রার্থীর নির্বাচনী অফিস তৈরী করেন, যেখান থেকে ভোটারদের ক্রমিক নম্বরের টোকেন প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে ভোট কেন্দ্রের অভ্যন্তরে নিজ দলীয় এজেন্ট মনোনয়নের কাজটা তাদেরই করতে হয়। এ ছাড়া ভোটারদের পান-বিড়ি- সিগারেট-চা এর ব্যবস্থাও তারা করে থাকেন। তবে নির্বাচনের পূর্ব রাত্রিতে নিজেদের প্রার্থীদের পক্ষে ভোট সংগ্রহের জন্য তারা ভোটারদের নগদ অর্থসহ অন্যান্য বস্তুগত সামগ্রী প্রদান করে থাকেন। এটা গণতান্ত্রিক নীতিমালা পরিপন্থী একটি অপতৎপরতা হলেও গ্রামীণ এলিটেরা এ অনৈতিক কাজটি করতে অনেকটা বাধ্য হন। কেননা, গ্রামের সাধারণ জনগোষ্ঠী এখনো তাদের ভোটকে মূল্যবান মনে করেন না, বরং তাদের কাছে ভোট একটি পণ্যের মতো। সুতরাং যে বেশি মূল্য দেবে তার কাছেই পণ্য বিক্রি হবে এবং ক্ষেত্র বিশেষে এ পণ্য কয়েকবার পর্যন্ত বিক্রি হতে পারে। সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর নিকট থেকে

এ ভোট কেনা-বেচার অর্থের বরাদ্দ আসে । এভাবেই বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনে কালো টাকার দৌরাত্ম্য দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রামীণ এসব এলিট মনে করেন গ্রামের মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি না হলে এবং রাজনৈতিক দলগুলো এর বিরুদ্ধে দৃঢ় মনোভাব গ্রহণ না করলে ভোট কেনা-বেচার এ নির্বাচনী অপকৌশল দূর হবে না।

গ্রামীণ রাজনীতিতে জাতীয় রাজনৈতিক প্রভাবের চিত্র

গত দু'দশকে বাংলাদেশে ব্যাপক রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা জাতীয় রাজনীতিতে বড়ো ধরনের গতিশীলতা আনয়ন করে। গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতির সবচেয়ে বড়ো কার্যকারিতা হলো রাজনীতিকে তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেয়া। তাই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলো নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা অর্জনের জন্য তৃণমূল পর্যায়ে তাদের সংগঠনের বিস্তৃতি ঘটায়। গ্রাম পর্যায়ে রাজনৈতিক সংগঠনের এ বিস্তৃতি সনাতন গ্রামীণ রাজনীতির (দলাদলির রাজনীতির[৩৭]) চরিত্রে পরিবর্তন ঘটিয়ে জাতীয় রাজনীতির বিকাশ ত্বরান্বিত করে থাকে। যদিও অতীতের ন্যায় বর্তমান রাজনীতিতেও গোষ্ঠীগত প্রভাব-প্রতিপত্তি বিদ্যমান।[৩৮] ১৯৬২ সালে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পাকিস্তানে একটি নতুন শাসনতন্ত্র চালু করেন। এতে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান থেকে ৪০ হাজার (ইউনিয়ন কাউন্সিল সদস্য) এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৪০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্য হিসেবে দেশের প্রেসিডেন্ট এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচন করতো। এ সময় তারা দেশে যথেষ্ট ক্ষমতাবান হিসেবে গণ্য হয়। মৌলিক গণতন্ত্রীরা ছিলো গ্রামের নতুন একটি সম্প্রদায় যারা তদানিন্তন সরকারের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় অস্তিত্ব লাভ করে। কিন্তু এ নতুন গ্রামীণ এলিটদের দুর্নীতি, প্রিয়তোষণ এবং স্বজনপ্রীতি দ্বারা পরিপুষ্ট করা হয়েছিলো। গ্রাম উন্নয়নের নামে সরকার কর্তৃক এসব ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যদের প্রচুর অর্থ ঘুষ দেয়া হয়েছে।[৩৯] তাই মৌলিক গণতন্ত্রের শাসনামলের সময় গ্রাম পর্যায়ে রাজনীতির বিকাশ নয়, বরং লেজুড়বৃত্তির বিকাশ ঘটেছিলো বলে দাবি করা হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তরকালে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনের মাধ্যমে স্থানীয় স্বশাসিত সরকার পুনর্গঠিত হয়। এ ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের প্রভাব স্পষ্ট ছিলো। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে দেশ হানাদারমুক্ত হওয়ার পর জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দলের নেতা এবং কর্মীরা সব বিষয়ে অগ্রাধিকার লাভ করে। তখন ইউপি চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান-মেম্বার পদে স্থানীয় ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবশালী নেতাদেরই নির্বাচিত হতে দেখা যায়। এসব গ্রামীণ এলিট রিলিফ-ত্রাণ কমিটিরও চেয়ারম্যান। স্থানীয় শাসনে কোনো স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা না থাকায় এসব এলিট

---

[৩৭] Zaman, op. cit.

[৩৮] রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ: ১১৩-১১৫।

[৩৯] আনোয়ারউলাহ চৌধুরী, (মুহম্মদ হাবিবুর রহমান ও মোহাম্মদ ইমদাদুল হক অনুদিত), *বাংলাদেশের একটি গ্রাম: সামাজিক স্তরবিন্যাসের একটি সমীক্ষা*, ঢাকা: মৌলি প্রকাশনী, ২০০৩, পৃ: ৯১-৯২।

দ্রুত দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হন এবং স্বীয় রাজনৈতিক দলের প্রতি কোনোরূপ দায়িত্ব অনুভব না করায় সংগঠনের বিকাশেও মনোযোগি হননি। তৎকালীন সময়ে ক্ষমতাসীন দলের গ্রাম পর্যায়ে বিস্তৃতি দেখা গেলেও তাদের স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি, প্রিয়তোষণ দ্রুত দলটির সমর্থনের ভিত্তি দুর্বল করে দেয়।[৪০] গ্রাম পর্যায়ে রাজনীতির বিকাশ ১৯৯০ পরবর্তী সময় থেকেই বাস্তবে ত্বরান্বিত হয়। এ সময়কালেই গ্রাম পর্যায়ে বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলোর সংগঠনের বিস্তৃতি ঘটে। অন্যদিকে রাজনৈতিক দলের সাথে বিশেষত ক্ষমতাসীন দলের সাথে যোগসূত্র গ্রামীণ সমাজে প্রভাবশালী হওয়ার জন্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। উনিশশো ষাট, সত্তর ও আশির দশকের ৫০ শতাংশ এবং উনিশশো সত্তরের দশকের ৪০ শতাংশ গ্রাম গবেষণায় একে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।[৪১] কিন্তু গত এক দশকে বাংলাদেশের গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। রাজনীতিই এখন গ্রামীণ ক্ষমতার প্রধান উৎস। রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ততা এখন গ্রামীণ ক্ষমতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) এক গবেষণায় এ তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। উক্ত গবেষণা সমীক্ষায় আরো দেখানো হয় ১৯৬০ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত গ্রামীণ যে ক্ষমতা কাঠামো ছিলো ১৯৯০ সালের পর তাতে আসে অভূতপূর্ব পরিবর্তন। আগে যেসব উপাদান গ্রামীণ ক্ষমতার নেতৃত্ব নির্বাচনে মুখ্য ভূমিকা পালন করতো ১৯৯০ সালের পর তার অনেকগুলোর ভূমিকাই গৌণ হয়ে গেছে। ষাটের দশকে গ্রামীণ নেতৃত্ব ছিলো জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর ব্যাপকতা ও বংশ পরিচয়, গ্রামীণ মৌলভী ও ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি। সত্তর দশকে নৃতাত্ত্বিক উপাদানের চেয়ে অর্থনৈতিক উপাদান ক্ষমতা কাঠামোয় অধিক প্রভাবশালী ছিলো। আশির দশকে রাষ্ট্রকে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বর্তমানে সরকারের বিকেন্দ্রীকরণনীতি গ্রামাঞ্চলে রাষ্ট্রের ভূমিকাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে এবং রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ততাই গ্রামীণ নেতৃত্বে মূল বিষয় হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। বর্তমান গ্রামীণ নেতৃত্বের ৯৭.৫ শতাংশই কোনো না কোনোভাবে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত। গ্রামীণ নেতৃত্বের মধ্যে বেশিরভাগই দু'টি শিবিরে অর্থাৎ বিএনপি-আওয়ামী লীগে বিভক্ত। একটি গ্রুপ আওয়ামী লীগের সময় ক্ষমতাবান ছিলো অন্যটি বিএনপি'র সময়। রাজনৈতিক দলের সঙ্গে গ্রামীণ নেতৃত্বের সম্পৃক্ততা প্রসঙ্গে গবেষণায় বলা হয়, গ্রামীণ নেতৃত্ব নির্ধারণে আগে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করতো ভূমি। কিন্তু বর্তমানে গ্রামীণ ক্ষমতার প্রধান উপাদান বা উৎস হচ্ছে রাজনীতি। নব্বইয়ের দশকের পর কয়েকটি সংসদ নির্বাচন হয়েছে। এসব নির্বাচনের পর দেখা গেছে, গ্রামীণ এলাকায় ক্ষমতাবান হওয়ার পেছনে

---

[৪০] চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ: ৯৪-১০৪।
[৪১] রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৮।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বড়ো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ততা।[৪২] তবে ক্ষমতাবান হওয়ার ক্ষেত্রে রাজনীতি প্রধান উপাদান বিবেচিত হলেও ভূমির মালিকেরাই রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে থাকেন। উল্লেখ্য বর্তমান গবেষণায় গ্রামীণ এলিটদের মধ্যে প্রান্তিক ক্ষুদ্র অথবা ভূমিহীন এমন কৃষক পাওয়া যায়নি, যারা কেবল রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার কারণে ক্ষমতাবান হয়ে উঠেছে। যে সব লোক ভূমি মালিকানা, অর্থনৈতিক ক্ষমতা, সামাজিক নেতৃত্ব ও জ্ঞাতিগোষ্ঠীর বৃহৎ বংশের নেতৃত্বের মাধ্যমে শক্তিশালী অবস্থানে থাকেন তাদেরকেই রাজনৈতিক দলে মূল্যায়ন করা হয়। গ্রাম পর্যায়ে জাতীয় রাজনীতির প্রভাব বৃদ্ধির ফলে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতা অনেকাংশেই হ্রাস পেয়েছে। সাম্প্রতিক কালে ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃত্বের পাশাপাশি আরেকটি নতুন নেতৃত্বের সৃষ্টি হয়েছে; তা হলো ইউনিয়ন পর্যায়ে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব। যেহেতু স্থানীয় এমপি তার এলাকায় সমস্ত উন্নয়ন বরাদ্দ বিতরণ (বাস্তবায়নের) নিয়ন্ত্রক এবং দলীয় দৃষ্টিভঙ্গিতেই এসব উন্নয়ন বরাদ্দ বিতরণ হওয়ায় বিরোধী দলের চেয়ারম্যান-মেম্বাররা অধিকমাত্রায় বঞ্চিত হয়ে থাকেন। তা ছাড়া, গত দশকে গ্রামীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাতের-হিংসা-বিদ্বেষের ক্ষেত্রেও আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। অতীতে যেখানে বংশ-গোষ্ঠী প্রভাব, ভূমিকেন্দ্রিক বিবাদ, নারীঘটিত সন্ত্রাস গ্রামীণ শান্ত জীবনকে অশান্ত করে তুলতো,[৪৩] সেখানে বর্তমানে গ্রামীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ক্ষেত্রে ক্ষমতার দাপটে নিরীহ ব্যক্তিদের নামে রাজনৈতিক মামলা দায়ের করার প্রবণতা লক্ষণীয়। তা ছাড়া, এসব দ্বন্দ্ব মীমাংসার প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতিতে এসেছে পরিবর্তন। আগে গ্রাম-এলাকায় কিছু ঘটলে স্থানীয় পর্যায়ে মীমাংসা হতো। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতার দাপটে এখন এটা মামলায় রূপ নিচ্ছে অথবা উপজেলা পর্যায়ে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের হস্তক্ষেপে ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসা হচ্ছে। এখন জাতীয় রাজনীতিকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ এলাকায় দলাদলি হচ্ছে। গ্রাম্য সালিশের ক্ষেত্রে দেখা যায়, অতীতে গ্রামের বয়স্ক ধনী ব্যক্তি বা ঐতিহ্যবাহী পরিবারের সদস্যরা গ্রাম্য সালিশী করতেন। বর্তমানে সালিশে দলীয় ভিত্তিতে মাতব্বরদের দাওয়াত দেয়া হয়। যেসব মাতব্বর ক্ষমতাসীন দলের সমর্থক তারাই এখন সালিশ করে থাকেন। ঐতিহ্যবাহী পরিবারের সদস্য এখন সালিশের জন্য মুখ্য পূর্বশর্ত নয়। বিরোধী দলের সমর্থকেরাও সালিশে অংশগ্রহণ থেকে নিজেদের নিরাপদ দূরত্বে রাখেন। তা ছাড়া, দ্বন্দ্ব মীমাংসায় ক্ষমতাসীনরা ব্যর্থ হলে অথবা কোনো পক্ষ মেনে নিতে অসমর্থ হলে তাদেরকে থানা-পুলিশের মাধ্যমে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে থানা পর্যায়ে নেতাদের মাধ্যমে মীমাংসা করা হয়। গ্রামীণ রাজনীতিতে জাতীয় রাজনীতির এ প্রভাবের চিত্র জাতীয় রাজনীতির

---

[৪২] মুহাম্মদ উমর ফারুক, ও অন্যান্য, বাংলাদেশের গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর এক দশকে পরিবর্তন: একটি মাঠ পর্যায়ের বিশ্লেষণ, *বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা*, চতুর্বিংশতম খণ্ড, ঢাকা: বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ২০০৭, পৃ: ১১১-১২৫।

[৪৩] ইয়েনেকা আরেন্স, এবং ইওস ফান ব্যুরদেন, (নিলুফার মতিন অনুদিত), *ঝগড়াপুর: গ্রাম বাংলার গৃহস্থ ও নারী*, ঢাকা: গণ প্রকাশনী, ১৯৯৮, পৃ: ১৮৭-২১৪।

বিকাশে তাৎপর্যপূর্ণ বিবেচিত হলেও গ্রামীণ সমাজে তা নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। রাজনৈতিক দলগুলোর আদর্শের ভিত্তি দুর্বল হওয়ায় এবং কর্মী-সমর্থকদের দলীয় আদর্শের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তি শক্তিশালী না হওয়ায় গ্রাম পর্যায়ে জাতীয় রাজনীতির প্রভাব বলতে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের প্রভাবই প্রত্যক্ষ করা যায়। এ ক্ষেত্রে যখন যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতাসীন তখন সে রাজনৈতিক দলই ক্ষমতাশালী হিসেবে আবির্ভূত হয়। ভবিষ্যতে রাজনৈতিক দলগুলোর আদর্শিক চেতনার বিকাশের লক্ষ্যে সঠিক কর্মসূচি প্রণয়ন এবং তৃণমূল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে এ অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন সম্ভব।

গ্রামীণ এলিটদের দল পরিবর্তন এবং সরকারি দলের প্রতি দুর্বলতা

গণতন্ত্রে নবীন সংস্কৃতির অধিকারী দেশসমূহে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের কর্মসূচির পরিবর্তে ক্ষমতাকে তাদের সমর্থনের বাহন হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। সাধারণ মানুষও কেন্দ্রীয় ক্ষমতার নৈকট্য লাভের আশায় ক্ষমতাসীন দলের প্রতি সমর্থন দেখাতে চায়। ক্ষমতাসীন দলে থাকলে প্রতিপত্তি বাড়ে, ক্ষমতাও বাড়ে।[৪৪] ক্ষমতাসীনদের সাথে যোগসূত্র স্থাপিত হলে রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতা ব্যবহার করা অধিকতর সহজ হয়।[৪৫] ভারতের গ্রামেও এমন প্রবণতা লক্ষণীয়।[৪৬] এখন অবশ্য গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় প্রভাশালী হয়ে ওঠাই মুখ্য নয়, গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভূমিকা নিশ্চিত করতেই এমন যোগসূত্র জরুরি। এমন দৃষ্টিভঙ্গিই ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের প্রতি তাদের দুর্বল হতে প্রলুব্ধ করে। এ ক্ষেত্রে হক (১৯৯২) বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলার গ্রামীণ নির্বাচিত এলিটদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন যে, অধিকাংশ গ্রামীণ এলিট আদর্শের রাজনীতি অনুশীলন করেন না, বরং ক্ষমতার রাজনীতি এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রতিই তারা দুর্বল, সরকারি দলকে ঘিরেই তাদের দলীয় আনুগত্য ও সম্পর্ক আবর্তিত হয়।[৪৭] কিন্তু গ্রামীণ এলিটদের জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে এহেন সম্পর্কের কতকগুলো যুক্তিসঙ্গত কারণও আছে। যেমন উন্নয়নশীল দেশে বিশেষ করে বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে ক্ষমতাসীন দল অন্য যে কোনো বিরোধী রাজনৈতিক দলের চেয়ে অনেক বেশি প্রভাবশালী। সুতরাং যে সকল ব্যক্তি গ্রামীণ রাজনীতিতে আগ্রহী তারা স্বাভাবিকভাবেই ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত হন। কেননা, এতে রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ ও

---

[৪৪] রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩৮।

[৪৫] রীতা পারভীন, *বাংলাদেশের গ্রামীণ রাজনৈতিক এলিট*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ঢাকা, জুন-১৯৮৬, পৃ: ১৪৩।

[৪৬] Iqbal Narain, *et. al., The Rural Elite in Indian State: A Case Study of Rajastan,* New Delhi: Manohar Book Service, Daryaganj, 1976; Seshadrik, K. & Jain, S.P., *Panchayati Raj and Political Perception of Electorate,* Hyderabad: N.I. C.D., 1972, p. 55.

[৪৭] হক, প্রাগুক্ত, পৃ: ৮০।

ক্ষমতা ব্যবহার করা অধিকতর সহজ হয়।[৪৮] মূলত প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতাভোগের মাধ্যমেই প্রকৃত প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার কৌশল।[৪৯] তা ছাড়া, বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো সাংগঠনিক দিক থেকে তেমন সুসংগঠিত নয় এবং গ্রামের সুদূর এলাকায় তাদের সাংগঠনিক ভিত্তি আরো দুর্বল। সর্বোপরি রাজনৈতিক দলগুলো তেমন কোনো শক্তিশালী রাজনৈতিক মতাদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত না হওয়া[৫০] আদর্শের চেয়ে নেতা বা ব্যক্তির দ্বারা সহজেই প্রভাবিত হয়। এ কারণে দলের ভিতরে গণতন্ত্র চর্চার চেয়ে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর চর্চাই বেশি। আদর্শিক চেতনা না থাকায় সুযোগ-সুবিধার প্রত্যাশায় সরকারি দলের প্রতি গ্রামীণ এলিটেরা দুর্বল হয়ে পড়েন।[৫১] তা ছাড়া, গ্রামীণ এলিটদের সমর্থন অনেকটা শর্তসাপেক্ষ (Conditional) হয়ে থাকে। কারণ তারা নিজ এলাকায় বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সমস্যার সমাধান চান। আর এ ক্ষেত্রে গ্রামীণ এলিটদের ধারণা এই যে, ক্ষমতাসীন দলই তাদের এলাকার উন্নয়নের জন্য কিছু একটা করতে পারে।[৫২] এ কারণেই তারা সরকারি দলের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

দল পরিবর্তন ও আনুগত্য রাজনীতির খেলারই একটি অংশ।[৫৩] অতীতে সুযোগ-সুবিধার প্রত্যাশায় এবং বাধ্যবাধকতার শৃঙ্খলের আবর্তে এ ধরনের দুর্বলতা কিংবা আবশ্যকতা থেকেই সরকারি দলের সাথে গ্রামীণ এলিটদের যোগসূত্র তৈরী হতো। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে গ্রামীণ এলিটদের দল পরিবর্তনের কারণ রাজনীতির কোনো খেলা নয়, বরং নিজ এলাকায় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় আপন অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় প্রভাব বিস্তারের জন্যই তারা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের প্রতি দুর্বলতা দেখান। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল তাদের সাংগঠনিক ভিত্তি মজবুত করতে এবং ভোট রাজনীতিতে সফল হতে গ্রামীণ এলিটদের সংশ্লিষ্টতাকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে। তা ছাড়া, গ্রামীণ এলিটদের মধ্য থেকেই স্থানীয় সরকারের নেতৃত্ব গড়ে ওঠে। কিন্তু স্থানীয় সরকার (ইউপি) পুরোপুরি স্বায়ত্তশাসিত না হওয়ায় অর্থাৎ অর্থনৈতিকভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় অর্থনৈতিক প্রয়োজনেই ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সাথে গ্রামীণ এলিটদের যোগাযোগ তৈরী হয়।[৫৪] বর্তমানে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের স্থানীয় সংসদ সদস্য অথবা উপজেলা নেতৃবৃন্দ উন্নয়ন বরাদ্দ

---

[৪৮] পারভীন, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪৩।

[৪৯] Mills, op. cit. p. 18.

[৫০] Syed Nasar Ahmed Rumi, *Rural Elites and their Role in Development: A Case Study in Kustia District* (Unpublished M.Phil.Thesis), Rajshahi University: IBS, 1985, p. 95.

[৫১] হক, প্রাগুক্ত, পৃ: ৮১।

[৫২] Rumi, op. cit. p. 95.

[৫৩] A.y. Darshankar,, *Leadership in Panchayati Raj,* Jaipur: Pancheel Prakashan, 1979, p. 110.

[৫৪] B.K.Jahangir, Differentiation Polarisation and Confrontation in Rural Bangladesh, Dacca: Centre for Social Studies, 1979, p. 2.

বিতরণে নেতৃত্ব প্রদান করেন। ফলে ক্ষমতাসীন দলের সাথে সংশ্লিষ্টতা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। তাই গ্রামীণ এলিটেরা সরকারি দলের অনুসারী হিসেবে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। তা ছাড়া, যে সব গ্রামীণ এলিটের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা রয়েছে তারা গ্রাম-পর্যায়ে তাদের প্রভাব বৃদ্ধিতে রাজনৈতিক পরিচয় প্রদান করেন বলে Jahangir(১৯৭৯) দেখিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন।[৫৫] এভাবে গ্রামীণ এলিটদের রাজনৈতিক দল পরিবর্তনের মনোভাব পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, ক্ষমতাসীন দলের প্রতি এ দুর্বলতা তাদের ক্ষমতার প্রতি আকর্ষণকেই প্রমাণ করে। এটাও সত্য যে, রাজনৈতিক দলগুলো নেতৃত্ব তৈরীতে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।[৫৬] তাই ক্ষমতার প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ এবং নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী গ্রামীণ এলিটেরা ক্ষমতাসীন দলের প্রতিই তাদের আস্থা প্রদর্শন করেন। বর্তমান গবেষণা এলাকায় গ্রামীণ এলিটদের সরকারি দলের প্রতি দুর্বলতার প্রমাণ পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের দল পরিবর্তনের ধারা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

সারণি-১.৪ রাজনৈতিক দল পরিবর্তনের ভিত্তিতে গ্রামীণ এলিট

গ্রামীণ এলিটদের মতামত	উত্তরদাতা এলিটদের সংখ্যা	শতকরা হার
রাজনৈতিক দল পরিবর্তনকারী এলিট	৪৭ জন	২৩.৫%
রাজনৈতিক দল পরিবর্তন করেন নাই	১২০ জন	৬০%
মতামত প্রদানে বিরত	৩৩ জন	১৬.৫%
মোট	২০০ জন	১০০%

সুত্রঃ মাঠ জরিপ

সারণি ১.৪-তে লক্ষ্য করা যায়, মোট ৪৭ জন (২৩.৫%) গ্রামীণ এলিট রাজনৈতিক দল পরিবর্তন করেছেন। এ শ্রেণীর গ্রামীণ এলিটেরা অধিক বয়স্ক। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে তারা বেশির ভাগই আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে বিভিন্ন কারণে আওয়ামী লীগ ছেড়ে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। এ ক্ষেত্রে বিএনপি'তে যোগদানকারী গ্রামীণ এলিটের সংখ্যা অধিক {২৫ জন (১২.৫%)}। বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের জন্মস্থান বগুড়া-এ বিবেচনায় দলটিতে গ্রামীণ এলিটদের অংশগ্রহণ বেড়েছে। কিছু সংখ্যক গ্রামীণ এলিট {৯ জন (৪.৫%)} আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হয়েছেন। অতীতে এ শ্রেণীর গ্রামীণ এলিটেরা মুসলিম লীগের রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। এ ক্ষেত্রে মোট ৮ জন (৪%) গ্রামীণ এলিট জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতিতে সক্রিয় হয়েছেন। অবশিষ্ট ৫ জন (২.৫%) গ্রামীণ এলিট জাতীয় পার্টির রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন। রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষমতার পালা বদলের সাথে সাথে গ্রামীণ এলিটদের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার পরিবর্তন হয়েছে এবং তা হয়েছে প্রধানতঃ ক্ষমতাসীনদের অনুকূলে। আনুষ্ঠানিকভাবে মাত্র ৪৭ জন (২৩.৫%) গ্রামীণ এলিট দল পরিবর্তনের কথা স্বীকার করেছেন। বাস্তবে গ্রামীণ এলিটদের অনেকেই দল পরিবর্তন করেছেন, কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে তা স্বীকার করেননি। তবে

---

[৫৫] Jahangir, op. cit. pp. 240-278.

[৫৬] Darshankar, op. cit. p. 110.

দল পরিবর্তনের প্রবণতায় কম বয়সী গ্রামীণ এলিটদের চেয়ে অধিক বয়সী গ্রামীণ এলিটেরা এগিয়ে। তরুণদের কাছে স্বার্থের চেয়ে আদর্শ গুরুত্বপূর্ণ বলে অনুমিত হয়েছে। তাই তাদের রাজনৈতিক স্থিতি অপেক্ষাকৃত বেশি। তবে বর্তমানে রাজনৈতিক তৎপরতা তৃণমূল পর্যায়ে বিস্তৃত হওয়ায় এবং উপজেলা নেতৃবৃন্দের সাথে গ্রামীণ এলিটদের যোগাযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় রাজনৈতিক আদর্শহীনতা হ্রাস পাচ্ছে। স্থানীয় নেতৃবৃন্দের হুমকি এবং ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের উপেক্ষা এ প্রবণতা হ্রাসে ভূমিকা রাখছে বলে প্রতীয়মান হয়।

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ এবং সম্পর্ক উন্নয়নের কৌশল

স্থানীয় রাজনীতিতে সক্রিয়তা প্রমাণ করতে এবং নেতৃত্বে সমাসীন হতে রাজনৈতিক যোগাযোগ একটি অপরিহার্য কৌশল। কৌশলটির প্রায়োগিক দক্ষতার ওপর একজন ব্যক্তির নেতৃত্বের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। রাজনৈতিক এ যোগাযোগের জাল কাঠামো (Network) স্থানীয় জনসাধারণ থেকে উপজেলা, জেলা, এমনকি কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। ভারতের গ্রামীণ স্থানীয় নেতৃত্ব তৃণমূল পর্যায় থেকে নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশমান প্রভাবে কেন্দ্র পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন।[৫৭] গণতন্ত্রের মূল কথাই হলো জনগণের নির্বাচিত সরকার কর্তৃক পরিচালিত জনকল্যাণমুখী শাসন। জনমতই এ ধরনের শাসন পরিচালনার নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করে। ফলে শাসন কর্তৃপক্ষ তাদের জনকল্যাণকর শাসন পরিচালনার জন্য জন-মানুষের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলে। জাতীয় রাষ্ট্রের বিশাল ভূ-খন্ডের বিশাল জনসমূদ্রের সাথে শাসক গোষ্ঠীর এমনতরো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরী প্রায়ই অসম্ভব ব্যাপার বটে। ফলে স্থানীয় নেতৃত্বকে এ ধরনের সম্পর্কের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করতে হয় । বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের বসবাস গ্রামাঞ্চলে। আর বাংলাদেশের বিশাল গ্রামীণ এ জনগোষ্ঠীর নেতৃত্ব হিসেবে স্থানীয় গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকার অনস্বীকার্যতা আজ প্রশ্নাতীত। বর্তমান গবেষণা এলাকার স্থানীয় গ্রামীণ এলিটেরা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নেতৃত্ব হিসেবে কেন্দ্রীয় শাসন-কর্তৃপক্ষের সাথে সম্পর্কের প্রয়োজনে উপজেলা, জেলা এবং কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের জাল বিস্তার করে থাকেন। উন্নয়নের নবতরো কৌশলই হলো স্থানীয় জন-মানুষের অংশগ্রহণে উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নে যথার্থ তৎপরতা। কেন্দ্র থেকে আরোপিত উন্নয়ন কৌশল কখনোই স্থানীয় জনগণের ভাগ্যের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ঘটাতে পারে না, যদি না তাতে স্থানীয় মানুষের উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষার যথার্থ মূল্যায়ন করা হয়।[৫৮] এ পরীক্ষিত সত্যকে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় বাস্তবায়ন ঘটাতে স্থানীয় জনগণকে সংগঠিত করা প্রয়োজন। আর গ্রামীণ এলিটেরা স্থানীয় জনগণকে সংগঠিত করে উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন ঘটাতে পারেন। উন্নয়ন পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ এবং অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ প্রয়োজন। এ ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়নের অর্থ সংগ্রহের জন্য কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ অপরিহার্য। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের স্থানীয় প্রতিনিধি হিসেবে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং স্থানীয় সংসদ সদস্য এসব কর্মসূচির তদারকি করে থাকেন। ফলে নিজ নিজ এলাকার

---

[৫৭] Narain, op. cit.

[৫৮] Wasim Alimuzzaman, *Public Participation in Development and Health Programme Lessons from Rural Banladesh*, New York: University Press of America. 1984, p. 10.

উন্নয়ন বরাদ্দ নিশ্চিতকরণে এসব স্থানীয় প্রতিনিধিদের সাথে স্থানীয় গ্রামীণ এলিটেরা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তোলেন । এলাকার উন্নয়নে সরাসরি অংশগ্রহণ এবং সরকারি কর্মকাণ্ডের প্রতি জনগণের আস্থা সৃষ্টিতে সর্বোপরি নিজেদের শক্তিশালী অবস্থানকে সুদৃঢ়করণে এ ধরনের যোগাযোগ সংগঠিত হয় বলেই প্রতীয়মান হয়। তবে এ ধরনের রাজনৈতিক যোগাযোগ যে কেবল ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সাথে সংগঠিত হয় তা নয়; বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আস্থাশীল স্থানীয় এলিটেরা বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে এ ধরনের যোগাযোগ রক্ষা করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে নিজ নিজ রাজনৈতিক দলের প্রতি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সমর্থন বাড়ানোর কৌশল নির্ধারণে, সরকার বিরোধী ইস্যুতে জনমত সৃষ্টি করতে এবং ভবিষ্যতে পরীক্ষিত রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে প্রমাণ করতে তারা এ ধরনের যোগযোগ করে থাকেন। গবেষণাধীন গ্রামীণ এলিটদের মধ্যে মোট কতোজন ঊর্ধ্বতন (স্থানীয়-কেন্দ্রীয়) রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে এ ধরনের যোগাযোগ রক্ষা করেন তা সারণি ১.৫-তে তুলে ধরা হবে।

সারণি-১.৫ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগের ভিত্তিতে স্থানীয় গ্রামীণ এলিট

গ্রামীণ এলিটদের মতামত	এলিটদের সংখ্যা	শতকরা হার
রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেন	১৪১ জন	৭০.৫%
রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেন না	৩৯ জন	১৯.৫%
মতামত প্রদানে বিরত	২০ জন	১০.০%
মোট	২০০ জন	১০০%

সূত্র: মাঠ জরিপ

প্রদত্ত সারণিতে (১.৫) লক্ষ্য করা যায়, উত্তরদাতা স্থানীয় গ্রামীণ এলিটদের মধ্যে মোট ১৪১ জন (৭০.৫%) গ্রামীণ এলিট রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন। এ শ্রেণীর গ্রামীণ এলিটেরা সকলেই রাজনৈতিকভাবে সচেতন এবং রাজনৈতিক যে কোনো বিষয়ে তাদের উৎসাহের মাত্রা প্রবল। ফলে নিজেদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে তারা নিয়মিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দের চেয়ে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে গ্রামীণ এলিটেরা অধিকতর যোগাযোগ করে থাকেন। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বলতে এখানে উপজেলা, জেলা পর্যায়ের এবং স্থানীয় সংসদ সদস্যের সাথে যোগাযোগের কথা বলা হচ্ছে। উপজেলা নেতৃবৃন্দই যোগাযোগের মূল টার্গেট। কারণ তারাই স্থানীয় উন্নয়ন কর্মসূচির মূল এজেন্ট হিসেবে কাজ করেন। তবে এদের মধ্যে কয়েক জন একই সাথে জেলা পর্যায়ের শীর্ষ নেতৃত্ব হওয়ায় উন্নয়ন কর্মসূচিতে তাদের ব্যাপক মাত্রায় ভূমিকা লক্ষ্য করা গিয়েছে। তবে স্থানীয় সংসদ সদস্যকে কেন্দ্র করেই বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। ফলে তার সাথে বিশেষ সখ্যতা গড়ে তুলতে গবেষণাধীন এলিটদের মধ্যে (ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক অনুসারীদের মধ্যে) তীব্র প্রতিযোগিতার প্রচ্ছন্নভাব লক্ষ্য করা গেছে। প্রযুক্তির কল্যাণে (যেমন, মোবাইল ফোন) এ ধরনের রাজনৈতিক যোগাযোগ বেশ সহজসাধ্য হয়েছে। মোবাইল ফোনের সুবাদে এ সকল রাজনৈতিক নেতার সাথে প্রয়োজনে অথবা সৌজন্যমূলকভাবে স্থানীয় গ্রামীণ এলিটদের নিয়মিত যোগযোগ হয়ে থাকে। ফলে উভয়ের মধ্যে বিশেষ সখ্যতা গড়ে ওঠায় স্থানীয় গ্রামীণ এলিটেরা যেমন আর্থ-সামাজিক এবং

রাজনৈতিকভাবে লাভবান হয়ে থাকেন, তেমনি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও স্থানীয় এলাকার গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষার খবরা-খবর সংগ্রহ করতে পারেন। এতে ঐ এলাকার বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে তারা মনোযোগী হতে পারেন। এ শ্রেণীর গ্রামীণ এলিটেরা অপেক্ষাকৃত কম বয়সী হওয়ায় এবং স্থানীয় এলাকার উন্নয়ন প্রচেষ্টায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ায় তাদের কাছে এ ধরনের সম্পর্কের গুরুত্ব অনেক। এ ক্ষেত্রে মোট ৩৯ জন (১৯.৫%) গ্রামীণ এলিট রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে কোনোরূপ যোগাযোগ রক্ষা করেন না বলে জানিয়েছেন। এ শ্রেণীর গ্রামীণ এলিটেরা অপেক্ষাকৃত বেশি বয়সী এবং রাজনৈতিক বিষয়ে তারা খুব বেশি সচেতন নন এবং তারা ঐতিহ্যগত স্থানীয় গ্রামীণ এলিট শ্রেণীর হওয়ায় নিজের এলাকায় প্রভাবশালী হয়ে উঠতে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতাকে তারা জরুরি মনে করেন না। যদিও অনানুষ্ঠানিক আলাপে জানা যায়, এসব গ্রামীণ এলিট নিজেদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনে (যেমন থানা-পুলিশ, মামলা, জ্ঞাতিগোষ্ঠীর চাকুরী) রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করেন। অবশিষ্ট ২০ জন (১০%) স্থানীয় গ্রামীণ এলিট এ ধরনের রাজনৈতিক যোগাযোগকে চিহ্নিত করতে পারেননি। এ শ্রেণীর গ্রামীণ এলিটেরা অনানুষ্ঠানিক আলাপচারিতায় স্বীকার করেন রাজনৈতিক নেতাদের অনেকের সাথেই তাদের ভালো জানাশোনা রয়েছে। স্থানীয় গ্রামীণ এলিট এবং স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থানীয় এলাকার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাদের সমন্বিত প্রচেষ্টার ফলে উন্নয়ন কর্মসূচিতে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা হ্রাস পায়। তবে এ ধরনের যোগাযোগের উদ্দেশ্যের বৈপরীত্ব ক্ষেত্র বিশেষে উন্নয়ন প্রচেষ্টায় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই জানা প্রয়োজন গ্রামীণ এলিটদের এ ধরনের যোগাযোগের উদ্দেশ্য কী?

স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে গ্রামীণ এলিটদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। এ ধরনের যোগাযোগের মাত্রা যতো বেশি গভীরে পৌঁছুবে গণতান্ত্রিক নীতিমালার বিকাশ ততো বেশি বেগবান হয়ে ওঠবে বলে দাবি করা হয়। এ ধরনের যোগাযোগের ক্ষেত্রে গ্রামীণ এলিটদের আগ্রহী মনোভাব থাকলেও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি বিশেষ আগ্রহ এবং আত্মস্বার্থকেন্দ্রিক মানসিকতা এ ধরনের যোগাযোগে ক্ষমতার প্রতি গ্রামীণ এলিটদের তীব্র আকাঙ্ক্ষার ইঙ্গিত দেয় এবং স্বার্থ উদ্ধারে বেপরোয়া মনোভাব এ ধরনের যোগাযোগে দুর্নীতির বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেয় বলে প্রতীয়মান হয়। তা ছাড়া, সমাজঘনিষ্ঠ যোগাযোগে রাজনৈতিক নেতাদের নির্লিপ্ত মনোভাব এবং দলীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে ইস্যু বিশ্লেষণে এ ধরনের যোগাযোগ ক্ষমতাসীন অনুসারীদের স্বার্থ উদ্ধারের অপকৌশলে পরিণত হয়ে থাকে। তাই বলা যায়, রাজনৈতিক যোগাযোগ সংশ্লিষ্টতা গ্রামীণ এলিটদের নেতৃত্ব, ক্ষমতা এবং প্রভাবের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। রাজনীতির বিকাশে কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যায়ে দলীয় সংগঠনের বিস্তৃতি জরুরি। রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের সংগঠনের প্রয়োজনে তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠনের বিস্তৃতি ঘটাতে চায়। তৃণমূল রাজনৈতিক সংগঠনের ভিত্তি শক্তিশালী করতে স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। স্থানীয় নেতৃত দলীয় সংগঠনে স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারে। স্থানীয় নেতৃত্ব হিসেবে গ্রামীণ এলিটদের স্বীকৃতি পূর্বতন কাল থেকেই চলে আসছে। ফলে গ্রামীণ এলিটেরা যেমন স্থানীয় এলাকায় প্রভাবশালী হয়ে উঠতে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা সৃষ্টি করেন, তেমনি রাজনৈতিক দলগুলোও স্থানীয় পর্যায়ে শক্ত অবস্থান তৈরী করতে স্বীয় সংগঠনে গ্রামীণ এলিটদের অংশগ্রহণ বাড়াতে তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ

যোগাযোগে আগ্রহ দেখায়। আর স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ (উপজেলা-জেলা পর্যায়ের নেতা এবং স্থানীয় সংসদ সদস্য) রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে গ্রামীণ এলিটদের এমন যোগাযোগের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করেন। এতে রাজনৈতিক দলগুলো যেমন তৃণমূল পর্যায়ে তাদের সাংগঠনিক ভিত্তি শক্তিশালী করতে পারে, তেমনি স্থানীয় উন্নয়ন সমস্যার প্রতি মনোযোগী হতে পারে। অন্যদিকে, গ্রামীণ এলিটেরা রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে প্রভাব প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি স্থানীয় উন্নয়নে যথার্থ ভূমিকা রাখতে পারেন। তাই এ ধরনের রাজনৈতিক যোগাযোগের ব্যাপক তাৎপর্য রয়েছে।

উপসংহার

গ্রামীণ এলিটদের তৃণমূল পর্যায়ের উন্নয়নে ধ্রপদী ভূমিকার ধারাবাহিকতার আধুনিক সমন্বয় হলো তৃণমূল রাজনীতিতে তাদের ভূমিকা। তাই গ্রামীণ এলিটদের এ সংক্রান্ত ভূমিকার কার্যকারিতা আজ সর্বজনবিদিত। গ্রামীণ বিপুল জনগোষ্ঠীকে রাজনৈতিক সচেতন করার প্রক্রিয়ায়, রাজনৈতিক অধিকার সচেতন করতে সর্বোপরি গ্রামাঞ্চালে জাতীয় রাজনীতিকে সামাজিক চরিত্র প্রদানে তাদের নিরলস ভূমিকা আমাদের জাতীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিনির্মাণে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। গ্রামীণ এলিটদের এ ধরনের ভূমিকা একেবারেই যে বাধাহীন এবং নিরুদ্বিগ্ন তা নয়, বরং প্রচ্ছন্ন অথবা স্পষ্ট দলাদলি, কোন্দল অথবা প্রতিযোগিতা সর্বত্র বিদ্যমান। এ ধরনের নানা বাধা-বিপত্তিকে পাশকাটিয়ে রাজনীতিকে তৃণমূল পর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে এবং গণমানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা তাই সমাজ গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। সঠিক পরিচর্যা এবং পৃষ্ঠপোষকতা পেলে তৃণমূল পর্যায়ের নেতৃত্বের এই কাঠামোটি আরো সঠিকভাবে গড়ে উঠতে পারে এবং আরো বেশি কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, সপ্তদশ সংখ্যা ১৪১৬

নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করতে নারীর গর্ভকালীন সময়ে পুরুষের সচেতনতা : একটি গ্রামকেন্দ্রিক সমীক্ষা

মো. ছাদেকুল আরেফিন*

Abstract : Awareness of pregnancy period to ensure safe motherhood is an important issue the in context of rural Bangladesh. Although government and non-government agencies are implementing many programmes including population control and reproductive health, in present socio-economic condition ensuring safe motherhood is being constrained. Illiteracy, limited opportunity to avail health services, gender inequality, and lack of sufficient awareness are the major factors. Awareness is strongly positively related to ensuring safe motherhood. In this article the author tried to explore the views on ensuring safe motherhood.

ভূমিকা

বর্তমানে বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশসমূহে নিরাপদ মাতৃত্ব ও মাতৃস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। যদিও সত্তরের দশকের শেষের দিকে নিরাপদ মাতৃত্ব বিষয়ে বিশেষভাবে উদ্যোগ নেওয়া হয়; তথাপি ১৯৯৪ সালে কায়রোতে আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা উন্নয়ন বিষয়ক সম্মেলনের পর থেকে বাংলাদেশে এ বিষয়ে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে নানা কর্মসূচি নেওয়া হয়। মূলত বাংলাদেশে জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে নিরাপদ মাতৃত্ব বিষয়ক কর্মসূচির উপর জোর দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি, মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়ন, প্রজননস্বাস্থ্য, কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য, শিশু স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন ধরণের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগেও নানা কর্মসূচি নেওয়া হয়। তবে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এতসব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এখনো বাংলাদেশে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সফলতা আসেনি এবং বাংলাদেশে এখনো নিরাপদ মাতৃত্বের বিষয়টি আশানুরূপভাবে নিশ্চিত

* ড. মো. ছাদেকুল আরেফিন, সহযোগী অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

হয়নি। এই নিরাপদ মাতৃত্বের বিষয়টি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আশানুরূপ সফলতা অর্জন না হওয়ার অনেকগুলো কারণ রয়েছে উন্নয়নশীল বিশ্বের মতো বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে মাতৃস্বাস্থ্য সেবা বহু সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতি দ্বারা প্রভাবিত। নারীর সার্বিক সামাজিক অধস্তনতা তার স্বাস্থ্যগত প্রয়োজনসমূহকে অগ্রাধিকার না নেওয়াকে উৎসাহিত করে।[১] বিশেষকরে বাংলাদেশের সামাজিক বৈশিষ্ট্যের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো এক্ষেত্রে বিবেচনাযোগ্য। যেমন অশিক্ষা, কুসংস্কার, স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টির অভাব, সচেতনতার অভাব এবং জেন্ডার বৈষম্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করণের বাধা হিসেবে। উল্লিখিত বিষয়গুলোর নাজুক অবস্থা একদিকে যেমন নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করার কর্মসূচিকে সফল করার ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্থ করছে অন্যদিকে সামগ্রিক সামাজিক অবস্থায় জেন্ডার বৈষম্যের বিষয়টি ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তন আনয়নে বিশেষভাবে বাধা হয়ে দাড়িয়েছে। আর এই জেন্ডার বৈষম্যের ক্ষেত্রে পুরুষদের অবস্থান, ভূমিকা ও অংশগ্রহণের বিষয়টি অনস্বীকার্য। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে জেন্ডার বৈষম্যে পুরুষদের উপস্থিতি প্রকট। বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তি পর্যায়ে, পরিবার পার্যায়ে তথা সামাজিক বিভিন্ন পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পুরুষ প্রাধান্য জেন্ডার বৈষম্যকে সুস্পষ্ট করে তুলেছে। ফলে নিরাপদ মাতৃত্বসহ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন তথা সফলতা বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। সুতরাং একথা স্পষ্ট করে বলা যায় নিরাপদ মাতৃত্বসহ সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি সফল বাস্তবায়নে পুরুষদের ভূমিকা ও অংশগ্রহণ-এর বিষয়টি নানা দিক থেকে বিশ্লেষণ ও গ্রহণ করতে হবে। আর এ প্রেক্ষাপটেই আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলাদেশে গ্রামাঞ্চলে পুরুষদের নিরাপদ মাতৃত্ব বিষয়ে সচেতনতা সূচক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সমীক্ষার অবতারণা করা হয়েছে।

বাংলাদেশে নিরাপদ মাতৃত্ব অবস্থা ও পুরুষ সচেতনতা

বর্তমানে এদেশে নিরাপদ মাতৃত্ব অবস্থা একদিকে যেমন উদ্বেগজনক অন্যদিকে নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করতে পুরুষদের সচেতনতা তথা যথাযথ সহযোগিতার বিষয়টিও গুরুত্ববহ। নিরাপদ মাতৃত্ব অবস্থা নিশ্চিতকরণ বলতে একজন মহিলা গর্ভপূর্ব, গর্ভকালীন এবং প্রসব পরবর্তী অবস্থায় নিরাপদ স্বাস্থ্যের বিষয়টি নিশ্চিতকরণ বুঝায়। প্রাসঙ্গিকভাবে বাংরাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে প্রতি এক লক্ষ জীবিত শিশু জন্মের ক্ষেত্রে মাতৃ মৃত্যু হয় ৩২০ জন। সেই সাথে গর্ভ সংক্রান্ত জটিলতায় ২০ শতাংশ মহিলার মৃত্যুর কারণ হিসেবে দেখা যায়।[২] এই উদ্বেগজনক মাতৃমৃত্যু শুধুমাত্র গর্ভ সংক্রান্ত জটিলতা ছাড়াও প্রকটভাবে সামাজিক কারণসহ অন্যান্য কারণ বিরাজমান। সামাজিক কারণগুলোর মধ্যে প্রকটভাবে অনুপুস্থিত হলো যথাযথ মাতৃস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সচেতনতার অভাব। এছাড়া অন্যান্য কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে মহিলার অল্প বয়সে বিবাহ, একাধিক সন্তান ধারণ, সীমিত স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি, সঠিক সময়ে স্বাস্থ্যসেবা নিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভাব, মাতৃস্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাব ইত্যাদি। আর গ্রামাঞ্চলে এই অবস্থা আরো

---

[১] নেহরাজ, "গ্রামীণ বাংলাদেশে মাতৃস্বাস্থ্য সেবায় সামাজিক সংস্কারের প্রভাব: একটি নৃবৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান", *বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা*, ত্রয়োবিংশতিতম খণ্ড, ১৪১২, ঢাকা: বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, পৃ. ৩৩।

[২] Bangladesh Maternal Health Services and Maternal Mortality Survey 2001, NIPORT.

প্রকট। ২০০৩ সালের তথ্যে দেখা যায় গ্রামাঞ্চলে মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৪ জন অপরদিকে শহরাঞ্চলে ২.৭ জন এবং জাতীয়ভাবে ৩.৮ জন।[৩] অন্যান্য কারণগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক ও মানসিক কারণগুলোও বিশেষভাবে উল্লেখ্য। সীমিত আয় ও নিম্ন জীবনধারার মান যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে বিমুখ করে তুলেছে। এছাড়া জেন্ডার বৈষম্য এবং পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব সঠিক সময়ে স্বাস্থ্যসেবা নিতে বাধার সৃষ্টি করছে। এক্ষেত্রে মহিলাদের পুরুষ অধস্তনতা এবং সমাজে পুরুষ প্রাধান্যর বিষয়টিও মাতৃস্বাস্থ্যসেবায় অগ্রাধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে গুরুত্ব বহনে বিপরীত দিক নির্দেশ করে। উল্লিখিত সামাজিক অর্থনৈতিক এবং মানসিক কারণগুলো বাংলাদেশের মহিলাদের শারীরীক, মানসিক স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণেই শুধু বাধা নয়, সামগ্রিকভাবে মহিলাদের নিম্ন অবস্থানগত সুযোগ বঞ্চিত প্রেক্ষিতও বিবেচ্য। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন যদিও আইন অনুযায়ী মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স ১৮ বছর, কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে ১৫-১৯ বছরের কিশোরীদের শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশি বিবাহিতা। কিশোরীদের মধ্যে সন্তান ধারণের হার প্রতি হাজারে ১৩৫ জন এবং ৬০% কিশোরী তাদের বয়স ১৯ হওয়ার আগেই প্রথম সন্তান জন্ম দিচ্ছে। ১৬ বছর বয়সী কিশোরীদের মধ্যে কমপক্ষে ১৭% এক সন্তানের জননী এবং এ বয়সের কিশোরীদের ৬.২% বর্তমানে গর্ভবতী। ১৫-১৯ বছর বয়সে প্রতি ১০০০ জনে ১১৭টি শিশু জন্ম দেয়।[৪] প্রাসঙ্গিকভাবে বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেলথ সার্ভে ২০০৪-এর তথ্য অনুযায়ী ৪৯ শতাংশ মহিলা গর্ভাবস্থায় স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করে এর মধ্যে ৩১ শতাংশ চিকিৎসকের কাছে এবং ১৭ শতাংশ নার্স বা প্যারামেডিক-এর কাছে অন্যদিকে ৪৪ শতাংশ মহিলা গর্ভাবস্থায় কোনো প্রকার স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করে না। পাশাপাশি দেখা যায় ৯০ শতাংশ গর্ভবতী মহিলার প্রসব হয় বাড়িতে, অপরদিকে মাত্র ৯ শতাংশ মহিলা হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রসব হয়। সেই সাথে আরোও একটি বিষয় বিশেষভাবে উদ্বেগজনক তা হলো ৮০ শতাংশের বেশি মহিলা প্রসবোত্তর কোনো সেবা গ্রহণ করে না। কিন্তু নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করতে সরকারি ও বেসরকারিভাবে যে বিষয়গুলোর উপর জোর নেওয়ার কথা বলা হয়েছে তা হলো: গর্ভকালীন পরিচর্যা, জরুরি প্রসূতিসেবা, নিরাপদ প্রসবের ব্যবস্থা এবং প্রসবোত্তর যত্ন নেওয়ার বিষয়টি। প্রসঙ্গত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করতে চার স্তম্ভ-এর কথা বলেছে যথা: পরিবার পরিকল্পনা, গর্ভকালীন পরিচর্যা, নিরাপদ প্রসব, জরুরি প্রসূতিসেবা।

সুতরাং উল্লিখিত বিষয়ের প্রতিটি পদক্ষেপেই কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের সাথে উদ্যোগমুখী সচেতনতার দিকটি বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। সঙ্গত কারণেই এই বিষয়ের সাথে পুরুষদের সম্পৃক্ততা বিশেষভাবে বিবেচ্য। পরিবার গঠন, নিরাপদ মাতৃত্ব তথা যথাযথ পরিবার পরিচালনার ক্ষেত্রে সমাজে নারী ও পুরুষ উভয়ের ভূমিকা মূখ্য এটা যেমন বাস্তব তেমন বাংলাদেশের প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে শুরু করে সকল ক্ষেত্রে পুরুষ প্রাধান্য বিষয়টিও অনস্বীকার্য। আর এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করতে পুরুষদের সচেতনতা বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে গ্রাম প্রধান এই বাংলাদেশে গ্রামীণ পুরুষদের উদ্যোগমুখী সচেতনতা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়।

---

[৩] *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা*, ২০০৬, পৃ. ১৫৯।

[৪] আলতাফ হোসেন (সম্পা), *স্বাস্থ্য ও অধিকার*, ভলিউম-১, ইস্যু ২, এপ্রিল-জুন ২০০৮।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবার প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ প্রতিষ্ঠার বিষয়টি অত্যন্ত নাজুক। যেমন দেশের সরকারি/বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতা সেইসাথে দেশের জনসংখ্যা ও ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিকস্-এর অনুপাতও লক্ষণীয়। এক কথায় স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে প্রাতিষ্ঠানিক সেবা এবং প্রশিক্ষিত ডাক্তার, নার্স ও প্যারামেডিকস্-এর সেবার সুযোগ প্রাপ্তি অত্যন্ত সীমিত। এক্ষেত্রে দেখা যায় বাংলাদেশে ৩৫৩২ জন জনসাধারণের জন্য ১ জন ডাক্তার রয়েছে।[৫] ইউনিসেফ প্রদত্ত ২০০২ সালের তথ্য মতে, বাংলাদেশের সকল টিচিং হাসপাতাল, ৬০ শতাংশ জেলা হাসপাতাল, ২৭ শতাংশ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ১৩১টি মাতৃ ও শিশু মঙ্গল কেন্দ্রতে সার্বিক জরুরি প্রসূতি সেবার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু এই ব্যবস্থা দেশের ন্যূনতম সার্বিক জরুরি প্রসূতি সেবার চাহিদা মাত্র ২৭ শতাংশ ও ন্যূনতম প্রাথমিক জরুরি প্রসূতি সেবার চাহিদার মাত্র ১৫.৫ শতাংশ পূরণ করে।[৬] একদিকে সীমিত সুযোগ অন্যদিকে সচেতনতার অভাব দুটি বিষয়ই যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তিতে নাজুক অবস্থার সৃষ্টি করেছে। আর সঙ্গত কারণেই মহিলাদের নিরাপদ মাতৃত্বের বিষয়টি আরো স্পর্শকাতর পর্যায়ে রয়েছে। যদিও জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য ৪ ও ৫-এ ২০১৫ সালের মধ্যে শিশুমৃত্যু দুই-তৃতীয়াংশ এবং মাতৃমৃত্যু তিন চতুর্থাংশ কমিয়ে আনার কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশে সরকারি পর্যায়ে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেবার কার্যক্রমে ২০১০ সালের মধ্যে মাতৃ মৃত্যুর হার ২.৪ এ নামিয়ে আনার লক্ষ্যে জরুরি প্রসূতি সেবা সুবিধা সম্প্রসারণ প্রায় ৫০ শতাংশ প্রসব কমিউনিটি বেজড স্কিলড বার্থ এটেনডেন্ট দ্বারা সম্পন্ন করা সহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তথাপি এদেশের মাতৃমৃত্যুর সংখ্যা এখন পর্যন্ত উদ্বেগজনক।

আর এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতি নিরসনে একজন পুরুষ একদিকে পিতা, স্বামী পরিবারের অভিভাবক অন্যদিকে স্থানীয় নেতা, উদ্যোগী ব্যক্তিত্ব তথা সমাজ উন্নয়ন কর্মী হিসেবে কার্যকরী ভূমিকা পালনে উপস্থিতি অনস্বীকার্য। এক্ষেত্রে একজন নারীর গর্ভপূর্বাবস্থা, গর্ভকালীন পরিচর্যা, জরুরি প্রসূতিসেবা, নিরাপদ প্রসবের ব্যবস্থা এবং প্রসবোত্তর সেবাসহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই পুরুষের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্ববহ। আর এজন্য প্রয়োজন যথাযথ জ্ঞান ও সচেতনতা। প্রসঙ্গতঃ উল্লিখিত চারটি বিষয়ে পুরুষদের সচেতনতা নিরাপদ মাতৃত্বের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকরী। কেননা মহিলার গর্ভপূর্ব অবস্থা থেকে প্রসবোত্তর সেবার পর্যায় পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষদের সম্পৃক্ততার বিষয়টি নিঃসন্দেহে এদেশে ব্যাপক মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস করার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে বিবেচ্য। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পুরুষ সচেতনতা একদিকে অনাকাংখিত গর্ভধারণরোধ থেকে শুরু করে যৌনবাহিত সংক্রমণ রোগ প্রতিরোধ, শিশুমৃত্যু ও মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস, জেন্ডারভিত্তিক নির্যাতন প্রতিরোধ করা, প্রজনন স্বাস্থ্য ও কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি, যথাযথ পরিবার পরিকল্পনা এমনকি বাল্যবিবাহরোধ সহ নানা সামাজিক ব্যবস্থা নিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখে। অন্যদিকে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক অবস্থার সৃষ্টি হবে বলে আশা করা যায়। আর এই প্রেক্ষাপটে আলোচ্য গবেষণা সমীক্ষায় ব্যবহৃত প্রত্যয় নিরাপদ মাতৃত্ব বলতে একজন বিবাহিত মহিলার গর্ভকালীন পরিচর্যা, জরুরি প্রসূতি সেবা,

---

[৫] *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা*, ২০০৬, পৃ. ১৫৯।

[6] Women's Rights to Life and Health. Annual Report 2002. GOB. UNICEF and AMDD উদ্ধৃতি, নেহরাজ, পৃ. ৬২।

নিরাপদ প্রসবের ব্যবস্থা ও প্রসবোত্তর সেবা নিশ্চিতকরণ এবং পুরুষদের সচেতনতা বলতে একজন পুরুষ নারীর গর্ভকালীন পরিচর্যা, প্রসূতি সেবা, নিরাপদ প্রসব এবং প্রসবোত্তর সেবা সম্পর্কে জ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট কাজে সহযোগিতা করার মানসিকতা ও উদ্যোগকে বোঝানো হয়েছে। সর্বোপরি আলোচ্য গবেষণা সমীক্ষার উদ্দেশ্য প্রধানত নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নারীর গর্ভকালীন সময়ে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বসবাসরত বিবাহিত পুরুষদের জ্ঞান, ধারণাসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সচেতনতা নির্ণয় ও পর্যালোচনা করা।

গবেষণার যৌক্তিকতা

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০০৭-এর প্রতিপাদ্য করা হয়েছিলো "Man as Partners in Maternal Health" বাংলায় যার ভাষান্তর করা হয়েছে "পুরুষের অংশগ্রহণ মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন"। এই প্রতিপাদ্যের আলোকে বাংলাদেশের মাতৃমৃত্যুর হার বিবেচনা করলে দেখা যায় আলোচ্য সমীক্ষাটি বর্তমান সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাসসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অংশগ্রহণ একদিকে যেমন কার্যকরী অবদান রাখবে অন্যদিকে সামগ্রিক অর্থে বাংলাদেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি, স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করলে অগ্রগতির ধারা অব্যাহত থাকবে। প্রসঙ্গত এদেশের মাতৃমৃত্যু, শিশুমৃত্যুসহ সামগ্রিক স্বাস্থ্য অবস্থার তথ্য বিবেচনায় দেখা যায় উন্নত দেশগুলো তো বটেই সার্কভূক্ত দেশের মধ্যে কিছু দেশের তুলনায় অত্যন্ত নাজুক অবস্থা বিরাজ করছে। সুতরাং উল্লিখিত প্রেক্ষাপট সেইসঙ্গে বাংলাদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক অবস্থা বিবেচনায় নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করতে নারীর গর্ভকালীন সময়ে পুরুষ সচেতনতা বিষয়ে আলোচ্য গবেষণা সমীক্ষা যৌক্তিক বলে বিবেচনা করা যায়।

তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া

আলোচ্য গবেষণা সমীক্ষাটি মূলত উদ্দেশ্যভিত্তিক অনুসন্ধানমূলক সমীক্ষা। এক্ষেত্রে নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নারীর গর্ভকালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ে পুরুষের জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি উদ্যোগ, সিদ্ধান্ত গ্রহণসহ সচেতনতার বিভিন্ন দিক অনুসন্ধান করার নিমিত্তে গবেষণাকর্মটি পরিচালনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্যমূলকভাবে একটি গ্রাম এবং বিবাহিত পুরুষদের নির্বাচন করে তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

রাজশাহী জেলার পবা উপজেলার হরিয়ান ইউনিয়ন পরিষদের অন্তর্গত হাজরাপুকুর গ্রামটি তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, গ্রামটি রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন-এর পশ্চিমে অবস্থিত এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো। শিক্ষার হার গড় মানের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেও বাংলাদেশের অন্যান্য গ্রামগুলোর সমমানের।

এক্ষেত্রে অদৈবচয়িত উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে হাজরা পুকুর গ্রাম থেকে শুধুমাত্র বিবাহিত পুরুষদের মধ্য থেকে মোট ৮০ জন বিবাহিত পুরুষকে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্রের সাহায্যে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া পারিপার্শ্বিক পর্যবেক্ষণ, পারস্পরিক আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা

আলোচ্য গবেষণা সমীক্ষায় বিবাহিত পুরুষদের থেকে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা পর্যায়ক্রমিকভাবে নিম্নে উপস্থান করা হলো:

জনমিতিক তথ্য

এক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের নিকট থেকে জনমিতিক বৈশিষ্ট্যের নির্ধারিত কিছু তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। যেমন **বয়সঃ** উত্তরদাতা বিবাহিত পুরুষদের বয়সের তথ্যে দেখা যায় ২০ থেকে ২৫ বৎসরের ২২.৫০%, ২৫ থেকে ৩০ বৎসরের ২২.৫০%, ৩০ থেকে ৩৫ বৎসরের ২১.২৫%, ৩৫ থেকে ৪০ বৎসরের ১৩.৭৫%, ৪০ থেকে ৪৫ বৎসরের ৫% এবং ৪৫ বৎসরের উর্দ্ধে ১৫% রয়েছে। এখানে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় যে, উত্তরদাতাদের একটা বড় অংশ ২২.৫০% কম বয়সে বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। যা বয়স এবং মানসিক পরিপূর্ণতার ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব নির্দেশ করে। **বিবাহকালীন সময়ঃ** এই তথ্যে দেখা যায় ১৫ থেকে ২০ বৎসর যাবৎ বিবাহিত ৫১.২৫% আর ২০ তেকে ২৫ বৎসর যাবৎ বিবাহিত ৩৫% এবং ২৫ থেকে ৩০ বৎসর যাবৎ বিবাহিত জীবন যাপন করছে ১২.৫০% পুরুষ। প্রসঙ্গতঃ বিবাহকালীন সময় এর তথ্যে ৫১.২৫% পুরুষ জীবনের উল্লেখযোগ্য সময় বিবাহিত জীবন যাপন করছে যা আলোচ্য সমীক্ষায় গুরুত্ব নির্দেশ করে। **পরিবারের সদস্য সংখ্যাঃ** এই তথ্যে দেখা যায় উত্তরদাতাদের পরিবারের মোট পুত্র ও কন্যা শতকরা হার পুত্র ৫১.৪% এবং কন্যা ৪৮.৯৬%। এছাড়া **পরিবারের ধরনঃ** এর তথ্যে দেখা যায় একক পরিবার ৮৩.৭৫% এবং যৌথ পরিবার ১৬.২৫%। উল্লিখিত পরিবারের ধরন সম্পর্কীত তথ্য ও একটি বিশেষ দিক নির্দেশ করে তা হলো গ্রামাঞ্চলে একক পরিবারের আধিক্য লক্ষনীয়। সুতরাং উত্তরদাতা পুরুষ ও তার পরিবারের জনমিতিক তথ্য পর্যালোচনা করলে একথা বলা যায় উত্তরদাতাদের বয়স, বিবাহিত সময়কাল এবং পরিবারের ধরন প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের অন্যান্য গ্রামাঞ্চলে মত গড় মানের বলে প্রতীয়মান হয়। তবে উল্লিখিত তথ্য পুরুষ সচেতনতা বিষয়ে যথার্থতা যাচাই করতে কার্যকরীভাবে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

সামাজিক তথ্য

আলোচ্য গবেষণা বিষয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে উত্তরদাতাদের নিকট থেকে সুনির্দিষ্ট কিছু সামাজিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা তথ্যে দেখা যায় নিরক্ষর ১২.৫০%, স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন ২৫%, প্রাথমিক শিক্ষাগত যোগ্যতা ৩৭.৭৫% এবং মাধ্যমিক শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন ২৩.৭৫%। পাশাপাশি উত্তরদাতদের **পেশা** সংক্রান্ত তথ্যে দেখা যায় কৃষি ৩৭.৫০%, চাকুরী ১৩.৭৫% ব্যবসা ২১.২৫%, দিনমজুর ২৩.৭৫% এবং অন্যান্য ৩.৭৫%। প্রসঙ্গতঃ উত্তরদাতাদের **স্ত্রীর পেশা** সংক্রান্ত তথ্যে দেখা যায়, সকলেই গৃহিনী অর্থাৎ ১০০% স্ত্রীই অন্য কোনো পেশার সাথে জড়িত নয়। সুতরাং উল্লিখিত তথ্যের আলোকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের শিক্ষা এবং পেশা উল্লেখযোগ্য কোনো দিক নির্দেশ করে না তবে আলোচ্য গবেষণা উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে সচেতনতা সূচক নির্ণয়ে গুরুত্ববহ।

নারীর গর্ভকালীন সময়ে পুরুষদের সচেতনতা সম্পর্কিত তথ্য

এক্ষেত্রে উত্তরদাতা পুরুষের সচেতনতা এবং মনোভাব অনুসন্ধানে সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের উপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়। যা নিম্নে সারণির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ১ : স্ত্রী গর্ভবতী হওয়ার কতদিন পর জানতে পেরেছে

সময়কাল	গণসংখ্যা	শতকরা হার (%)
১ মাস	৩২	৪০.০০
২ মাস	৪১	৫১.২৫
৩ মাস	০৭	৮.৭৫
মোট	৮০	১০০

আলোচ্য সারণি ১-এর তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, স্ত্রী গর্ভবতী হওয়ার ২ মাস পর জানতে পেরেছে এরকম আছে ৫১.২৫% আর ১ মাস পর জানতে পেরেছে এরকম আছে ৪০% এবং ৩ মাস পর জানতে পেরেছে ৮.৭৫% উত্তরদাতা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে স্ত্রী গর্ভবতী হওয়ার ২ মাসের মধ্যেই অবগত হয়েছে অর্ধেকের বেশি উত্তরদাতা। বিষয়টি স্বামী হিসেবে গর্ভবতী স্ত্রীর প্রতি করণীয় ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। কেননা একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, গর্ভকালীন সময়ে স্ত্রীর মানসিক ও শারীরিকসহ সকল ক্ষেত্রে স্বামীর সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাসঙ্গিকভাবে উত্তরদাতাদের নিকট থেকে জানতে চাওয়া হয়েছিল যে স্ত্রী গর্ভবতী হওয়া বা সন্তান নেওয়া পরিকল্পিত কিনা- যা নিম্নে সারণির মাধ্যমে তুলে ধরা হলো।

সারণি ২ : স্ত্রী গর্ভবতী হওয়া বা সন্তান নেওয়া পরিকল্পিত কিনা

পরিকল্পিত কিনা	গণসংখ্যা	শতকরা হার (%)
পরিকল্পিত	৫০	৬২.৫০
পরিকল্পিত নয়	৩০	৩৭.৫০
মোট	৮০	১০০

প্রাপ্ত তথ্যের সারণিতে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের অধিকাংশ অর্থাৎ ৬২.৫০% বলেছে তারা পরিকল্পিতভাবে এটা করেছে। অপরদিকে ৩৭.৫০% বলেছে এক্ষেত্রে তাদের কোনো পরিকল্পনা ছিল না। সুতরাং বিষয়টি লক্ষণীয়। এতদসঙ্গে সচেতনতার প্রাসঙ্গিকতায় স্ত্রী গর্ভকালীন সময়ে স্বামীর সহযোগিতার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

সারণি ৩ : স্ত্রী গর্ভবতী হওয়ার পর বাড়িতে অন্যান্য কাজে স্ত্রীকে সহযোগিতা করে কিনা

ধরন	গণসংখ্যা	শতকরা হার (%)
সহযোগিতা করে	৬৬	৮২.৫০
সহযোগিতা করে না	১৪	১৭.৫০
মোট	৮০	১০০

উল্লিখিত সারণিতে দেখা যাচ্ছে উত্তরদাতাদের ৮২.৫০% বলেছেন তারা বাড়ীর কাজে সাহায্য করে স্ত্রীকে। অপরদিকে ১৭.৫০% উত্তরদাতা বলেছেন সাহায্য করে না। সুতরাং এক্ষেত্রে সচেতনতার একটি দিক লক্ষণীয়। পাশাপাশি আর একটি তথ্যে ব্যতিক্রমী দিক নির্দেশ করে, যা পরবর্তী সারণিতে উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ৪ : গর্ভকালীন সময়ে স্ত্রীকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে নিজের প্রয়োজনে কাজে পাঠায় কিনা

কাজে পাঠায় কিনা	গণসংখ্যা	শতকরা হার (%)
কাজে পাঠায়	৫৬	৭০.০০
কাজে পাঠায় না	২৪	৩০.০০
মোট	৮০	১০০

সারণি ৪ থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় উত্তরদাতাদের মধ্যে ৭০% নিজের প্রয়োজনে স্ত্রীকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে কাজ করায়। অন্যদিকে ৩০% উত্তরদাতা বলেছেন গর্ভকালীন সময়ে স্ত্রী ঘুমিয়ে থাকলে নিজের প্রয়োজন হলেও ডাকে না। সুতরাং উল্লিখিত সারণি নং-৩ এবং সারণি নং-৪ এর তথ্যের পর্যালোচনায় উত্তরদাতাদের সাধারণ সচেতনতার বৈপরিত্য লক্ষনীয়। প্রাসঙ্গিকভাবে আরোও কিছু তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ৫ : গর্ভকালীন সময়ে স্ত্রী সঙ্গে সহবাস বা সঙ্গম করে কিনা

সহবাস/সঙ্গম করে কিনা	গণসংখ্যা	শতকরা হার (%)
সহবাস করে	৭৭	৯৬.২৫
সহবাস করে না	০৩	৩.৭৫
মোট	৮০	১০০

উল্লিখিত সারণির তথ্যে দেখা যায়, উত্তরদাতাদের প্রায় সকলেই ৯৬.২৫% বলেছেন তারা গর্ভাবস্থায় স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস বা সঙ্গম করে থাকে। অপরদিকে মাত্র ৩.৭৫% উত্তরদাতা সঙ্গম করে না বলে জানিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আরো একটি তথ্য নিম্নের সারণির মাধ্যমে তুলে ধরা হলোঃ

সারণি ৬ : গর্ভাবস্থায় স্ত্রীর অনিচ্ছায় সহবাস বা সঙ্গম করে কিনা

সহবাস / সঙ্গম করে কিনা	গণসংখ্যা	শতকরা হার (%)
অনিচ্ছায় সহবাস / সঙ্গম করে	৬৬	৮২.৫০
অনিচ্ছায় সহবাস/সঙ্গম করে না	১৪	১৭.৫০
মোট	৮০	১০০

এক্ষেত্রে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় উত্তরদাতাদের মধ্যে ৮২.৫০% বলেছেন তারা স্ত্রী গর্ভাবস্থায় স্ত্রীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও সঙ্গম করে থাকে। অপরদিকে সঙ্গম করে না বলে জানিয়েছেন ১৭.৫০% উত্তরদাতা। সুতরাং নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করতে পুরুষ সচেতনতার গুরুত্বপূর্ণ এই দিকটিও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রসঙ্গেতঃ আরোও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের তথ্য নিম্নে সারণির মাধ্যমে উল্লেখ করা হলো:

সারণি ৭ : গর্ভকালীন সময়ে স্ত্রীকে নিয়মিত ডাক্তার দেখায় কিনা

ডাক্তার দেখানোর ধরন	গণসংখ্যা	শতকরা হার (%)
নিয়মিত ডাক্তার দেখায়	৬২	৭৭.৫০
নিয়মিত ডাক্তার দেখায় না	১২	১৫.০০
জানি না	০৬	৭.৫০
মোট	৮০	১০০

উল্লিখিত সারণিতে দেখা যায়, নিয়মিত ডাক্তার দেখায় বলেছেন ৭৭.৫০% উত্তরদাতা। অপরদিকে নিয়মিত দেখায় না বলেছেন ১৫% এবং এ বিষয়ে জানে না বলেছেন ৭.৫০% উত্তরদাতা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ উত্তরদাতাই বলছে তারা তাদের গর্ভবতী স্ত্রীকে ডাক্তার দেখায় নিয়মিত, অপরদিকে (১৫+৭.৫=২২.৫০%) উত্তরদাতাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ২২.৫০% এ বিষয়ে সচেতন নয় বলেই তথ্যে প্রতীয়মান হয়। পাশাপাশি আরোও একটি তথ্য এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে কার ভূমিকা কি? নিম্নে সারণিতে তা উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ৮ : ডাক্তার দেখানোসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা

সিদ্ধান্ত গ্রহনে ভূমিকা	গণসংখ্যা	শতকরা হার (%)
উভয়ে / যৌথ	৪৮	৬০%
স্ত্রী	২৯	৩৩.২৫%
নিজ	৩	৩.৭৫%
মোট	৮০	১০০

উপস্থাপিত সারণির তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় স্বামী-স্ত্রী উভয় অর্থাৎ যৌথ সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা বলেছেন ৬০%, স্ত্রীর সিদ্ধান্তের কথা বলেছেন ৩৩.২৫% এবং উত্তরদাতা নিজে সিদ্ধান্ত নেন বলেছেন ৩.৭৫%। সুতরাং যৌথ সিদ্ধান্তের দিকটি উল্লেখযোগ্য। যদিও এখানে স্ত্রীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের হারটি বিবেচ্য।

এছাড়াও উত্তরদাতাদের নিকট থেকে নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করতে করণীয় সম্পর্কে মতামত জানতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। নিম্নে সারণির মাধ্যমে যা উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ৯ : নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করতে মতামতসমূহ

মতামতের ধরন	গণসংখ্যা	শতকরা হার (%)
গর্ভবতী নারীকে পুষ্টিকর খাদ্য বেশি বেশি দিতে হবে	৩০	২৮.৫৭
নিয়মিত ডাক্তার দেখাতে হবে এবং টিকা দিতে হবে	২২	২০.৯৫
প্রসবোত্তর যত্ন নিতে হবে	১৯	১৮.১০
গর্ভকালীন সময়ে ভারি কাজ থেকে বিরত রাখতে হবে এবং পর্যাপ্ত বিশ্রাম দিতে হবে।	১৮	১৭.১৪
গর্ভাবস্থায় নারীর প্রতি অধিক যত্নশীল হতে হবে	১৬	১৫.২৪
মোট	১০৫*	১০০

- একাধিক উত্তর দিয়েছেন।

উল্লিখিত সারণির প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করতে উত্তরদাতা নানা ধরনের মতামত দিয়েছেন। যেমন গর্ভবতী নারীকে পুষ্টিকর খাদ্য বেশি করে দিতে বলেছেন ২৮.৫৭% উত্তরদাতা। নিয়মিত ডাক্তার দেখানো এবং টিকা দেওয়ার কথা বলেছেন ২০.৩৫%, প্রসবত্তোর যত্ন নেওয়ার কথা বলেছেন ১৮.৯০%, গর্ভাবস্থায় নারীর প্রতি যত্ন নেওয়ার কথা বলেছেণ ১৫.২৪% এবং গর্ভকালীন সময়ে ভারী কাজ করা থেকে বিরত থাকার কথা এবং পর্যাপ্ত

বিশ্রাম নেওয়ার কথা বলেছেন ১৭.১৪% উত্তরদাতা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে গর্ভকালীন এবং প্রসবত্তোর যত্ন নেওয়ার ক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের বিভিন্ন মতামত রয়েছে।

উপস্থাপিত সকল তথ্যের পর্যালোচনা করলে দেখা যায় নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে উত্তরদাতা পুরুষদের মনোভাব বৈপরিত্যমুখী। বিশেষ করে গর্ভাবকালীন সময়ে স্ত্রীর প্রতি সচেতন সহযোগিতার ক্ষেত্রে এটা লক্ষনীয়। যেমন একদিকে উত্তরদাতারা বলেছেন স্ত্রী গর্ভবতী হলে বাড়ীর নানা কাজে তারা সহযোগিতা করেন (দ্রষ্টব্য: সারণি ৩)। অন্যদিকে নিজের প্রয়োজনে স্ত্রীকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে কাজে পাঠান এমন তথ্যও লক্ষনীয় (দ্রষ্টব্য: সারণি ৪)। পাশাপাশি আরোও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষনীয় যা নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করতে সচেতনভাবে সহযোগিতা প্রয়োজন সে ক্ষেত্রে একেবারে বিপরীতমুখী তথ্য পাওয়া যায়। যোটা গ্রামঞ্চলে পুরুষদের অসচেতনতারই নামন্তর। সেটা হলো স্ত্রী গর্ভকালীন অবস্থায় সঙ্গম করা এবং স্ত্রীর অনিচ্ছায় সঙ্গম করার তথ্য (দ্রষ্টব্য: সারনী ৫ এবং ৬)। অপরদিকে গর্ভকালীন সময়ে স্ত্রীকে ডাক্তার দেখানো এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত তথ্য অবশ্য আশাব্যঞ্জক (দ্রষ্টব্য: সারণি ৭ এবং ৮)। এই সাথে নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করতে উত্তরদাতাদের মতামত ভিত্তিক সুপারিশসমূহ ও পুরুষ সচেতনতায় প্রনিধানযোগ্য। তবে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ পূর্বক একথা বলা যায় যে, নিরাপদ মাতৃত্বের ক্ষেত্রে বিশেষকরে গর্ভকালীন সময়ে করণীয় সম্পর্কে পুরুষ মনোভাব এবং সহযোগিতার বিষয়টি এখনও নাজুক অবস্থায় রয়েছে যা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় আনতে হবে। কেননা একদিকে যেমন গ্রামাঞ্চলের পুরুষদের শিক্ষার অভাব (দ্রষ্টব্য: সামাজিক তথ্য) অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে যথাযথ জ্ঞানের অভাব এরকম অসচেতন অবস্থায় বিরাজমান। আর এই পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে যথাযথ নীতি নির্ধারণমূলক উদ্যোগ গ্রহণে নিম্নে কিছু সুপারিশ উপস্থাপন করা হলো:

সুপারিশসমূহ

নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করতে গ্রামাঞ্চলের পুরুষদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও সহযোগিতার মনোভাব তৈরীতে নীতি নির্ধারণমূলক ও কার্যক্রম ভিত্তিক কিছু সুপারিশ নিম্নে নেওয়া হলো:

১. গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চল ভিত্তিক (কমিউনিটি বেজ্ড) লক্ষ্য নির্ধারণ করে মাতৃস্বাস্থ্য, শিশুমৃত্যুসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পুরুষদের সচেতনতা কার্যক্রম সম্প্রসারণ করতে হবে।

২. বিশেষ করে নারীর গর্ভকালীন, প্রসূতি সেবা এবং প্রসবোত্তর যত্ন নিশ্চিত করতে পুরুষদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করার মনোভাব তৈরীতে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি ভিত্তিক উদ্যোগ নিতে হবে।

৩. নিরাপদ মাতৃত্বের সাথে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত যেমন গর্ভপূর্ব পরিবার পরিকল্পনা অর্থাৎ অপরিকল্পিত গর্ভরোধ, শিশুমৃত্যুরোধ, জরুরি প্রসূতিসেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, জেন্ডারভিত্তিক ব্যবধান কমিয়ে আনা, প্রজনন স্বাস্থ্য উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়ে পুরুষদের ভূমিকা ও সহযোগিতা নিশ্চিত করতে গ্রামাঞ্চলের পুরুষদের অংশগ্রহণভিত্তিক কর্মসূচিতে সম্পৃক্তকরণ।

৪. পরিকল্পিত পরিবার গঠনসহ নারীদের গর্ভবতী হওয়ার পর প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরিচর্যাসহ সকল ক্ষেত্রে গ্রমাঞ্চলের পুরুষদের দায়িত্বশীলতার মনোভাব অর্জনে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

৫. গ্রামাঞ্চলের পুরুষদের লক্ষ্যদল নির্ধারণ করে যেমন: বিবাহপূর্ণ পুরুষদল এবং বিবাহ পরবর্তী পুরুষদলকে উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

৬. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান যেমন উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ এবং স্থানীয় পর্যায়ের এনজিওগুলোকে সম্পৃক্ত করে সচেতনতা কার্যক্রমে পুরুষ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

৭. সরকারি মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমকে বিশেষ করে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে পৃথকভাবে পুরুষ সচেতনতা কার্যক্রম গ্রহণ ও জোরদার এবং অন্যান্য বেসরকারি কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় অত্যন্ত জরুরি।

৮. গ্রামাঞ্চলের স্থানীয় সংস্কৃতি ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অনানুষ্ঠানিক কার্যক্রমের মাধ্যমে পুরুষ সচেতনতা ও সহযোগিতার মনোভাব গঠনের প্রক্রিয়া তরান্বিত করতে হবে।

৯. মূলত: নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিতকরণে জাতীয়পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি কর্মসূচিতে পৃথকভাবে পুরুষ সচেতনতা, সহযোগিতার মনোভাব এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। যা শুধুমাত্র পুরুষদের লক্ষ্যদল হিসাবে নির্ধারণ করে পরিচালিত হবে।

উপসংহার

সামগ্রিক এই আলোচনার প্রেক্ষিতে একথা বলা যায় যে, বর্তমান সময়ে বাংলাদেশে নিরাপদ মাতৃত্বসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তাবায়নাধীন থাকলেও

সুনির্দিষ্টভাবে পুরুষ সচেতনতাসহ পুরুষ সহযোগিতার মনোভাব গঠনের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। যদিও সরকারি এবং বেসরকারি কর্মসূচির আওতায় পরিবার পরিকল্পনা, শিশুমৃত্যুরোধসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে তথাপি এর গতি খুব ধীর। আর বাস্তব ক্ষেত্রে আপাতদৃষ্টিতে এই অগ্রগতি ইতিবাচক মনে হলেও প্রকৃত ফলাফলে তা অত্যন্ত নাজুক অবস্থায় বিরাজমান। কেননা সরকারি এবং বেসরকারি কার্যক্রমের প্রভাবে অগ্রগতির হার বাড়লেও গ্রামাঞ্চলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আবহে ব্যবহারিক অবস্থা ভিন্ন। যা আলোচ্য গবেষণা সমীক্ষাতেও প্রতিফলিত হয়েছে। এক্ষেত্রে দেখা যায় কিছু বিষয়ে ইতিবাচক লক্ষনীয় হলেও মনোভাবগত কোনো পরিবর্তন হয়নি, যা অসচেতনতারই নামান্তর। এ ক্ষেত্রে নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করতে গর্ভকালীন সময়ে নারীদের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশেষ করে পারিবারিক ও মানসিক বিষয়গুলিতে পুরুষদের ইতিবাচক মনোভাব, সক্রিয় সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ পুরুষ সচেতনতার দিক নির্দেশ করে। যা সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস, শিশুমৃত্যুরোধসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। আর এই বিষয় বিবেচনায় এনে গ্রামাঞ্চলের পুরুষদের ইতিবাচক মনোভাব গঠন, সক্রিয় অংশগ্রহণ তথা পুরুষ সচেতনতা কার্যক্রম পৃথকভাবে গ্রহণ করা উচিত বলে প্রতীয়মান হয়।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, সপ্তদশ সংখ্যা ১৪১৬

ওরাওঁ সমাজে নারীর প্রতি সহিংসতার প্রকৃতি

রিপন কুমার সরকার*

Abstract: Violence against women is a common phenomenon especially for indigenous women in Bangladesh. According to the UNFPA ranking, Bangladesh took the top position among the countries where violence against women is prevalent. This paper is an attempt to evaluate the existing patterns and causes of violence against *Oraon* women in northern rural Bangladesh. In this study, fifty married *oraon* women were purposively selected and interviewed singly by using a semi-structured questionnaire. It was observed that women are suffering from physical and mental battering by their husbands' patriarchal attitudes. It was also observed that women are often orally threatened and tortured by their husbands' drunken behaviours.

১. ভূমিকা

বর্তমান পরিবর্তনশীল বিশ্বের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে নারীর মানবাধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র বলে বিবেচিত। এক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার মধ্যে নারীর প্রতি সহিংসতা একটি। নারীর প্রতি সহিংসতা বাংলাদেশের পরিবারগুলোতে অন্যতম প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা।[১] পিতৃতান্ত্রিক পরিবার কাঠামো ও পুরুষশাসিত সমাজে নারীর অধঃস্তনতাই বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় নারীদের সহিংসতার দিকে ঠেলে দিয়েছে।[২] গৃহকর্মে নারীর স্থান উর্ধ্বে ধারণা করা হলেও পিতৃতান্ত্রিক পরিবার কাঠামোর কারণে বেশির ভাগ ওরাওঁ নারীদের অবস্থান সুদৃঢ় নয়। পিতৃতন্ত্রের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে খুব অল্পসংখক ওরাওঁ নারী পরিবার প্রধান হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। রংপুর এবং দিনাজপুরে পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা যায়, আদিবাসী সমাজে ৮৯% পরিবার পুরুষ-প্রধান এবং ১১% নারী-প্রধান। পুরুষ-প্রধান পরিবারে নারীরা চিরাচরিত নিয়মেই অবহেলিত ও নিপীড়িত।[৩] পরিবারের বাইরে পুরুষ সদস্যদের সাথে কাজে যোগদান করলেও পরিবারে তাদের শ্রমের বোঝা লাঘব হয় না। বিষয়টিকে খুবই স্বাভাবিক ও সহজভাবে উপস্থাপন করা হয়, যার

---

* এমফিল গবেষক, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

[১] K.M. Rabiul Karim, "Men's Arrack Drinking and Domestic Violence against Wemen in a Bangladesh Village," *International Quarterly of Community Health Education: A Journal of Policy and Applied Research*, vol. 25, no. 4 (2005–06), p. 368.

[২] Ibid, p. 369.

[৩] মেসবাহ কামাল, ঈশানী চক্রবর্তী এবং জোবাইদা নাসরীন, *নিজভূমে পরবাসী : উত্তরবঙ্গের আদিবাসীর প্রান্তিকতা ডিসকোর্স* (ঢাকা: দিব্য প্রকাশ, ২০০৬), পৃ. ১১১।

মধ্যেই নিহিত আছে লিঙ্গীয় নির্যাতনের উপাদান। তারা পরিবারের বাইরে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করলেও গৃহকর্ম ও সন্তান প্রতিপালনের একক দায়িত্ব হতে মুক্তি পান না। বরং উভয়ক্ষেত্রেই যথার্থ ভূমিকা পালন করেও তারা নায্য পাওনা পান না। গৃহ ও গৃহের বাইরে ওরাওঁ নারীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। আর পরিবারকাঠামো পুরুষতান্ত্রিক হওয়ায় নির্যাতন ও সহিংসতা তাদের নিত্যসঙ্গী, কখনো দৈহিকভাবে কখনো মানসিকভাবে।

তৃতীয় বিশ্বে নারীদের ক্ষেত্রে শুধু পুরুষতন্ত্রই সমস্যা নয়; পুঁজিবাদ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও শ্রেণীসহ নির্যাতনের অপরাপর শর্তসমূহ এর সঙ্গে জড়িত। বাংলাদেশে ওরাওঁ জনগোষ্ঠী সংখ্যালঘু হিসেবেই পরিচিতি পেয়েছে। সংখ্যালঘুরা প্রায়শই নির্যাতনের শিকার হয়। জাতিসংঘের "বিশ্ব জনসংখ্যা পরিস্থিতি ২০০০" প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পুরুষ সঙ্গীর হাতে নারী নির্যাতনের হার অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে দ্বিতীয়। সংখ্যালঘু ওরাওঁ নারীরা পরিবারের সদস্যদের দ্বারা প্রতিনিয়ত সহিংসতার শিকার হচ্ছেন। এই সংখ্যালঘু হতে পারে জাতিগতভাবে, ধর্মীয়ভাবে অথবা বর্ণগতভাবে।[৪] ধর্ম, জাতি এবং নারী হিসেবে রাষ্ট্রের প্রান্তিক অবস্থানে আছে বলে আদিবাসী নারীরা এই তিন মতাদর্শিক অবস্থান থেকেই নির্যাতিত হন।[৫] উত্তরবঙ্গের আদিবাসী অধ্যুষিত জনগোষ্ঠীর দিকে তাকালে এই ব্যাপকতা উপলব্ধি করা যায়। সাম্প্রতিক কালে এনজিও এবং নারী সংগঠনগুলোর তৎপরতায় নারীর প্রতি সহিংসতা সম্পর্কিত কিছু সমীক্ষা পরিচালিত হয়েছে। এসব সমীক্ষায় দেখা গেছে, নারীর প্রতি সহিংসতার প্রাথমিক ও অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে পরিবার। পরিবারে যেসব সহিংসতা সংঘঠিত হয় সেসব বিষয়ে যথাযথ অনুসন্ধান ও গবেষণার সংখ্যা সীমিত। আদিবাসী পরিবারে নারীর প্রতি সহিংসতা সম্পর্কিত সমীক্ষা আরো দুর্লভ। এই বিশেষ দিক বিবেচনায় রেখে ওঁরাও সমাজে নারীর প্রতি সহিংসতার ধরন-প্রকৃতি জানার উদ্দেশ্যে বর্তমান গবেষণাকর্মটি পরিচালিত হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে মূলত ওরাওঁ নারীর প্রতি সহিংসতার চালচিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এখানে আদিবাসী নারী বলতে শুধুমাত্র 'ওরাওঁ' নারীদের বুঝানো হয়েছে। 'আদি' অর্থ 'মূল' এবং 'বাসী' অর্থ 'অধিবাসী'। অর্থাৎ 'দেশের মূল অধিবাসী' অর্থে আদিবাসী শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। অন্যভাবে বলা যায়, আদিবাসী বলতে এমন জনগোষ্ঠীকে বুঝায় যারা মোটামুটি একটা অঞ্চলে সংগঠিত, যাদের মধ্যে রয়েছে সাংস্কৃতিক ঐক্য।[৬] সাধারণভাবে কোনো ব্যক্তি যখন কোনো নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অথবা বল প্রয়োগ করে বা ভয় দেখিয়ে কোনো কিছু করতে বাধ্য করেন তখন তা নারীর প্রতি সহিংসতা বলে গণ্য হয়। এই প্রবন্ধে 'নারীর প্রতি সহিংসতা' বলতে নারীর আর্থ-সামাজিক, মানসিক ও শারীরিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ যখন নারীর উপর দৈহিক ও মানসিক নিপীড়ন চালায় এবং বিভিন্ন অজুহাতে নারীকে জোরপূর্বক কিছু করতে বাধ্য করে তা বোঝানো হয়েছে।

নওগাঁসহ বরেন্দ্র এলাকায় ওরাওঁ সম্প্রদায় অন্যতম নৃগোষ্ঠী হিসেবে বসবাস করে আসছে। পণ্ডিতদের মতে, বাংলাদেশের ওরাওঁরা দ্রাবিড়িয়ান জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।[৭] ওরাওঁদের আদিবাস সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে, কেউ কেউ মনে করেন যে, দাক্ষিণাত্য থেকে তারা দেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের ঐতিহ্য লক্ষ্য করেই এই মতের অবতারণা হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন যে, ওরাওঁদের ঐতিহ্য ভারতের পশ্চিম উপকূলের গুজরাট অথবা "কংকন"-এর

---

[৪]মেসবাহ কামাল, *নিজভূমে পরবাসী*, পৃ. ১১৩।

[৫]তদেব।

[৬]তদেব, পৃ. ১৯।

[৭]আফসার আহমদ, "আদিবাসী শিল্প ও সংস্কৃতি," *সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, কে. এম. মোহসীন ও শরীফ উদ্দিন আহমেদ (সম্পা.), (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), পৃ. ৫৬১।

অধিবাসীদের ঐতিহ্যের সমতুল্য।[৮] কিন্তু ড. গ্রীগনার্ড এবং রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র রায় বলেন, উঁরাওদের আদিবাস দক্ষিণ ভারতের নর্দান নদীর উপকুলে "কর্ণাট প্রদেশে ছিল।"[৯] খ্রিষ্টপূর্বাব্দ কালে ভারতের কর্ণাটক ছেড়ে জীবন-জীবিকা এবং নিরাপত্তার তাগিদে ওরাওঁরা ছোটনাগপুর ও রাঁচি এলাকায় স্থায়ী বসতি গড়ে তোলেন। এরপর ভারতের বাইরে প্রাচীন বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে তারা বসতি স্থাপন করেন। আদিবাসী সম্প্রদায় অতি প্রাচীনকাল হতে স্বকীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ইতিহাস ও স্বতন্ত্র জীবন ব্যবস্থার অধিকারী, যা তারা এ দেশের মাটি ও মানুষের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেও বহুলাংশে বজায় রেখেছেন।[১০] নানাবিধ বাধা-বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও তাদের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক ও বর্ণিল জীবনধারা থেকে তারা কখনো বিচ্যুত হননি। ওঁরাওদের বসবাস নওগাঁ জেলায় সবচেয়ে বেশী (পরিবার–৮২৮৯ টি, নারী–১৬১৯৯ জন, পুরুষ–১৫৬৩৫ জন, মোট– ৩১৮৩৪ জন)।[১১] নওগাঁ জেলার আদিবাসী অধ্যুষিত একটি উপজেলা হচ্ছে নিয়ামতপুর। নওগাঁর নিয়ামতপুরে ৬২৬২ জন ওরাওঁ আদিবাসীর বসবাস রয়েছে।[১২] এছাড়া ইকরাপাড়ায় ৯০ টি পরিবার রয়েছে। নিয়ামতপুর উপজেলা নওগাঁ জেলা সদর হতে ৪৮ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত। বর্তমানে এই উপজেলার আয়তন ৪৪৯.১০ বর্গকিলোমিটার। নিয়ামতপুর উপজেলা ২৪°৪১ – ২৪°৫৯ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°২৩ – ৮৮°৪০ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। গবেষণা এককের সহজলভ্যতার বিষয়টি বিবেচনা সাপেক্ষে নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলাধীন ওরাওঁ অধ্যুষিত ইকরাপাড়া গ্রামকে গবেষণা এলাকা হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় উৎস হতেই তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হতে তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষক ৩০ এপ্রিল, ২০০৯ হতে ৩০ জুন, ২০০৯ পর্যন্ত গবেষণা এলাকায় অবস্থান করেছেন। উদ্দেশ্যমূলকভাবে নির্বাচিত ৫০টি পরিবারের ৫০ জন (প্রতি পরিবার থেকে ১জন) বিবাহিত ওরাওঁ নারীর নিকট হতে পরিবারে নারীর প্রতি সহিংসতা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষক প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন। পাশাপাশি অংশগ্রহণমূলক ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমেও তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এ কারণে নমুনা হিসেবে ৫০ জনকে বিবেচনা করা হলেও সমীক্ষার ফলাফলে গবেষণা এলাকার অধিকাংশ ওরাওঁ নারীর মতামতের প্রতিফলন ঘটেছে।

২. পরিবার ও সমাজে ওরাওঁ নারী

পৃথিবীর সকল সমাজ অভিন্ন নয়। সমাজ বরং এখনো বহু ভাগে বিভক্ত। কেবল একটা জায়গায় গোটা বিশ্বের সমাজ এখনো অভিন্ন–প্রায় সব সমাজ পুরুষশাসিত।[১৩] পুরুষরা পেশী ও আয় করার ক্ষমতা দিয়ে নিজ নিজ পরিবারে ক্ষমতাবান।[১৪] বিষয়টিকে জ্ঞানবিজ্ঞানের অসাধারণ উন্নতি সত্ত্বেও বিশ্ব মেনে নিয়েছে, এমন কি, সব ধর্মগ্রন্থও কমবেশি একে সমর্থন করেছে। প্রাচীন কাল

---

[৮]অরুণ খালখো, *উঁরাওদের আদি ইতিহাস* (রংপুর: ডানিয়েল রোজারিও, ১৯৮৫), পৃ. ২০।

[৯]তদেব, পৃ. ২০।

[১০]মো. আব্দুর রশীদ সিদ্দিকী, "বরেন্দ্র অঞ্চলে বসবাসরত সাঁওতাল নারীর ক্ষমতায়নে বেসরকারী সংস্থার ভূমিকা," *আইবিএস জার্নাল* , রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৫শ সংখ্যা, ১৪১৪ , পৃ. ৯৪।

[১১]মাযহারুল ইসলাম তরু, "ওঁরাও," *আদিবাসী জনগোষ্ঠী* , মেজবাহ কামাল, জাহিদুল ইসলাম, সুগত চাকমা (সম্পা.), (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), পৃ. ২২৩।

[১২]তদেব।

[১৩]গোলাম মুরশিদ, *নারী ধর্ম ইত্যাদি* (ঢাকা: অন্যপ্রকাশ, ২০০৭), পৃ. ১৭।

[১৪]তদেব।

থেকে শুরু করে আধুনিক কালের ধর্মগুরুদের ফতোয়া কাজে লাগিয়ে নারীদের হীনতা এবং অধীনতাকে জোরদার করা হয়েছে।[১৫] গৃহকর্মে নারী বিনা বেতনে গৃহস্থালীর সকল কার্য সম্পাদন করে, স্বামী ও সন্তানকে সেবা দেয় কিন্তু নারী কয়টি সন্তান ধারণ করবে, কখন ধারণ করবে এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে প্রভৃতি সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর কোনো নিজস্ব ভূমিকা নেই বললেই চলে–যদিও প্রজননে নারীর অবদানই মুখ্য।[১৬] অনুরূপভাবে ওরাওঁ সমাজ পিতৃপ্রধান হওয়ায় নারীরা পুরুষদের তুলনায় অধ:স্তন হিসেবেই স্বীকৃতি পেয়েছেন। পুরুষের আধিপত্য অপেক্ষাকৃত বেশি হওয়ায় ওরাওঁ সমাজে নারীর অবস্থান অত্যন্ত নাজুক।[১৭] ওরাওঁ সমাজে হালকর্ষণের কাজ সাধারণত পুরুষদের হাতে ন্যস্ত। কেননা, মনে করা হয় পশু চালনায় নারীরা পারদর্শী নয়। ওরাওঁ নারীরা কৃষিকাজে শ্রম বিনিয়োগ করে থাকেন। তবে মাঠ পর্যায়ের অনুসন্ধানে জানা গেছে, সমপরিমান শ্রম বিনিয়োগ করেও নারীরা পুরুষের তুলনায় অনেক কম মজুরী পেয়ে থাকেন। মানব জীবনের অপরিহার্য ও বৈধ সামাজিক বন্ধন হলো বিবাহ। সাধারণত মেয়ের বয়স ১২ এবং ছেলের বয়স ১৮-২২ বছর হলে তাদের বিবাহ সম্পন্ন হয়ে থাকে।[১৮] বাংলাদেশের বিবাহের বয়স নির্ধারণের দিকে লক্ষ করলে এটাকে বাল্য বিবাহ বলা যায়। ওরাওঁ সমাজে একই গোত্রের মধ্যে বিবাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। একই গোত্রের সদস্যকে ওরাওঁরা একই বংশের সন্তান বলে মনে করেন।[১৯] কোনো মেয়ে এ ধরনের কাজ করলে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হতে হয়। ওরাওঁ সমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলন আছে। তবে সন্তানবতী কোনো বিধবা সাধারণত দ্বিতীয় বিবাহে আগ্রহ প্রকাশ করেন না।[২০] কারণ দ্বিতীয় বিবাহকে সমাজে ভাল চোখে দেখা হয় না। পাশাপাশি পারিবারিক সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে নারীরা চরম বৈষমের শিকার হয়ে থাকেন। পারিবারিক সম্পত্তি বণ্টনে মেয়েদের কোনো অধিকার নেই বললেই চলে। এ সম্পর্কে Edmund Campion তাঁর My Oraon Culture গ্রন্থে বলেছেন-

> After the death of the father and the mother the elder brother is the sole possessor of the shares of his father. The general Oraon custom does not acknowledge a share in the family immoveable property. A daughter may get a share, if the parents are rich in moveable property such as money, ornaments, clothings and a milch cow.[21]

ওরাওঁ নারীদের প্রসবকালে তারা কোনো অভিজ্ঞ চিকিৎসককে ডাকেন না। সাধারণত প্রসবের দায়িত্ব তাদের সমাজের ধাত্রী বা অভিজ্ঞ মেয়েরাই পালন করে থাকেন। কোনো রমণী

---

[১৫]তদেব।

[১৬]মাহমুদা ইসলাম,*নারীবাদী চিন্তা ও নারী জীবন* (ঢাকা: জে.কে. প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স, ২০০২), পৃ. ১১।

[১৭]Md. Abdur Rahman,"The Oraon Community in Bangladesh and Their Socio-Cultural Attainments : A study of Four Villeges," PhD Dessertation, Rajshahi University, 2004, p. 230.

[১৮]তদেব, পৃ. ২৩৪।

[১৯]মাযহারুল ইসলাম তরু, *আদিবাসী জনগোষ্ঠী* , পৃ. ২২৮।

[২০]তদেব, পৃ. ৩২৯।

[21]Rev. Edmund Campion, *My Oraon Culture* (Ranchi: Ranchi Catholic Press, 1980), p. 82.

গর্ভবতী হলে তখন থেকেই তারা ধাত্রীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেন। ধাত্রী মাঝে মাঝে গর্ভবতী রমণীকে খাদ্য, আসন-বসন, চলন-বলন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে থাকেন।[২২] প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থার চেয়ে ধাত্রীকে তারা অত্যন্ত বিশ্বস্ত মনে করেন। ধাত্রীর উপর তাদের আজন্ম বিশ্বাস ও সংস্কারের প্রভাবই আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতি শরণাপন্ন না হওয়ার কারণ হিসেবে জানা গেছে। এছাড়া সুলক্ষণা ও কুলক্ষণা রমণী বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের বিশ্বাস-সংস্কার ওরাওঁ সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। যে রমণীর পায়ের পাতা দেখতে খড়মের মতো, যে রমণী স্বামীর আগে অন্ন সেবন করে, এবং যার দাঁত চিরুনির মতো তাদেরকে কুলক্ষণা হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। ওরাওঁ সমাজে প্রত্যেক বিবাহিত রমণী তার স্বামীর গোষ্ঠীর লোকজনদের অত্যন্ত সমীহ করে থাকেন। ওরাওঁ রমণীরা স্বামীর বড় ভাইকে দেবতাতুল্য সম্মান করেন এবং তার ছায়াও স্পর্শ করতে পারেন না।[২৩] আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে ওরাওঁ সমাজে প্রচলিত নানাবিধ বিশ্বাস-সংস্কার নারীর নিম্ন মর্যাদার পরিচায়ক।

৩. তত্ত্বীয় বিশ্লেষণে নারীর প্রতি সহিংসতা

সহিংসতা বিস্তৃতির পেছনে কোনো সুনির্দিষ্ট একক কারণ নেই—কারণসমূহ পরস্পর সম্পর্কে সম্পর্কিত। নারীর প্রতি সহিংসতার প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আশির দশকে কতিপয় মডেলের উদ্ভব হয়েছে। এই মডেলগুলোর মধ্যে ছিল বিকারতত্ত্ব (Fenichel,1945), সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক মডেল। এভাবে বিভিন্ন থিওরি বিকশিত হয়, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো রিসোর্স থিওরি (Goode, 1971), সিস্টেম থিওরি (Straus, 1973), সোস্যাল লার্নিং থিওরি (Bandura, 1973), এক্সচেঞ্জ থিওরি (Gelles, 1983) এবং প্যাট্রিআরক্যাল থিওরি (Dobash and Dobash, 1979)।

সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক মডেল অনুসরণে গড়ে উঠা তত্ত্বে হতাশা ও আগ্রাসনের মাঝে এক ধরনের সংযোগ রয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে।[২৪] এছাড়া ধর্ষণকামী মানুষের মুখরোচক আলোচনা ও বিকৃত মানসিকতাও পুরুষকে সহিংস আচরণের দিকে ধাবিত করে। সামাজিক-সাংস্কৃতিক মডেল অনুযায়ী, প্রচলিত সামাজিক কাঠামোয় বিদ্যমান অসমতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি, প্রথা ও পারিবারিক সম্পর্কের ধরনও নারীর প্রতি সহিংসতার জন্য দায়ী। বিকারতত্ত্বীয় মডেল অনুসারে মনে করা হয়, বিকারগ্রস্ততা থেকে কাণ্ডজ্ঞানহীন আচরণের জন্য সহিংস ঘটনা ঘটতে পারে। রিসোর্স থিওরির প্রবক্তা Goode-এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, যেক্ষেত্রে স্বামী পরিবারে কর্তৃত্বপরায়ণ হতে আগ্রহী কিন্তু সেক্ষেত্রে যদি তার অপেক্ষাকৃত অল্প শিক্ষা, চাকুরিক্ষেত্রে কম মর্যাদাসম্পন্ন অথবা সীমিত উপার্জন এবং আন্তর্ব্যক্তিক যোগাযোগে অদক্ষ হন তাহলে কর্তৃত্বপরায়ণ হওয়ার জন্য তিনি শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে সহিংসতাকে বেছে নিয়ে থাকেন।[২৫]

---

[২২]মুহম্মদ আব্দুল জলিল, *উত্তরবঙ্গের আদিবাসী লোকজীবন ও লোকসাহিত্য : ওরাওঁ* (ঢাকা: বিশ্ব সাহিত্য ভবন, ১৯৯৯), পৃ. ১৭৬।

[২৩]অরুণ খালখো, *উঁরাওদের আদি ইতিহাস* , পৃ. ২০।

[২৪]Roushan Jahan, *Hidden Danger: Women and Family Violence in Bangladesh* (Dhaka : Women for Women, 1994), p. 120.

[২৫]http://family.jrank.org/pages/1629/Spouse-Abuse-theoritical -explanation.html, (accessed on 12/07/2009.

বাংলাদেশের বাস্তবতায় এই ধরনের আচরণ পরিলক্ষিত হয়। এই তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা হলো Goode শুধু অর্থনৈতিক মাপকাঠি দিয়েই তা বিচার করতে চেয়েছেন। সিস্টেম থিওরি অনুযায়ী, পরিবারিক কাঠামোয় পরিচালিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ফলাফলের মতো সহিংসতাও একটি উপাদান। Straus তার এই তত্ত্বে ব্যক্তির চেয়ে সিস্টেমের ভূমিকাকেই প্রধান করে দেখতে চেয়েছেন যা অনেকেই সরলীকৃত বলে অভিহিত করেছেন। একজন নারীকে পারিবারিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে সিস্টেমের নামে আরোপিত কতিপয় অনুশাসনের মাধ্যমে যেমন নিপীড়ন করা সম্ভব, তেমনি সিস্টেমকে তার উপযোগী করে তুলে তাকে এর বাইরে রাখা সম্ভব। সোস্যাল লার্নিং থিওরি অনুযায়ী, একজন ব্যক্তি সহিংস আচরণ দেখে তা আয়ত্ত্ব করেন এবং পরবর্তীতে ব্যক্তি হিসেবে এর প্রয়োগ করেন। পরিবার এমনই একটি মৌলিক প্রতিষ্ঠান যেখানে পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানদের ভূমিকা সম্পর্কে ব্যক্তি অবগত হন। এখানে হতাশা, মানসিক চাপ প্রভৃতি যেমন মোকাবেলা করতে শেখেন তেমনিভাবে পরিবারেই ব্যক্তি সহিংসতার শিকার হন।[২৬] পারিবারিক পর্যায়ে স্ত্রী'র প্রতি নির্যাতনকারীদের অনেকেই এই ধরনের আচরণ দেখে আয়ত্ত্ব করেছেন বলে জানা যায়। এছাড়া সহিংসতায় অভ্যস্ত হওয়া কিংবা তা রপ্ত করা শুধু পুরুষরাই করেন না, নারীরাও করেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে নারীদের হাতে পুরুষদের সহিংস আচরণের শিকার হওয়ার ঘটনা বিরল। এক্সচেঞ্জ থিওরি অনুযায়ী, নারীর প্রতি সহিংসতা সংগঠনে বিনিয়োগ ও মুনাফা দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।[২৭] মানুষের মাঝে পারস্পারিক সম্পর্ক গড়ে উঠার জন্য যখন বিনিয়োগ ও মুনাফা যাচাই করার বিষয়টিই প্রধান বিবেচ্য হয়ে ওঠে, তখন লেনদেনে কোনো ঘাটতি হলে কিংবা প্রত্যাশিত স্বীকৃতি না পেলে ব্যক্তি সহিংস আচরণ করতে পারেন। বাংলাদেশে পারিবারিক পর্যায়ে নারীরা যৌতুকের জন্য যে নিপীড়ন, নির্যাতন ও সহিংসতার শিকার হন, তা এক্সচেঞ্জ থিওরির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা সম্ভব।[২৮] পরিবারে নারী যে শ্রম দিয়ে থাকেন সে অনুযায়ী সুবিধা পান না এবং খুব কম ক্ষেত্রেই নারীরা পুরুষের ওপর সহিংস আচরণ করে থাকেন। বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতা বিশ্লেষণে প্যাট্রিআরক্যাল থিওরি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গ্রীক ভাষায় পিতৃতন্ত্র (Patriarchy) অর্থ পিতার শাসন। সত্তর দশকে নারীবাদী চিন্তা চেতনার অধিকারীরা এ শব্দটিকে ব্যাপক অর্থ ব্যবহার করেন। এর মূল কথা নারীর উপর পুরুষের নিয়ন্ত্রণ। পুরষের প্রাধান্য তথা পুরুষসুলভ ভূমিকা এবং নারীর অধঃস্তন তথা নারীসুলভ ভূমিকা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পিতৃতান্ত্রিক আদর্শ নারী ও পুরুষের মধ্যে জৈবিক পার্থক্যগুলোকে অতিরঞ্জিত করে।[২৯] পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুরুষাধিপত্যকে প্রাকৃতিক ও সর্বজনীন বলে মনে করা হয়।[৩০] প্যাট্রিআরক্যাল থিওরি অনুযায়ী, বিদ্যমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারীর অধঃস্তনতা একটি প্রয়োজনীয় শর্ত এবং সহিংসতা এই শর্ত পূরণে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।[৩১] পিতৃতন্ত্রে অসম সম্পর্কের মধ্য দিয়ে পুরুষ কর্তৃত্বপরায়ণ হয়ে ওঠেন এবং নারীকে চির অধঃস্তন রাখতে প্রয়াস চালান। পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নারীর স্বাধীন বিকাশ বাধাগ্রস্ত করে এবং প্রথার নামে, সংস্কৃতির

---

[২৬]Ibid.

[২৭]Ibid.

[২৮]Roushan Jahan, *Hidden Danger,* p. 118.

[২৯]মাহমুদা ইসলাম,*নারীবাদী চিন্তা ও নারী জীবন*, পৃ. ৭১।

[৩০]Gerda Lerner, *The Creation of Patriarchy* (New York:Oxford University Press, 1986), p. 16.

[৩১]Roushan Jahan, *Hidden Danger*, p. 121.

নামে, ধর্মের নামে নারীর পৃথিবীকে গণ্ডিবদ্ধ করে দেয়। বর্তমান গবেষণায় এই তত্ত্ব প্রয়োগযোগ্য। এছাড়া সহিংসতার সাথে সম্পর্কিত একটি নতুন ধারণা হলো পৌরষতত্ত্ব। এই তত্ত্বমতে, পুরুষই পরিবারের রক্ষাকারী এবং যোগানদাতা। যোগানদাতা হিসেবে পুরুষ অর্থ উপার্জন এবং প্রয়োজনীয় উপকরণাদির যোগান নিশ্চিত করণের মাধ্যমে পরিবারের আর্থ-সামাজিক মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখেন। অন্যদিকে রক্ষাকারী হিসেবে পুরুষ তার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিসহ অন্যদের উপর কতৃত্ব প্রয়োগ করেন। মূলত এই দ্বিমুখী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ায় পুরুষ কতৃত্বপরায়ণ হয়ে ওঠেন এবং নারীর প্রতি সহিংস আচরণ প্রদর্শন করেন। তবে নারীবাদী তাত্ত্বিকরা এসব তত্ত্বকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করলেও আর্থ-সামাজিক কাঠামোর সাথে সম্পৃক্ত করতে নারাজ। তারা মনে করেন যে, ঐতিহাসিকভাবে পুরুষই আর্থ-সামাজিক কাঠামোর নিয়ন্ত্রক—যা নারী-পুরুষের মাঝে ব্যবধান তৈরী করেছে। নারীর প্রতি সহিংসতার প্রশ্নে র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ ও উদারপন্থী নারীবাদের বক্তব্যে ভিন্নতা রয়েছে। রেডিক্যাল নারীবাদের লক্ষ্য হলো নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে নারীর সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অসম ও বৈষম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থার মূলোৎপাটন করে সুষম ও সহযোগিতামূলক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।[৩২] অন্যদিকে উদারপন্থী নারীবাদের বক্তব্য হলো, সকল বৈষম্যমূলক আইন ও নীতি বিলোপ করে নারীকে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরুষের সাথে সমানতালে প্রতিযোগিতা করার সুযোগ দেওয়াই যথেষ্ট এবং এরপরও বৈষম্য থেকে গেলে কিছু করার নেই।[৩৩]

আলোচ্য গবেষণায় আক্ষরিকভাবে কোনো তত্ত্বকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করা হয়নি; যদিও প্যাট্রিআরক্যাল থিওরির ব্যাখ্যাকাঠামোকে বহুলাংশে প্রয়োগ করার চেষ্টা করা হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনাগুলো কোনো একক মডেলের সাহায্যে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে কোনো তত্ত্বের আংশিক প্রয়োগ সম্ভব হলেও সম্পূর্ণ ঘটনা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশে বিদ্যমান সামাজিক ব্যবস্থায় পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণা থেকে দেখা যায়, উল্লিখিত তত্ত্বসমূহের কোনো একটিকে বেছে নিয়ে নারী সহিংসতার কারণ অনুসন্ধান পুরোপুরি সম্ভব হয়নি।

৪. তথ্য বিশ্লেষণ ও ফলাফল

৪.১ উত্তরদাতাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য

বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য মতে, ওরাওঁ উত্তরদাতাদের বয়স ১২ থেকে ২২ এর মধ্যে ৪৩% এবং ২৩ থেকে ৫০ এর মধ্যে ৫৭%। ওরাওঁ জনগোষ্ঠীতে শিক্ষার হার কম। কারণ বাস্তব জীবনে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সচেতনতা নেই। তবে ইদানিং শিক্ষার হার বাড়ছে। কারণ হিসেবে জানা গেছে, এনজিও কর্তৃক স্থাপিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ওরাওঁ শিশুরা অংশগ্রহণ করছে। ওরাওঁ নারীদের মধ্যে শিক্ষার হার কম থাকায় পারিবারিক জীবন ও সমাজ জীবনে তারা সচেতন নয়। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য মতে, ওরাওঁ উত্তরদাতাদের ৮ শতাংশ পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণ করেছে, ১৮ শতাংশ অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন, এবং ৭৪ শতাংশ উত্তরদাতাই নিরক্ষর। শিক্ষার হার কম হওয়ার ফলে পরিবারে তাদের অবস্থানও নিম্ন। ওরাওঁ উত্তরদাতাদের মধ্যে ৯৬% বিবাহিত এবং ২% তালাকপ্রাপ্তা ও ২% বিধবা। বাংলাদেশের

---

[৩২]মাহমুদা ইসলাম, *নারীবাদী চিন্তা ও নারী জীবন*, পৃ. ৬৮।

[৩৩]তদেব, পৃ. ৬৬।

প্রচলিত আইনে বিবাহের ক্ষেত্রে মেয়েদের বয়স সর্বনিম্ন ১৮ বছর, কিন্তু তার আগেই অনেক ওরাওঁ নারীর বিয়ে হয়। বাল্য বিবাহ কোনো সুষ্ঠু, সুন্দর বৈবাহিক জীবনের সূচনা করে না বরং দুটো জীবনকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে।[৩৪] প্রাপ্ত তথ্যমতে, ওরাওঁ সমাজের ৫৬ শতাংশ বাল্যবিবাহের শিকার। আমাদের দেশে বাল্য বিবাহের হার পূর্বের তুলনায় কমে আসলেও আদিবাসী সমাজে এই হার এখনও তাৎপর্যপূর্ণ। সন্তান সংখ্যার দিক বিবেচনা করলে বলা যায়, অধিকাংশ উত্তরদাতার মধ্যে অধিক সন্তান গ্রহণের প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে (গড় সন্তান সংখ্যা ২.৭ জন)। পরিবারের আকার বিবেচনা করলে দেখা যায়, ওরাওঁ উত্তরদাতাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৩ থেকে ৫ এর মধ্যে ৪৮% এবং ৬ থেকে ৮ এর মধ্যে ৫২%। সদস্য সংখ্যার দিক থেকে বিবেচনা করলে বলা যায়, অধিকাংশ পরিবারই ৬ থেকে ৮ সদস্য বিশিষ্ট। ওরাওঁ উত্তরদাতাদের ৩২% এর মাথাপিছু বার্ষিক আয় ৬৫০০ থেকে ৯৫০০ টাকার মধ্যে ও ২২% এর আয় ৯৫০০ থেকে ১৩০০০ টাকার মধ্যে–যা জাতীয় মাথাপিছু আয়ের (পরিসংখ্যান পকেট বুক-এর তথ্য মতে, ৫৯৯ মার্কিন ডলার) তুলনায় নগন্য। অর্থাৎ এই জনগোষ্ঠীর উপার্জনের প্রাপ্ত পরিসংখ্যানের মধ্য দিয়ে নিম্ন জীবনযাত্রার চিত্র ফুটে উঠেছে। মাঠ পর্যায়ের তথ্যে জানা গেছে, যেসব নারী সরাসরি কোনো উপার্জনমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত নয় পরিবারে তাদের অবস্থান তুলনামূলকভাবে (জড়িতদের চেয়ে) দুর্বল। উত্তরদাতাদের ৪৬% সরাসরি কোনো উপার্জনমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত না থাকলেও গৃহের সকল কাজকর্ম করেন–যার অর্থনৈতিক স্বীকৃতি নেই। কেননা প্রচলিত জাতীয় আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে পুরুষের উৎপাদনশীলতা যেখানে প্রায় ৯৮ শতাংশ হিসেবে ধরা হয়, সেখানে নারীদের উৎপাদনশীলতার মাত্র ৪৭ শতাংশ গণনা করা হয়।[৩৫] নারীরা পরিবার রক্ষণাবেক্ষণ ও কৃষির জন্য যে শ্রম দেয় তার জন্য কোনো পারিশ্রমিক পায় না এমনকি পরিবারেও কোনো স্বীকৃতি নেই।[৩৬] যদিও ধরে নেয়া হয় যে, মহিলারা আয় উপার্জন করলে পরিবারে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, অবস্থান দৃঢ় হয় এবং স্বামী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা তাকে সমীহ করেন। আদিবাসী সমাজে একথা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাস্ত বভিত্তিক হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সত্য নয়। সমীক্ষার ফলাফলে দেখা যায়, ওরাওঁ নারীরা পরিবারে অর্থের সংস্থান করলেও তাদের পারিবারিক অবস্থানের বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। কারণ উপার্জিত অর্থ প্রায়শই স্বামীর হাতে তুলে দিতে হয়। কাজের জন্য পরিবারের বাইরে বেরিয়ে আসলেও ওরাওঁ সমাজে নারীরা পারিবারিক বিধি-নিষেধ, কৌলিন্য ও নিজস্ব মূল্যবোধের দ্বারা লালিত, শাসিত ও প্রতিপালিত হয়ে আসছেন।

৪.২ নারীর প্রতি সহিংসতা সম্পর্কিত তথ্য

অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৭ মতে, আমাদের দেশে মেয়েদের বিবাহের গড় বয়স ১৯.০ বছর হলেও আদিবাসী সমাজে এই হারের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়েছে। আদিবাসী সমাজে

---

[৩৪]মো. আবদুল মান্নান ও সামসুন্নাহার খানম মেরী, *নারী ও জীবন* (ঢাকা: অবসর, ২০০৬), পৃ. ১১৮।

[৩৫]শাহীন রহমান, "জেণ্ডার প্রসঙ্গ," *স্টেপস্ টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট*, ১৯৯৮, পৃ. ৯০।

[৩৬]পারভীন সুলতানা, "পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর অধঃস্তন অবস্থান ও উন্নয়ন: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ," *দি চিটাগাং ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব সোস্যাল সায়েন্স*, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, একবিংশতম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, ২০০৪, পৃ. ১০৩।

বাল্যবিবাহের হার এখনো তাৎপর্যপূর্ণ এবং এর প্রভাব থেকে ওরাওঁ নারীরা মুক্ত নয়। এর কারণ হিসেবে ওরাওঁ সমাজে শিক্ষার নিম্ন হারকে দায়ি করা যেতে পারে। ওরাওঁ সমাজে অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার প্রচলিত রীতি বা সংস্কার বাল্যবিবাহকে উৎসাহিত করে–যার ফলে নারীরা প্রায়শই সহিংসতার শিকার হচ্ছেন। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ১২–১৭ বছর বয়সের মধ্যে যাদের বিয়ে হয়েছে তারা বেশি সহিংসতার শিকার হয়েছেন। অর্থাৎ যেসব ওরাওঁ রমণী বাল্য বিবাহের শিকার, তারাই তুলনামূলকভাবে বেশি সহিংসতার শিকার হয়েছেন। কারণ অল্প বয়সে নতুন পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের সক্ষমতা অর্জন এবং পরিবর্তিত সামাজিক পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া কষ্টসাধ্য ব্যপার বলে মনে করা হয়। এছাড়া স্বামী-স্ত্রীর বয়সের ব্যবধান বেশি হওয়ার ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায়শ মতপার্থক্য তৈরী হয়। মাঠ পর্যায়ের অনুসন্ধানে জানা গেছে, বয়সের তারতম্য থাকায় অনেক ক্ষেত্রেই স্বামী স্ত্রী'র উপর সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেন এবং ক্ষেত্র বিশেষে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে থাকেন–যা পরবর্তীতে সহিংসতায় রূপ নেয় (সারণি ৪.১)।

সারণি ৪.১ : বিবাহকালীন বয়স ও নারীর প্রতি সহিংসতা সম্পর্কিত তথ্য

বিবাহকালীন বয়স	সহিংসতার শিকার (%) (N=৫০)
১২–১৭	৬৮.০০
১৮– তদুর্দ্ধ	৩২.০০
মোট	১০০.০০

উৎস: মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য

মানব সমাজে পরিবারই সম্প্রীতির মিলনকেন্দ্র। পরিবারে একজন মানুষ সকল ধরনের নিরাপত্তা ও আশ্রয় পেয়ে থাকে বলে মনে করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও প্রকৃত সত্য হলো পরিবারে নারীরা নিপীড়িত ও শোষিত। কারণ পরিবারের মধ্যে পুরুষদের কতৃত্ব বা প্রভূত্বের প্রবণতা অনস্বীকার্য।[৩৭] প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক আমরা বলতে পারি যে, ওরাওঁ নারীরা পরিবারে বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি ও হুমকির শিকার হয়ে থাকেন। এতৎসম্পর্কিত মতামত বিশ্লেষণ করলে বলা যায়, ৪৪% উত্তরদাতা মনে করেন পরিবারে স্বামীর ক্ষমতা ও প্রাধান্য বেশি হওয়ার ফলে তারা কারণে-অকারণে ভয়ভীতি ও হুমকির শিকার হয়ে থাকেন। শুধু স্বামীই নয়, শাশুড়ি একজন নারী হয়ে সহিংস আচরণ করেন। কারণ তিনিও পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতা-কাঠামো অনুসরণ করেন। শাশুড়ির সামান্য নির্দেশ অমান্য করলে ভয়ভীতি ও হুমকি দেন এমন অভিজ্ঞতার কথা স্বীকার করেছেন ১২% উত্তরদাতা এবং উত্তরদাতাদের ২০% বলেছেন যে, উপার্জিত অর্থ স্বামীর হাতে না দেওয়ার জন্য তারা ভয়ভীতি ও হুমকির শিকার হয়েছেন। অর্থাৎ অর্থ উপার্জন করা সত্ত্বেও পিতৃতান্ত্রিক পরিবার কাঠামোর কারণে ওরাওঁ সমাজে নারীরা স্বাবলম্বী হতে পারছেন না। পূর্বে আদিবাসী সমাজে বিয়ের ক্ষেত্রে কনে-পণ বাধ্যতামূলক থাকলেও বর্তমানে এ ধরনের বাধাধরা নিয়ম মেনে চলা হয় না। এমনকি শিক্ষিত ও বিত্তবান পাত্রের ক্ষেত্রে ঘটছে উল্টো ঘটনা এবং বর্তমানে অনেকেই পাত্রকে রেডিও, টেলিভিশন, ঘড়ি, সাইকেল ইত্যাদি প্রদান করছেন।[৩৮]

---

[৩৭]অনাদিকুমার মহাপাত্র, *বিষয় সমাজতত্ত্ব*, (কলিকাতা: ইণ্ডিয়ান বুক কনসার্ন, ১৯৯৪), পৃ. ২৭০।
[৩৮]মুহম্মদ আব্দুল জলিল, *উত্তরবঙ্গের আদিবাসী* , পৃ. ৫৬।

বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যেও বিষয়টির সত্যতা পাওয়া গেছে। উত্তরদাতাদের ৮% জানিয়েছেন, স্বামী বাপের বাড়ী থেকে অর্থ-কড়ি নিয়ে আসার জন্য ভয়ভীতি, হুমকি ও চাপ প্রয়োগ করে থাকেন। ক্ষমতা-কাঠামোর শীর্ষে পুরুষ অবস্থান করায় নারীরা পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা পালন করতে পারেন না। উত্তরদাতাদের ২৬% জানিয়েছেন, স্বামীর কোনো সিদ্ধান্তে দ্বিমত পোষণ করলে তাদেরকে ভয়ভীতি দেখানো হয় এবং প্রায়শই স্বামীর সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য করা হয়। ওরাওঁ নারীদেরকে গৃহের বাইরে কর্ম সম্পাদনের পাশাপাশি গৃহের অভ্যন্তরীণ কাজকর্মও সমানতালে সম্পন্ন করতে হয় এবং এক্ষেত্রে সামান্য ভুল-ভ্রান্তি হলে নির্যাতনের শিকার হতে হয়। উত্তরদাতাদের ৩২% মতে, গৃহকর্মে (খাবার তৈরী) সামান্য ত্রুটি হলে স্বামীরা ভয়ভীতি, হুমকি এবং ক্ষেত্রবিশেষে শারীরিক নির্যাতন করেন। এছাড়া উত্তরদাতারা আরো জানিয়েছেন, যৌনজীবনেও তারা স্বাধীন নয়, স্বামীর সাথে দ্বিমত পোষণ করলে সহিংস আচরণের শিকার হতে হয়। শিক্ষার অভাব ও পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতা-সম্পর্কের কাঠামো আদিবাসী সমাজ ব্যবস্থায় বিদ্যমান থাকায় নারী-পুরুষের সম্পর্ক বন্ধুসুলভ নয়–অনেকটাই প্রভূত্বমূলক। তাই কারণে-অকারণে ওরাওঁ জনগোষ্ঠীর নারীরা পরিবারে স্বামীর দ্বারা ভয়ভীতি ও হুমকির শিকার হন (সারণি ৪.২)।

সারণি ৪.২ : স্ত্রীকে ভয়ভীতি ও হুমকি দেখানো সম্পর্কিত তথ্য

ভয়ভীতি ও হুমকি দেখানোর কারণ সম্পর্কে স্ত্রীদের মতামত *	শতকরা (%)(N=৫০)
পরিবারে পুরুষের (স্বামীর) ক্ষমতা ও প্রাধান্য বেশি	৪৪.০০
শাশুড়ির নির্দেশ অমান্য করলে	১২.০০
উপার্জিত অর্থ স্বামীর হাতে না দেওয়ার ক্ষেত্রে	২০.০০
স্বামীর চাহিদামাফিক বাপের বাড়ী থেকে অর্থ-কড়ি না নিয়ে আসার ক্ষেত্রে	৮.০০
স্বামীর কোনো সিদ্ধান্তে দ্বিমত পোষণ করলে	২৬.০০
গৃহকর্মে (খাবার তৈরী) ত্রুটি হলে	৩২.০০
স্বামীর ইচ্ছামতো শারীরিক মিলনে অনীহা প্রকাশ করলে	৮.০০

উৎস: মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য

*একাধিক উত্তর আছে

ওরাওঁ সমাজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে 'পচানি'[৩৯] বা 'হারিয়া'[৪০] প্রচলিত পানীয় হিসেবে জনপ্রিয়। তাদের প্রিয় "পচই মদ" (স্থানীয়ভাবে তৈরি মদ)-এর কারণে পুরুষদের সীমাহীন মাতলামিই তাদের মাঝে পারিবারিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা ডেকে আনে।[৪১] আদিবাসী সমাজে স্থানীয়ভাবে তৈরি এই পানীয় সকল অনুষ্ঠানে ব্যাপকভাবে প্রচলিত।[৪২] পরিবারে নারীরাও এর প্রভাবমুক্ত নয়। মাঠ পর্যায়ের অনুসন্ধানের ফলে প্রাপ্ত তথ্য মতে, ৫৪% উত্তরদাতাদের স্বামী নিয়মিত 'পচানি'/'হারিয়া' পান করেন এবং মাতাল অবস্থায় বাড়িতে এসে স্ত্রীর উপর শারীরিক ও মানসিক

---

[৩৯]স্থানীয়ভাবে তৈরী এক ধরনের নেশা জাতীয় পানীয় যা অনেকের কাছে 'পচানী' নামে পরিচিত।

[৪০]মুহম্মদ আব্দুল জলিল,*উত্তরবঙ্গের আদিবাসী*, পৃ. ৬৫।

[৪১]অরুণ খালখো, *উরাওদের আদি ইতিহাস* , পৃ. ২০।

[৪২]Kazi Tobarak Hossain and Syed Zahir Sadeque, "The Santals of Rajshahi: A Study in Social and Cultural Change," Mahmud Shah Qureshi (ed.), *Tribal Culture in Bangladesh* (Rajshahi: Institute of Bangladesh Studies, 1984), p. 165.

নির্যাতন করেন। উত্তরদাতাদের ৩২% জানিয়েছেন, তাদের স্বামীরা মাঝেমাঝে (নিয়মিত বিরতিতে) 'পচানি'/'হারিয়া' পান করেন এবং স্ত্রী'র প্রতি সহিংস আচরণ করেন। তবে জানা গেছে, তারা নিয়মিত পানকারীদের মতো উগ্র নয়। উত্তরদাতাদের ১৪% জানিয়েছেন, তাদের স্বামীরা শুধুমাত্র উৎসবের দিনগুলোতে 'পচানি' পান করেন এবং এর কারণে মাতলামি করলেও তা সহনীয়। সুতরাং বলা যায়, ওরাওঁ সমাজে পারিবারিক সহিংসতার পেছনে 'পচানি' অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করে (সারণি ৪.২)। নিয়মিত 'পচানি' পানের ফলে স্বামীর নির্যাতন সম্পর্কে ১৭ বছর বয়সী ওরাওঁ রমণী বলেন:

> সে (স্বামী) পরিবারের হর্তা-কর্তা। পরিবারে আমার ক্ষমতা ও মূল্য কোনোটাই নেই। তারপরও পরিবারের বিভিন্ন বিষয়ে যখন সে (স্বামী) আমার সাথে আলোচনা করে তখন মনে মনে ভাবি হয়ত সে আমার প্রতি যত্নশীল...কিন্তু যখন সে 'পচানি' (স্থানীয়ভাবে তৈরী মদ) খেয়ে বাড়িতে ফিরে, তখন আমার কোনো কথাই শোনে না, এসময় আমি তাকে স্বাভাবিক হতে বললে সে আমার উপর আরও বেশি চড়াও হয়...এক রকম বাধ্য হয়েই তখন আমাকে বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে হয়, না হলে সে হাতের কাছে যা পায় (লাঠি, দা, বটি, ছুরি) তা দিয়েই আঘাত করার চেষ্টা করে, এমনকি আমার মা-বাবার নামেও অসভ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। পরিবারে সে (স্বামী) প্রধান, তাই কোনো উপায়ন্তর না থাকায় মুখ বুঁজে সব কিছু সহ্য করতে হয়।[৪৩]

সারণি ৪.৩ : স্থানীয়ভাবে তৈরি 'পচানি'/ 'হারিয়া' পান এবং পরিবারে নারী নির্যাতন সম্পর্কিত তথ্য

'পচানি'/ 'হারিয়া' পানকারীর ধরন	শতকরা (%) (N=৫০)
নিয়মিত পানকারী	৫৪.০০
মাঝেমাঝে (নিয়মিত বিরতিতে) পানকারী	৩২.০০
শুধুমাত্র উৎসবের দিনগুলোতে পানকারী	১৪.০০
মোট	১০০.০০

উৎস: মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য

ব্যক্তি কেন্দ্রিক তত্ত্ব মতে, নারীর প্রতি সহিংসতার বিভিন্ন কারণের একটি হলো মাদক বা এ্যালকোহল গ্রহণ।। যেসব পরিবারের স্বামী মাদক বা এ্যালকোহল গ্রহণে অভ্যস্ত এবং নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারেন না তারা প্রায়শই স্ত্রীদের প্রতি সহিংস হয়ে ওঠেন। বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যে, 'পচানি'/ 'হারিয়া' পানের ফলে স্বামীদের অস্বাভাবিক আচরণের (সমাজ স্বীকৃত নয়) চিত্র ফুটে উঠেছে। উত্তরদাতাদের ৪৮% জানিয়েছেন, স্বামী 'পচানি' পান করে বাড়িতে ফিরে সামান্য খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে নোংরা ভাষায় গালিগালাজ করেন। কারণ তখন তার (স্বামীর) শারীরিক ও মানসিক ভারসাম্য থাকে না। উত্তরদাতাদের ৩৪% জানিয়েছেন, শারীরিক ও মানসিক ভারসাম্যহীনতার কারণে তাদেরকে (স্ত্রীদের) শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেন। 'পচানি' পানের ফলে স্বামী পাড়া-প্রতিবেশীদের সাথে বাদানুবাদে লিপ্ত হন এমন তথ্য দিয়েছেন ১৪% উত্তরদাতা। স্বামী অকারণেই সন্তানদের উপর ক্ষিপ্ত হন ও দুর্ব্যবহার করেন এমন অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করেছেন ১২% উত্তরদাতা। এছাড়া 'পচানি' পান করে স্বামী পরিবারের সদস্যদের উপর ক্ষিপ্ত হন এবং অশ্লীল ও অপমানজনক কথা-বার্তা বলেন-এমন আচরণের কথা জানিয়েছেন যথাক্রমে ১৬% ও ২০% উত্তরদাতা (সারণি ৪.৪)।

---

[৪৩]সাক্ষাৎকার: মালতী কুজোঁর, স্থান-ইকরাপাড়া, নিয়ামতপুর, নওগাঁ। তারিখ: ২২ জুন ২০০৯।

সারণি ৪.৪ : 'পচানি'/ 'হারিয়া' পানের ফলে সৃষ্ট আচরণের বিন্যাস

আচরণের ধরন*	শতকরা (%) (N=৫০)
স্ত্রীকে নোংরা ভাষায় গালিগালাজ করা	৪৮.০০
স্ত্রীকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা	৩৪.০০
পাড়া-প্রতিবেশীদের সাথে বাদানুবাদে লিপ্ত হওয়া	১৪.০০
সন্তানদের সাথে দুর্ব্যবহার করা	১২.০০
পরিবারের সদস্যদের উপর ক্ষিপ্ত হওয়া	১৬.০০
জনসম্মুখে অশ্লীল ও অপমানজনক কথা-বার্তা বলা	২০.০০

উৎস: মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য

*একাধিক উত্তর আছে

ওরাওঁ সমাজে নারীর গৃহশ্রমের কোনো মূল্য না থাকলেও সংসারের দায়িত্ব পালনে স্ত্রীর কোনো রকম ত্রুটি হলে স্বামী, শাশুড়ীসহ অন্যান্য সদস্যরা গালমন্দ ও শারীরিক নির্যাতন করেন। গবেষণাধীন উত্তরদাতাদের মধ্যে ৩০% জানিয়েছেন, সংসারের কাজকর্ম করতে গিয়ে অসাবধানতাবশত কোনো ভুল হলে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়। ওরাওঁ নারীদের ৫০% এর মতে, প্রায়শ স্বামীর গালমন্দ শুনতে হয়। শাশুড়ি কতৃক তিরস্কারের ঘটনাও ঘটেছে। কারণ হলো শাশুড়ি শীররিকভাবে একজন নারী হলেও তার মতাদর্শ পিতৃতান্ত্রিক। এছাড়াও উস্কানিমূলক কথা, মূল্যবান জিনিসপত্র ভেঙ্গে ফেলার ঘটনা অহরহ ঘটে থাকে এবং সেক্ষেত্রে স্ত্রীদের প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব প্রদর্শনের হার (৬ %) নগন্যই বলা চলে (সারণি ৪.৫)।

সারণি ৪.৫ : সাংসারিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কোনো প্রকার ত্রুটি হলে স্বামীর আচরণের ধরন

আচরণের ধরন	শতকরা (%) (N=৫০)
স্বামী মারধর করে	৩০.০০
স্বামীর গালমন্দ শুনতে হয়	৫০.০০
স্বামী ও শাশুড়ি কতৃক তিরস্কার	৮.০০
ব্যবহার্য্য জিনিসপত্র ভেঙ্গে ফেলা	৬.০০
সহানুভূতিশীল মনোভাব প্রদর্শন	৬.০০
মোট	১০০.০০

উৎস: মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য

মাঠপর্যায়ের অনুসন্ধানে জানা গেছে, স্বামীরা অধিকাংশ সময় স্ত্রীদের উপর কর্তৃত্ব ও খবরদারি বজায় রাখতে চায়। সেক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামীর কথা মতো না চললে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ শুনতে হয় এবং বেশি রেগে গেলে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়। বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য মতে, ওরাওঁ ৪২% উত্তরদাতা শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন বলে জানিয়েছেন এবং ১৪ % উত্তরদাতা জানিয়েছেন প্রায়শই স্বামী জোরপূর্বক সিদ্ধান্ত তাদের উপর চাপিয়ে দেন। অশ্লীল ভাষায় স্বামী গালিগালাজ করে এরূপ অভিজ্ঞতার কথা স্বীকার করেছেন সমীক্ষাধীন ২০% উত্তরদাতা। উত্তরদাতদের ১২% জানিয়েছেন, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতের অমিল হলে এর প্রভাব সন্তানদের উপরও পড়ে। সেক্ষেত্রে কোনো কারণ ছাড়াই সন্তানদের অহেতুক বকাঝকা করেন—যা সন্তানদের উপযুক্ত সামাজিকীকরণের প্রতিবন্ধক বলে মনে করা

হয়। উত্তরদাতাদের ১২% জানিয়েছেন পারিবারিক বিষয়ে সামান্য মতের অমিল হলে রাগ করে স্বামী পরিবারে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ পরিবারে অসম ক্ষমতা-সম্পর্কের কাঠামো আদিবাসী সমাজে বর্তমান থাকায় প্রতিনিয়তই নারীদেরকে হয়রানি, অপমান ও নির্যাতন সহ্য করতে হয় (সারণি ৪.৬)।

সারণি ৪.৬ : ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয়ে মতের অমিল হলে স্বামীর আচরণের প্রকৃতি

আচরণের প্রকৃতি	শতকরা (%) (N=৫০)
স্বামী রেগে গিয়ে শারীরিক নির্যাতন করা	৪২.০০
স্বামী জোরপূর্বক সিদ্ধান্ত স্ত্রীর উপর চাপিয়ে দেওয়া	১৪.০০
অশ্লীল ভাষায় স্বামী গালিগালাজ করা	২০.০০
রেগে গিয়ে সন্তানদের বকাঝকা করা	১২.০০
পরিবারে অশান্তি (ঝগড়া-বিবাদ) সৃষ্টি করা	১২.০০
মোট	১০০.০০

উৎস: মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য

৫. উপসংহার ও সুপারিশ

ওরাওঁ জনগোষ্ঠীতে নারীর দুর্বল অবস্থানের কারণে বিভিন্ন সময়ে তারা পরিবারে সহিংসতার শিকার হয়ে থাকেন। এই জনগোষ্ঠীর নারীরা সামাজিকভাবে অবহেলিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং অন্ধবিশ্বাসী। এ কারণে তারা পরিবারে প্রায়শই অধিকার বঞ্চিত। যেমন বিবাহ, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, চিকিৎসা সেবা প্রভৃতি ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। সমাজে বিদ্যমান পুরুষতন্ত্রের কারণে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান পুরুষের তুলনায় পশ্চাৎপদ। এছাড়া নারীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিও ইতিবাচক নয় এবং নারীকে স্বাধীন সত্ত্বা হিসেবে দেখা হয় না। পরিবার পৃথিবীর প্রাচীনতম সামাজিক প্রতিষ্ঠান। পরিবারে সৃষ্ট নারীর প্রতি সহিংসতা সমাজে অস্থিরতার জন্ম দেয় এবং ভাঙ্গন ত্বরান্বিত করে। প্রকৃতপক্ষে নারীর প্রতি সহিংসতার জন্ম পরিবারের মধ্যে হলেও এর সুদূরপ্রসারী ফলাফল গিয়ে পড়ে সমাজ তথা রাষ্ট্রের উপর। কেননা এই সহিংসতা বৃহত্তর পরিমণ্ডলে সমগ্র সমাজব্যবস্থাকে অস্থিতিশীল ও নড়বড়ে করে ফেলে এবং জন্ম দেয় নানা ধরনের সামাজিক সমস্যার–যা জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে। কাজেই পারিবারিক সহিংসতাকে কার্যকরভাবে মোকাবেলা করার বিষয়টি পারিবারিক জীবন থেকে শুরু করে সমগ্র সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় জীবনের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। নারীর অধিকার এবং সম্মান প্রতিষ্ঠিত করা না গেলে আমাদের সমাজব্যবস্থায় গুণগত পরিবর্তন সাধিত হবে না। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক মুক্তি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়া নারী অধিকার, নারী স্বাধীনতা, নারী মুক্তি অর্থহীন। কেননা এর উপরেই নির্ভর করছে পুরুষশাসিত সমাজে নারীর অবস্থা, অবস্থান ও অস্তিত্ব। বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় নারীর প্রতি সহিংসতা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, সমাজের অন্যান্য সমস্যার সাথে এর সম্পৃক্ততা রয়েছে। শুধু আদিবাসী সমাজেই নয় বরং নারীর প্রতি সহিংসতা বাংলাদেশে বিরাজমান সামাজিক সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসেবে পরিগণিত। এদেশে পিতৃতন্ত্রের বেড়াজালে নারী সমাজ অবরুদ্ধ ও নির্যাতিত। সমতা, উন্নয়ন ও

শান্তির লক্ষ্যার্জনের পথে নারীর প্রতি সহিংসতা অন্যতম প্রতিবন্ধক, যা সমগ্র নারী সমাজের মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ন করে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা ও নীতিতে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন।

পিতৃতন্ত্রের বেড়াজাল হতে মুক্তির লক্ষ্যে বর্তমান বিশ্বে বহুল আলোচিত বিষয়সমূহের একটি হলো নারীর ক্ষমতায়ন। ক্ষমতায়নের মাধ্যমেই আদিবাসী নারীরা সমাজে যথাযথ মূল্যায়ন পেতে পারেন। এজন্য আদিবাসী সমাজে যেমন শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটাতে হবে তেমনি আয়বৃদ্ধিমূলক ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক কর্মকাণ্ডে আদিবাসী নারীদের সম্পৃক্ত করতে হবে। এটা করা সম্ভব হলে পরিবারের মধ্যে নারীর অবস্থান শক্তিশালী হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে নির্যাতন ও সহিংসতামূলক কার্যক্রম সংগঠনের মাত্রা বা প্রবণতা হ্রাস পাবে। ওরাওঁ সমাজের মানুষের মধ্যকার চিরায়ত ও সনাতন ধ্যান-ধারণাসমূহ দূর করে তাঁদের মাঝে আধুনিক চিন্তা-ধারার বিকাশ ঘটাতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার অধিকার ও দায়িত্ব-কর্তব্য, পারস্পরিক সম্পর্ক প্রভৃতি সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তোলার ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে আদিবাসী সমাজে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টিগত পর্যায়ে শিক্ষা কর্মসূচির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ওরাওঁ সমাজে বিদ্যমান লিঙ্গ-বৈষম্যের কারণে নারীরা পারিবারিক জীবনে সহিংসতার শিকার হচ্ছেন। লিঙ্গ বৈষম্য ও নারীর প্রতি সহিংসতা শুধু আদিবাসী নারীর জন্য কোনো একক সমস্যা নয়, এটা বিশ্বশান্তি, প্রগতি ও উন্নয়নের পথেও অন্যতম সমস্যা। এজন্য আদিবাসী সমাজে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় জেণ্ডার-শিক্ষা কর্মসূচির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এছাড়া বিদ্যমান আইনের পরিমার্জন, সংশোধন এবং প্রয়োজনে কঠোর আইন প্রণয়ণ ও বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। ওরাওঁ সমাজে পুরুষদের কাছে মদ বিনোদনের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ বলে বিবেচিত। এক্ষেত্রে তাদের জন্য বিকল্প বিনোদনমূলক কর্মসূচীর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। নির্যাতনের মূল যে কারণ সেটি হলো সমাজস্থ মানুষের নেতিবাচক মানসিকতা। নারীর প্রতি পুরুষের নেতিবাচক মানসিকতার পরিবর্তন ও নারীর কাজের স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে। নারীও মানুষ, প্রাথমিকভাবে তাকে সেভাবে গ্রহণ করার মানসিকতা, পাশাপাশি সমান স্থানের যোগ্য হওয়ার সম্ভাবনাকে বিবেচনা করা এবং সেভাবে সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করতে হবে। এজন্য ব্যাপক গণসচেতনতা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়াকে গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে নিযুক্ত করা যেতে পারে। নারী নির্যাতন কোনো নতুন ঘটনা নয়। আমাদের দেশে নারীর প্রতি সনাতন দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন না হওয়া এবং ধর্মীয় ভুল ব্যাখ্যার কারণে নারীরা ঘরে-বাইরে নির্যাতিত হচ্ছেন। এক্ষেত্রে নারীদের অধিকার, অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে সঠিক ব্যাখ্যাদান ও অনুশীলনের জন্য স্থানীয় এলিট ও বেসরকারি সংস্থাসমূহকে নিযুক্ত করা যেতে পারে।

আইবিএস প্রকাশনা

পত্রিকা ও গ্রন্থ (বাংলায়)

আইবিএস জার্নাল (বাংলা), ১৪০০:১–১৪১২-১৩

ঐতিহ্য-সংস্কৃতি-সাহিত্য (সেমিনার : ৩), সম্পাদক : এম.এস. কোরেশী (১৯৭৯)

বঙ্কিমচন্দ্র ও আমরা (সেমিনার : ৬), আমানুলাহ আহমদ (১৯৮৫)

বাঙালীর আত্মপরিচয় (সেমিনার : ৭), সম্পাদক : এস.এ. আকন্দ (১৯৯১)

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার সমস্যা (সেমিনার : ৯), সম্পাদক : এম.এস. কোরেশী (১৯৭৯)

বাংলার ইতিহাস (মোগল আমল), ১ম খণ্ড, আবদুল করিম (১৯৯২)

Journals and Books (in English)

The Journal of the Institute of Bangladesh Studies, Vols. I-XXIX (1976-2006)

Reflections on Bengal Renaissance (Seminar Volume 1), edited by David Kopf & S. Joarder (1977)

Studies in Modern Bengal (Seminar Volume 2), edited by S.A.Akanda (1984)

The New Province of Eastern Bengal and Assam(1905-1911) by M.K.U.Molla (1981)

Provincial Autonomy in Bengal (1937-1943) by Enayetur Rahim (1981)

The District of Rajshahi : Its Past and Present (Seminar Volume 4), edited by S.A.Akanda (1984)

Tribal Cultures in Bangladesh (Seminar Volume 5), edited by M.S. Qureshi (1984)

Rural Poverty and Development Strategies in Bangladesh (Seminar Volume 8) edited by S.A.Akanda & M. Aminul Islam (1991)

History of Bengal : Mughal Period, Vols. 1 & 2 by Abdul Karim (1991, 1995)

The Institute of Bangladesh Studies : An Introduction (2004)

The Journal of the Institute of Bangladesh Studies : An Up-to-date Index by M. Shahjahan Rarhi (1993)

Resources of IBS : Abstracts of PhD Theses
Compiled by M. Shahjahan Rarhi (2002)

Orderly and Humane Migration : An Emerging Development Paradigm edited by Priti Kumar Mitra & Jakir Hossain (2004)

Pritikumar Mitra Commemorative Volume
Chief Editor Md. Mahbubar Rahman, Editor Swarochish Sarker (2009)

ষোড়শ সংখ্যার সূচিপত্র

এ.টি.এম. রফিকুল ইসলাম ॥	বাংলার দুটি অনালোচিত মোগল মসজিদ	৭
আখতার জাহান দুলারী ॥	ঐতিহাসিক মির্জানগর : ধারাবাহিক তথ্যানুসন্ধান	১৭
শেখ রজিকুল ইসলাম ॥	নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্প : পূর্ববাংলার জীবন ও প্রতিবেশ	২৭
সৌভিক রেজা ॥	বুদ্ধদেব বসুর কাব্যচিন্তা : আত্মোপলব্ধির প্রয়াস	৪৩
সরিফা সালোয়া ডিনা ॥	শামসুর রাহমানের কবিতায় মিথ প্রসঙ্গ	৫৫
ইয়াসমিন আরা সাথী ॥	মেহেরপুর জেলার আঞ্চলিক ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বিশে-ষণ এবং সামাজিক স্তরবিন্যাস	৬৭
মো. নিজাম উদ্দীন ॥	বাংলা ভাষায় সাব'উল মু'আলাকাত (সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকা) চর্চার ধারা ও প্রকৃতি	৮৫
আবু ইউনুছ খান মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর ॥	তাওফীক আল হাকীমের 'নাহরুল জুনূন' নাটকের বাংলা অনুবাদ : একটি পর্যালোচনা	১০১
মো. আ. রশীদ সিদ্দিকী ॥	বাংলাদেশের টুরি জাতিগোষ্ঠী : সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় উদ্‌ঘাটন	১১৫
শর্মিষ্ঠা রায় ॥	কৃষি ভর্তুকি এবং আখচাষিদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এর প্রভাব : একটি সমীক্ষ	১২৫
মোহাম্মাদ নাজিমুল হক ॥	স্বাধীন সুলতানী আমলে (১৩৩৮-১৫৩৮) বাংলার প্রশাসন ব্যবস্থা	১৩১
মুনসী মুনজুরুল হক	১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে বুদ্ধিজীবী সমাজের ভূমিকা	১৪৭